নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
বাল্মীকির রাম ও রামায়ণ

কত জন মহিষী ছিল রাজা দশরথের ? তিন, নাকি তিনশ পঞ্চাশ ? অথবা সাতশ জন, যেমন লিখেছেন কৃত্তিবাস ?
কেমন ছিলেন রাবণ ? যদি বলা যায়, বেদান্তশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বৈদিক কর্মকাণ্ডে অগ্রণী এক পুরুষ, তাহলে ? বিশ্বাস করা কঠিন । কেমন কঠিন এমন ছবি চিন্তা করা, যেখানে স্বয়ং রামচন্দ্র সীতার হাতে তুলে দিচ্ছেন মদের পানপাত্র, কিংবা বনবাসকালে খাচ্ছেন হরিণের মাংসের রোস্ট !
কথায় বলে, সাত নকলে আসল খাস্তা । বাল্মীকির রামায়ণও যেন তাই । ভারতের সব প্রদেশেই রচিত হয়েছে একটি করে প্রাদেশিক রামায়ণ । বাল্মীকির সঙ্গে টেক্কা দিয়েও তৈরি হয়েছে আরও এক দঙ্গল সংস্কৃত রামায়ণ —মহারামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ এমন কত কী ।
এ-ছাড়া, প্রাদেশিক লিপিকরদের হাতে পড়েও মূল রামায়ণ হয়েছে নানাভাবে পরিবর্তিত ।
সেইসব বদল থেকে মূল বাল্মীকি রামায়ণের স্বরূপটিকে ফিরিয়ে আনা বড় সহজ কাজ নয় । সেই দুঃসাধ্য কর্মেই ব্রতী নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী । দারুণ আকর্ষণীয় তাঁর আলোচনা-ভঙ্গি, ভারি সরস তাঁর নানান মন্তব্য ও টীকা । প্রত্যেক বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য এই আলোচনা ।

ISBN 81-7066-226-5

জন্ম : ২৩ নভেম্বর, ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ । অধুনা বাংলাদেশের পাবনায় ।
কৈশোর থেকে কলকাতায় । মেধাবী ছাত্র, সারা জীবনই স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা । অনার্স পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে গঙ্গামণি দেবী পদক এবং জাতীয় মেধাবৃত্তি ।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত নিয়ে এম-এ পাশ করার পর নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপনা নিয়ে কর্মজীবনের সূচনা । ১৯৮১ থেকে কলকাতার গুরুদাস কলেজে ।
১৯৮৭ সালে সংস্কৃত সাহিত্যে ডক্টরেট, বিষয়—কৃষ্ণ-সংক্রান্ত নাটক ।
দেশী-বিদেশী নানা পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে নানান গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত । প্রিয় বিষয়—বৈষ্ণবদর্শন এবং সাহিত্য । রবিবাসরীয় আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকারও নিয়মিত লেখক ।
বাল্যকাল কেটেছে ধর্মীয় সংকীর্ণতার গণ্ডিতে, পরবর্তীজীবনে সংস্কৃত সাহিত্যই উন্মোচিত করেছে মুক্তচিন্তার পথ ।

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

Moitreyee
05.10.12

বাল্মীকির রাম ও রামায়ণ

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯
ষষ্ঠ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১০

ISBN 81-7066-226-5

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

BALMIKIR RAM O RAMAYAN
[Essay]
by
Nrisinghaprasad Bhaduri
Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

৮০.০০

স্বর্গত অগ্রজ
রণজিৎ কুমার ভাদুড়ীর স্মৃতির উদ্দেশে

কথামুখ

ভারতবর্ষে এবং তার বাইরেও রামকাহিনীর শত ধারা বর্তমান । স্বদেশে আবার বিভিন্ন প্রাদেশিক কবির হাতে রামকথা এমন আশ্চর্য রূপ নিয়েছে যে, রামায়ণ যে কখনও বাল্মীকি রচনা করেছিলেন, একথাও অনেকে জানেন না। প্রাদেশিক কবিদের মূলধন যেহেতু অনেকক্ষেত্রেই ভক্তিরস, তাই রামচরিত্রের অতিমানবিকতা এবং অলৌকিকতা সব সময়েই তাঁদের সাহায্য করেছে। জনগণও আপন মুখের ভাষায় এমন আকুল করা কাহিনী পেয়ে বড়ই ব্যাকুল হয়েছেন । রামায়ণের মুখ্য চরিত্রগুলির যে চেহারা, যে ভাব বাল্মীকির কল্পনায় ছিল, তার ওপরে প্রাদেশিক তুলির রঙ-বেরঙের টান পড়ায় সেই চরিত্রগুলি অনেক সময় এমনই পালটে গেছে যে, মূলতঃ সেই চরিত্রগুলি কি ছিল তাই হারিয়ে গেছে। এতে লাভ কিংবা ক্ষতি কি হয়েছে সে বিচার আমার নয়। সাহিত্যের মৌল উপাদানের শুদ্ধতা নিয়ে যাঁরা বাড়াবাড়ি করেন তাঁরা অনেকটা সেই পর্যায়ভুক্ত যাঁরা রক্তের শুদ্ধতায় জন্ম-সংস্কারে বিশ্বাসী। আমি এই বাড়াবাড়ির মধ্যে যেতে চাই না। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, বাল্মীকি রামায়ণে এইটি ছিল, অন্যত্র এইটি হয়েছে, যদিও এই প্রক্রিয়াও আমি সামান্যই দেখাতে পেরেছি।

এখানেও বিপদ আছে। গবেষক-পণ্ডিতেরা যুক্তি-তথ্যের জাল বিস্তার করে প্রমাণ করেছেন যে, বাল্মীকি রামায়ণই আদৌ বাল্মীকি রামায়ণ ছিল না। অর্থাৎ বাল্মীকি রামায়ণের যে রূপ আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে অন্য অবচীন কবিদেরও অবদান আছে। সেই প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিকে দূর করে দিয়ে শুদ্ধ রামায়ণ গড়বারও প্রচেষ্টা চলেছে। মজার কথা হল সাহিত্যের এই সাংকর্য নিয়ে তাঁরাই বেশি মাথা ঘামান, তাঁরাই মৌল শুদ্ধ রামায়ণ নিয়ে বেশি চিন্তা করেন, যাঁরা সমাজ-জীবনের সাংকর্যকে অতি স্বাভাবিক, অতি সহজ বলে মনে করেন। বাল্মীকি রামায়ণের বর্তমান রূপে বালকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত বলে

পরিগণিত। এর মধ্যেও আবার বিভিন্ন পর্যায় আছে অর্থাৎ এই কাণ্ডগুলির কিছু অংশ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই মূল রামায়ণের ভেতরে জায়গা করে নিয়েছে, অন্যগুলি তার পরে, এবং কিছু অংশ তারও পরে।

বর্তমান প্রবন্ধে আমি এই পর্যায় বিভাগের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইনি। হইনি, তার কারণ, এই তর্কের শেষ নেই এবং এক পণ্ডিত যা বলেন, অন্য কৃতবিদ্য পণ্ডিত তা' প্রত্যাখ্যান করেন। আখ্যান-প্রত্যাখ্যানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমরা এও লক্ষ করেছি যে ইউরোপীয় গবেষকেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রাচ্য মহাকাব্যের যন্ত্রণা যেভাবে সমাধান করেছেন, তার মধ্যে মুন্সিয়ানা থাকলেও মমতা নেই। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে তাঁদের কতগুলি নির্দিষ্ট 'ফরমূলা' আছে, যে 'ফরমূলা' আজকাল প্রাচ্য গবেষকেরাও যথেষ্ট প্রয়োগ করেন। যেমন একটা পুরাতন প্রসঙ্গ উল্লেখ করি। বহুদিন আগে আমাদের পণ্ডিতকুলের এক মহামান্য পুরুষ শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মশাই বসুমতী পত্রিকায় রামায়ণ বিচার করতে গিয়ে একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন। প্রশ্নটি হল, কালিদাস যে রঘুবংশ মহাকাব্যে দিলীপ, রঘু ইত্যাদি রামপূর্ব রাজার কাহিনীচিত্র এঁকেছেন, তার উপাদান মূল রামায়ণে নেই। সেক্ষেত্রে এই কাহিনীগুলির উৎস ভূমি কি ?

তর্করত্নমশাই জানতেন না, যে, তাঁর এই প্রশ্ন আধুনিক প্রাজ্ঞ রামায়ণ গবেষকদের টেবিলে পড়লে তাঁরা ঈষৎ হাসি হেসে বলতেন—রামায়ণ লেখার পূর্বে কিংবা পরে আরও অন্য কোন রামকাহিনী থেকে থাকবে অথবা সে কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত থেকে থাকবে, যেখান থেকে কালিদাস তাঁর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। বস্তুতঃ মূল রামায়ণেরও মূল আছে এবং তারও মূল আছে। আধুনিক রামায়ণ গবেষকদের সম্বন্ধে আমার ধারণা যে মিথ্যে নয় তার কারণ হল বৌদ্ধ-জৈন গ্রন্থে প্রচলিত রামকাহিনীর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে অনেক গবেষকই এই ধরনের কথা বলেছেন। মূল, তার মূল, এবং তারও মূলে কি ছিল—তা যেমন আমাদের জানা নেই তা তেমনি অনেক গবেষকেরও জানা নেই। তবে হ্যাঁ, গবেষকদের এই 'ইনটেলেক্চ্যুয়াল্ জিমন্যাসটিকসে'র মধ্যে একটি জিনিস অবশ্য লক্ষণীয় যে তাঁরা প্রাচ্য রচনা, টীকা-টিপ্পনীর ধারা এবং অন্যান্য সমসাময়িক আকর গ্রন্থগুলির বিবর্তন তত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেন না। করলে, আমাদের 'ফরমূলা'তেই আমাদের মহাকাব্যের যন্ত্রণা নিরসন করা যেত। ভারতবর্ষের গবেষককুলের মধ্যে কোন দীনতা কিংবা হীনমন্যতা কাজ করে কিনা জানি না, তবে অনেকেই, আমি হলফ করে বলতে পারি অনেকেই, সমস্ত টীকা-টিপ্পনী সহকারে আকর গ্রন্থগুলি পড়ে উঠবার পরিশ্রম স্বীকার

করেছেন বলে মনে হয় না এবং সেক্ষেত্রে গবেষণা চলে গৌণ, নিতান্ত গৌণ গবেষণা গ্রন্থগুলি থেকে।

আমি একথা একবারও বলছি না যে, পশ্চিমী গবেষণার কোন মূল্য নেই, বরঞ্চ একথাই বলব, আকর গ্রন্থগুলি তাঁরা আমাদের থেকে বেশি যত্ন নিয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁদের বিপদ অন্য, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে গভীর পরিচয় না থাকায় তাঁরা এক বলতে আরেক বোঝেন। এমনকি সামান্য অনুবাদকর্মেও এই দীনতা ধরা পড়ে। এই সেদিনই বৌদ্ধতন্ত্রের এক মহাপণ্ডিত 'ইন্দ্রিয়গ্রাম' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় সমূহ না বুঝে ইংরেজী করেছেন 'Village of senses'। পণ্ডিতের নাম আলেক্স ওয়েম্যান। বস্তুতঃ তাঁর দোষ নেই খুব। কেননা তিনি কেন, তাঁর মত অনেক গবেষক পণ্ডিতই জানেন না যে ভারতবর্ষের রামায়ণ, মহাভারত পড়তে গেলে শব্দকোষ, অলংকার, ব্যাকরণ অর্থশাস্ত্র ছাড়াও পূর্বশাস্ত্রগুলিও জানা দরকার। এককালে নবদ্বীপে যাঁরা নব্যন্যায়ে শাস্ত্র রচনা করে মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তাঁদের অনেককেই নাকি তাঁদের গুরুরা বলতেন প্রসিদ্ধ অলংকারগ্রন্থ কাব্যপ্রকাশের টীকা রচনা করতে। নব্যন্যায়ের সঙ্গে অলংকারগ্রন্থের কোন আপাত সম্বন্ধ নেই, কিন্তু এই পাণ্ডিত্যটুকু নাকি প্রার্থনীয় ছিল। এই পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রান্তরের বোধ এখনও প্রার্থনীয়, কেননা তাতেই আলোচ্য বিষয়ের ওপর সঠিক আলোকপাত করা সম্ভব।

বলা যেতে পারে—তাহলে তো পঞ্চতীর্থ, নবতীর্থেরাই সঠিক গবেষণা করতে পারতেন, পশ্চিমী গবেষকদের কোন প্রয়োজনই ছিল না। ঘরের বদ্যিই যদি রোগ সারাতে পারে, তাহলে আবার সাহেব ডাক্তারের প্রয়োজন কি ? কিন্তু বিপদ আছে এখানেও। প্রাচীন এবং প্রথাগত পণ্ডিতদের মধ্যে রামায়ণ এবং মহাভারত নিয়ে যে ধর্মবোধ পূর্বাহ্ণেই প্রোথিত আছে, তা থেকে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই মুক্ত নন। পশ্চিম দুনিয়ার আধুনিক গবেষণা-ধারার সঙ্গেও তাঁরা খুব একটা পরিচিত নন। তাছাড়া নিজেদের ধারণার বাইরেও যে অন্য কোন গবেষণার ভূমি আছে, তাও তাঁরা মানতে চান না। আধুনিক তর্ক, যুক্তি এবং দৃষ্টিও এই পণ্ডিতকুলকে আকুলিত করে, আঘাতও করে।

পশ্চিম দুনিয়ার 'ফরমূলা' এবং প্রাচ্য পণ্ডিতকুলের সংরক্ষণশীলতা—এই দুয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি বিমূঢ়। আমি তাই মূল এবং তস্য মূল রামায়ণের পর্যায় বিভাগেও মত্ত হইনি অথবা টীকা-টিপ্পনী সহকারে 'শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছেন এবং যাহা বলিয়াছেন তাহাই ধর্ম'—এই মত্ততাও দেখাতে পারিনি। আমার ধারণা প্রাচ্য পণ্ডিতেরা নিরন্তর রামচরিত্রের মহিমা কীর্তন করে যে

'একষ্ট্রিমিজমে'র সূচনা করেছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও প্রক্ষেপবাদের পঙ্কোদ্ধার করে সেই 'একষ্ট্রিমিজম্'ই আমদানি করেছেন। সত্যটা আছে মাঝখানে লুকিয়ে। আক্ষেপের বিষয় প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য—দুপক্ষই কিভাবে তাঁদের যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন—তা আমি দেখানোর সুযোগ পাইনি, বর্তমান প্রবন্ধ তার উপযুক্ত পরিসরও নয়। তবে দুপক্ষের সম্বন্ধেই যে আমার আক্ষেপ আছে, সেটা প্রবন্ধ পড়লেই বোঝা যাবে। সত্যি কথা বলতে কি, গবেষণার দৃষ্টি থেকে আমার প্রবন্ধটি একেবারেই বন্ধ্যা, এটি কাউকে কোন সাহায্যও করবে না, কারও মনে কোন প্রতিক্রিয়াও ঘটাবে না। তবে 'ইন্ধন' বলে যে শব্দটা আছে, তার একটা ভূমিকা আছে এই প্রবন্ধে। কেউ যদি প্রাচ্যের গোঁড়ামি ছেড়ে আমার গ্রন্থটি পড়েন, তিনি এই ইন্ধন পাবেন এবং কেউ যদি 'সাহেব যা বলেছেন তাই ঠিক'—এই মত ছাড়তে পারেন, তিনিও আমার প্রবন্ধে ইন্ধন পাবেন। আমার প্রবন্ধের ক্ষমতা এর চাইতে বেশি নয়।

হিমালয় পর্বতকে সম্পূর্ণ জানতে হলে শুধু পাহাড়টা জানলেই চলে না। সে কতগুলি নদীর উৎস-স্থল, কোন নদীর ধারা কোন পথ-বাহিনী হয়ে চলেছে সেগুলিও যেমন জানতে হয়, তেমনি রামায়ণকে বুঝতে হলে শুধু বাল্মীকির লেখা তথাকথিত পঞ্চ-কাণ্ড রামায়ণটুকু বিচার করলেই হবে না। প্রাচীন ভারতের অনেক মহাকবিই রামায়ণের কাহিনীকে আশ্রয় করে তাঁদের কবি প্রতিভা প্রকাশ করেছেন। কাব্য, নাটক, গদ্য, পদ্য অথবা কাব্যরচনার যে যে ধারা প্রাচীন ভারতে চালু ছিল, তার প্রত্যেকটির মধ্যেই বাল্মীকি রামায়ণ নিবিড়ভাবে ঢুকে পড়েছে। সেক্ষেত্রে এই কথাটাই বলা যুক্তিযুক্ত হবে যে, হিমালয়ের মত রামায়ণও অনেক কবি-কল্পনার উৎসভূমি। লক্ষণীয় বিষয় হল, যখনই রামায়ণোত্তর কবিকৃতিগুলির বিচার করতে যাবেন, তখনই দেখবেন রামায়ণের বালকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ডের বিষয়গুলিকে কোন অবস্থাতেই তাঁরা আলাদা করে দেখেননি। তথাকথিত মূল কাণ্ডপঞ্চকের মধ্যে যে রামচন্দ্রকে পাওয়া যায়, সেই রামচন্দ্রকে তাঁরা বালকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ডের রামচন্দ্র থেকে আলাদা করে দেখতে পারেননি। যাঁরা পরবর্তীকালে বাল্মীকির রামকথা আশ্রয় করে কাব্য-নাটক লিখেছেন, সেই সব কাব্যনাটকে রামচন্দ্রের মনুষ্যসত্তাই প্রাধান্য পেয়েছে, যা রামায়ণের মূল কাণ্ড-পঞ্চকেও একইরকম, কিন্তু এই সব কবি-নাট্যকারেরা কোন অবস্থাতেই ভুলে যান না যে, রামচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বর, যা বাল্মীকিও ভোলেননি তাঁর বাল এবং উত্তরকাণ্ডে। কাজেই রামকথাশ্রয়ী কাব্যনাটকগুলি পরবর্তী হলেও, উল্টো দিক দিয়ে সেগুলি বাল্মীকি রামায়ণ

বিচারের সহায়ক হতে পারে বৈকি ?

প্রথমেই বলে রাখি, ভারতবর্ষীয় গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে, সে গ্রন্থ কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, যাই হোক না কেন, সেই ক্ষেত্রে খ্রীষ্টের জন্মদিনটিকে যাঁরা অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেন, আমি তাঁদের দলে নেই। নেই এইজন্যে যে, পূর্বে সেই দলে থেকে দেখেছি—বড় প্রমাদ ঘটে। যেমন ধরুন, আপনি যখন দেখলেন যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর এক কবি বাল্মীকির বালকাণ্ড কিংবা উত্তরকাণ্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তখন আপনি বলবেন—রামায়ণের এই কাণ্ড দুটি প্রক্ষিপ্ত হলেও খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই লেখা হয়ে গিয়েছিল এবং সংযোজিত হয়েছিল মূল কাণ্ড-পঞ্চকের সঙ্গে। কিন্তু আগামীকাল যদি আপনি এমন একটি গ্রন্থ পান, যা লেখা হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, তখনই আপনাকে মত পালটাতে হবে এবং বলতে হবে—ওই কাণ্ড দুটি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যেই লেখা হয়ে গিয়েছিল এবং তা সংযোজিতও হয়ে গিয়েছিল মূল কাণ্ডগুলির সঙ্গে। বস্তুতঃ রামায়ণ-বিচারের ক্ষেত্রে এতকাল এই পদ্ধতিই চলে এসেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই পদ্ধতির বিরোধী। বর্তমান প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিরোধিতা খানিকটা প্রকাশও হয়ে পড়েছে। আমি বিশ্বাস করি, একজন মানুষ যদি ক্রমাগত গৃহ পরিবর্তন করতে থাকেন, তবে তাঁর স্থায়ী আসবাবপত্রগুলির অপূরণীয় ক্ষতি হয়। ক্রমক্ষয়ের পথ ধরে সেগুলি এতই জীর্ণ হয়ে যায় যে, সেগুলি শেষপর্যন্ত ফেলেই দিতে হয়। প্রক্ষেপবাদীদের নিরন্তর আক্ষেপে বারবার মত পরিবর্তন করতে করতে রামায়ণের স্থায়ী অংশগুলিও এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন। শ্রমশীল গবেষককুলের কাছে আমার নিবেদন যে, তাঁরা প্রক্ষেপের অংশগুলি আরও ধৈর্য এবং মমতা দিয়ে বিবেচনা করুন, নইলে একসময়ে মনে হবে বুঝি গোটা রামায়ণটাই বাল্মীকি ছাড়া অন্য কারও হাতের কারসাজি !

কথামুখ শেষ করার আগে এই গ্রন্থের প্রকাশনা সম্বন্ধেও দুটি কথা বলতে হয়। বর্তমান প্রবন্ধটি আনন্দবাজার পূজাসংখ্যায় সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীরমাপদ চৌধুরী আমাকে জানান যে আনন্দ পাবলিশার্স এই প্রবন্ধটিকে গ্রন্থের রূপ দেবে। তাঁর কথামত আমি প্রবন্ধটি কিছু পরিবর্ধিত করি। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে পূজাসংখ্যার কথাবস্তুই প্রায় ধরা আছে, যদিও পরিবর্ধিত আকারে। দ্বিতীয় অধ্যায় লিখবার সময় আমি যখন রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি নিয়ে আকুল, তখন আমার বন্ধু এবং গুরু শ্রীপ্রবালকুমার সেন দুটি বই পড়তে দেন। বলা বাহুল্য রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলির সমস্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি আলোচনা করেছিলাম এবং সেই

সমস্যার সমাধান কল্পেই তিনি আমাকে মহামতি কাণ্টের লেখা 'ক্রিটিক্ অব পিওর রিজন' এবং তার ওপরে গ্রন্থভিত্তিক সমালোচনা ফাইহিঙ্গারের একটি প্রবন্ধ পড়তে দেন। গ্রন্থ দুটি আমার অশেষ উপকারে আসে। প্রধানতঃ এই গ্রন্থসূত্রের ওপর নির্ভর করেই আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, প্রক্ষেপবাদিতা এমনই এক পাণ্ডিত্য প্রকাশের জায়গা যা অনেক ক্ষেত্রেই প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের আপন কল্পনার আশ্রয়ে বেড়ে ওঠে এবং কখনও বা সে পাণ্ডিত্য মূলোচ্ছেদী।

বর্তমান প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে পরিবেশিত হওয়ার ব্যাপারে শ্রীরমাপদ চৌধুরী এবং অধ্যাপক প্রবালকুমার সেন ছাড়াও আমি আরও যাঁদের কাছে ঋণী, তাঁরা হলেন পণ্ডিতপ্রবর অনন্তলাল ঠাকুর, শ্রদ্ধেয়া গৌরী ধর্মপাল এবং আমার দিদি সুকুমারী ভট্টাচার্য। আমার স্ত্রী, পুত্র এবং দাদা সমস্ত গৃহকর্মে আমার সময় বাঁচিয়ে সুযোগ করে দিয়েছেন লেখার, তাঁদের কাছে শুধুমাত্র ঋণস্বীকার করার অর্থ হয় না।

প্রকাশকের তরফ থেকে শ্রীবাদল বসু মহাশয় এই গ্রন্থের প্রকাশ-পরিচর্যার ভার নিয়েছেন, তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রথম অধ্যায়

সেকালের এক কবিওয়ালাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—কোন সময়ে ময়ূরের মাথায় সাপ নেচেছিল ? আমরা জানি 'সাপের মাথায় ব্যাঙ-নাচুনি' যেমন সম্ভব নয়, তেমনি ময়ূরের মাথায় সাপ-নাচুনিও সম্ভব নয় । ব্যাঙ যেমন সাপ দেখলে ডরায়, সাপও তেমনি ময়ূর দেখলে ডরায় । কিন্তু সমস্যাটা ধরে ফেললেন কবিওয়ালা । তিনি বললেন—একবার এমনটি হয়েছিল । সেই যখন রাম-রাবণের ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল, পৃথিবী হয়ে উঠেছিল অস্থির, অচল পর্বতগুলো পর্যন্ত কাঁপছিল থরথর করে, তখন শিবের ছেলে কার্তিক ভয়ে হঠাৎ তার বাহনসুদ্ধুই শিবের কোলে চেপে বসেছিল—ভবাঙ্কভাক্ সবাহনঃ । ওদিকে ঠিক তখনই শিবের গলায় দোল-খাওয়া সাপটি নাকি ময়ূরের মাথার ওপর গর্জে গর্জে উঠছিল—তদা ময়ূর-মস্তকে জগর্জ পন্নগঃ স্বয়ম্ । কবিওয়ালা সমস্যা সমাধান করে দিলেন । রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় এবং তার আগে এমনি অসম্ভব ঘটনা অনেক ঘটেছিল, বানরে গান গেয়েছে, জলে শিলা ভেসেছে । আর সত্যি কথা বলতে কি সম্পূর্ণ রামায়ণটিকে যদি কেউ এককথায় প্রকাশ করতে বলে তা হলেও বলতে হবে সেই রাম-রাবণের যুদ্ধ । এক হিন্দী কবি তাঁর এক চৌপাইতে লিখেছেন—বানে বাকী ত্রিয়া চুরাই । বানে বাসে করী লড়াঈ—সে অন্যের স্ত্রীকে চুরি করেছিল এবং অন্যজন তখন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, একজন রাম, আরেকজন রাবণ । এই একটি ঘটনার জন্য তুলসীদাসকে অত বড় একখানা বই লিখতে হয়েছিল—তুলসীনে রচা দও পোথন্না । আমরা বলি, শুধু তুলসী কেন, ভারতবর্ষে যত প্রদেশ আছে, প্রায় সব প্রদেশেরই একখানা করে প্রাদেশিক রামায়ণ আছে, আর আছেন শতেক যুগের কবিদল, যাঁরা আদি কবির রচনাকে পুঁজি করে তাঁদের আপন কবিত্ব প্রকাশ করেছেন । কিন্তু বছরের পর বছর কাজ করতে করতে গৃহভৃত্যেরও যেমন কিছু কিছু স্বাধীনতা জন্মায়, তেমনি বাল্মীকির অনুষঙ্গে অনুগামী কবিদের কবিতায় এসেছে নতুন আঙ্গিক, অভিনব রস । তাতে লাভ হয়েছে এই যে, কখনও মূল রামায়ণের থেকেও প্রাদেশিক কবিই হয়ে

গেছেন প্রিয়তর। বাঙালিরা রামায়ণ বলতে যেমন কৃত্তিবাসকেই চেনে, হিন্দী বলয়ে তেমনি তুলসীদাসের প্রতিপত্তি। দখিন দেশে আবার কম্বনের রামায়ণ, তেলেগুদেশমে রঙ্গনাথনের রামায়ণ, কাশ্মীরে দিবাকর ভট্টের রামায়ণ। ওড়িশ্যা, আসাম, নেপাল, তিব্বত—সবারই নিজের মত করে একখানা রামায়ণ আছে। তবে মজা হল বিশেষ বিশেষ প্রদেশের শত কবির রূপটানে রামায়ণের ঘটনাপ্রবাহে যা পরিবর্তন, পরিবর্ধন এসেছে তা কখনও চমৎকার কখনও বা অদ্ভুত কখনও অর্থহীনও বটে। এমনকি মূল বাল্মীকি রামায়ণখানাই যখন বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক লিপিকরদের হাতে পড়ল, তখন সেখানকার সমাজ এবং ধর্মবোধ অনুযায়ী কখনও বা দু-চারটে শ্লোক বর্জিত হয়েছে, কখনও বা সংযোজিত। তার মধ্যেও আছে মহাকালের দুরভিসন্ধি। সময় যত গেছে পরিবর্তনে, পরিবর্ধনে মূল রামায়ণকে করে তোলা হয়েছে যুগোপযোগী। তাতে শুধু শ্লোকসংখ্যা নয়, শুনি নাকি পাঁচ কাণ্ডের জায়গায় রামায়ণ একেবারে সাত কাণ্ড হয়ে গেছে। আবার বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে আরও এক দঙ্গল সংস্কৃত রামায়ণও তৈরি হয়ে গেল। সেখানে মহারামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে আরম্ভ করে অদ্ভুত রামায়ণ, মোল্লা রামায়ণ, এমনকি দুরন্ত রামায়ণও আছে। এর ওপরে দেশ, বিদেশ, প্রদেশ, লোকগাথা এবং হাজারো কবিওয়ালাদের টানাটানিতে কেউ যদি সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা রামের মাসী বলে আমি তাতেও আশ্চর্য হই না, কারণ সীতা রামের বোন কি না এই নিয়ে তো এই সেদিনই হইচই হল।

অনেক পণ্ডিতই মনে করেন প্রথম স্তরে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা আরম্ভ হয়েছিল অতি সুসংবদ্ধভাবে। রাম যে অবতার কিংবা ভগবান তার বিন্দুমাত্র আভাস ছিল না, তিনি নেহাতই মনুষ্য। লেখার দিক দিয়ে কোনরকম শিথিলতা কিংবা ধর্মনীতির জয়ঘোষ কোনটাই নাকি ছিল না রামায়ণ রচনার আদিস্তরে। ঘটনার সূত্রপাত ঘটেছিল রাজবাড়ির অন্তঃকলহে, ঈর্ষায়, সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে ; শেষ হয়েছিল রাবণ-বধে। বালকাণ্ডে রামরূপী বিষ্ণুর জন্মলীলা আর উত্তরকাণ্ডের প্রসিদ্ধ লব-কুশ উপাখ্যানের সঙ্গে রাক্ষসরাজ রাবণ আর বানরপ্রধানদের পূর্ব জীবনের কাহিনী—এ সবই নাকি পরবর্তীকালের সংযোজন। আবার মূল পাঁচ কাণ্ডের মধ্যেও রামের বিষ্ণুকল্প সাধনের জন্য খুচরো কতগুলি শ্লোক আছে যেগুলি অতি সহজেই পৃথক করে ফেলা যায়। আমাদের বিপদ হল এই যে, কালে কালে যে সংযোজনগুলি ঘটেছে তার বয়সও কম নয়, অর্থাৎ কিনা অনেক ক্ষেত্রে এই সংযোজন এবং প্রক্ষেপ ঘটেছে খ্রীস্টপূর্ব

সময়ে। অপিচ ভাস, কালিদাস কিংবা ভবভূতির মত মহাকবি খ্রীস্টজন্মের এদিক-ওদিক সময়ের মধ্যেই তাঁদের প্রকৃষ্ট কাব্য-নাটকগুলি লিখেছেন এই প্রক্ষিপ্ত কাণ্ডগুলিকে অবলম্বন করেই। কাজেই কাহিনীর দিক দিয়ে অতি বৃদ্ধ এই প্রক্ষেপগুলিকে, একেবারে কিছুই নয়, বলে উড়িয়ে দিই কি করে। তবে মনে রাখতে হবে ভগবত্তা, অলৌকিকত্ব এবং ঐশ্বর্যই রামায়ণের বালকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড জুড়ে বসে আছে। এই ভগবত্তা বিষয়ক প্রস্তাবগুলিই কিন্তু সাত কাণ্ডে ব্যাপ্ত এক অভিনব রূপ ধরেছে প্রাদেশিক কবিদের হাতে। রামের এই ভগবত্তাই কিন্তু মূল পার্থক্যরেখা, যেটি রামায়ণের আদিস্তরকে তার বালকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড থেকে আলাদা করে রেখেছে, ঠিক যেমনটি আলাদা করে রেখেছে প্রাদেশিক রামায়ণগুলিকে।

সবাই জানেন, বাল্মীকির প্রধান বিশেষণ হল—তিনি ক্রৌঞ্চবিরহী কবি। তবে ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে যেটি ব্যাধের হাতে মারা পড়ল সেটি ক্রৌঞ্চী না ক্রৌঞ্চ, তা নিয়েও বিবাদ আছে। বনবাসে রাম-সীতার মধ্যে যে বিরহের ব্যবধান ঘটেছিল, সেই ঘটনার প্রতীক হিসেবেই নাকি ব্যাধের হাতে একজনের মৃত্যু। সার্লট ভদভিল্ সাহেবা থেকে আরম্ভ করে বরোদা থেকে যাঁরা রামায়ণের পরিশুদ্ধ সংস্করণ বার করেছেন, তাঁরা সবাই এই ক্রৌঞ্চবিরহ এবং প্রথম শ্লোকের উৎপত্তি কাহিনীটি বাল্মীকির জীবন থেকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু ক্রৌঞ্চবধের প্রসঙ্গে 'মা নিষাদ' বলে যে শ্লোকটি বাল্মীকির মুখ দিয়ে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল, তা বোধহয় রামায়ণের অনেক বিখ্যাত ঘটনার থেকেও বিখ্যাত। কোমলপ্রাণ কৃত্তিবাসের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু চতুর্থ খ্রীস্টাব্দের কালিদাস, ধ্বনিকার আনন্দবর্ধনের মত আলঙ্কারিক কিম্বা রাজশেখরের মত কবি মনীষীও গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, ক্রৌঞ্চবিরহী কবির গভীর শোকই শেষ পর্যন্ত শ্লোকের আকার ধারণ করেছিল। কবিদের এই দৃঢ়মূল বিশ্বাস আমরা একেবারে হেলা করি কি করে? তবে হ্যাঁ, কৃত্তিবাস যে দস্যু রত্নাকরকে ভক্তিরত্নাকর বানিয়ে দিয়েছেন, তার পেছনে চৈতন্যপূর্বযুগের ভক্তি আন্দোলনের হাওয়া ছিল। মূল রামায়ণে বাল্মীকির এই মন পরিবর্তনের কাহিনীটি কোথাও নেই। তা ছাড়া 'মড়া, মড়া' অথবা 'মরা মরা' বারংবার আবৃত্তিতে না হয় রাম হল কিন্তু সংস্কৃতে 'মরা' বলে যেহেতু মৃত্যুর কোন প্রতি শব্দও নেই, তাই সংস্কৃত রসনায় রাম নাম উচ্চারণ অত সহজে হবে না। দীনেশ সেনমশায় আবার বলেছেন যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নিজামুদ্দিন আউলিয়া বা নিজাম ডাকাতের মন পরিবর্তনের কাহিনীই কৃত্তিবাসের রত্নাকর দস্যুকে ভক্তিরত্নাকর

বানিয়েছে। সে না হয় দস্যুবৃত্তির কথা নিয়ে গল্পগাথা বানানো হয়েছে, কিন্তু কৃত্তিবাস যে লিখেছিলেন 'চ্যবনমুনির পুত্র নাম রত্নাকর।দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর'—এই কথাটা বড় দামি। তাছাড়া, বামুন ওঝা কৃত্তিবাস! মুসলমান ডাকাতের রূপকল্প ব্যবহার করতে যাবেন কেন? তাঁর তো বামুনপনা কম ছিল না। স্কন্দ পুরাণে বাল্মীকি এক জায়গায় বলেছেন যে, তাঁর শৈশব এবং যৌবন কেটেছিল বনবাসী কিরাত আর অনার্যদের সঙ্গে। আর্যদের পরিশীলিত শিক্ষা তাঁর জীবনে ছিল না, ব্রাহ্মণ্য ভাবধারায় তাঁর মত পরিবর্তন হয়েছে অনেক পরে। কৃত্তিবাস যখন তাঁর রামায়ণ লিখেছেন, তখনকার বিদ্বৎসমাজে পুরাণগুলির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কৃত্তিবাস তাই স্কন্দ পুরাণের তথ্যটি মূলত অবহেলা করতে পারেননি; তাছাড়া খোদ রামায়ণের মধ্যেই একদিকে নিষাদরাজ গুহক, বানর এবং রাক্ষসদের সঙ্গে রামের গভীর মেলামেশা এবং অন্যদিকে পরবর্তী উত্তরকাণ্ডে শূদ্র শম্বুকের তপশ্চরণে রামের ক্রোধ—এ সব কিছু বাল্মীকির আপন জীবনেরই প্রতিফলন নয় তো? আরেক কথা। প্রাদেশিক ভাষার অন্য রামায়ণগুলি একবারের তরেও বাল্মীকিকে 'চ্যবনমুনির পুত্র' বলেনি। অথচ রামায়ণ রচনার ব্যাপারে মহর্ষি চ্যবনের প্রসঙ্গ এসেই পড়ে। একেবারে প্রথম খ্রীস্টাব্দের কবি অশ্বঘোষ তাঁর 'বুদ্ধচরিত' গ্রন্থে লিখেছেন—চ্যবনমুনিই নাকি রামায়ণ রচনা আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু এ-কাজ তাঁর পক্ষে শেষ করা সম্ভব হয়নি। কাজটি সুসম্পন্ন করেন বাল্মীকি—বাল্মীকিরাদৌ চ সসর্জ পদ্যং জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহর্ষিঃ ॥ পণ্ডিতেরা আবার বলেন যে, উইঢিবির গপ্পোটা চ্যবনের ব্যাপারেই প্রথম উল্লিখিত হয়েছে মহাভারতে। কাজেই একই ভার্গববংশের চ্যবন আর বাল্মীকির মধ্যে যে একটা সম্পর্ক কৃত্তিবাস বার করেছেন, সেটা খুব ফেলনা নয়।

যাই হোক আমরা রামলীলার আসরে বসে কবিওয়ালাদের জীবনচর্যা আরম্ভ করেছি; তবে তার প্রয়োজন এইটুকুই যে, এঁদের পথ ধরেই আমাদের রামলীলার আসরে প্রবেশ করতে হবে। রামের জন্মকথা দিয়েই যদি রামকাহিনী আরম্ভ করি তবে তারও পূর্বকথা আছে। আছেন মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ, যার অমৃতপরশে 'পতিতারা' পর্যন্ত নিজেকে নতুন করে উপলব্ধি করেছে। মজা হল, কার্যসিদ্ধি করার জন্য গণিকা নিয়োগ করে কাওকে ভুলানো—এই অতি আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার ইতিহাসে বোধহয় প্রথম করেছেন বাল্মীকি। রাজকার্য সিদ্ধির জন্য তিনিই প্রথম বারাঙ্গনাদের পাঠিয়েছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে ভোলাতে। রামায়ণ সমাজের নীতিবাগীশ লোকেরা বাল্মীকির এই আচরণে অখুশি হননি, অখুশি

হইনি আমরাও। বাল্মীকির বারাঙ্গনারা নারী-পুরুষের ভেদ-জ্ঞানহীন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে ভোলাতে ফলের বদলে মিষ্টি খাইয়েছিল আর দিয়েছিল কোমল বাহুর আলিঙ্গন—ততস্তা স্তং সমালিঙ্গ্য সর্বা হর্ষসমন্বিতাঃ। মোদকান্ প্রদদুস্তস্মৈ...। কৃত্তিবাস কিন্তু বারাঙ্গনার বিষয় পেয়ে অল্পেতে খুশি হননি। বেশ্যাদের মধ্যে যেমন বয়স্কা 'মাসি' থাকে তেমনি এক বুড়ির আমদানি করেছেন। ঘটনা এগিয়েছে তারই ব্যবস্থাপনায়। ঋষ্যশৃঙ্গের পালকপিতা বিভাণ্ডক ফিরে এলে শৃঙ্গী মুনির মুখ দিয়ে বারাঙ্গনাদের অঙ্গবর্ণনার একটা বাতুল চেষ্টাও কৃত্তিবাস দেখিয়েছেন। অবোধ মুনির ভাষায় বারাঙ্গনাদের পয়োধর—'বেলের মতন দুটা মাংসপিণ্ড বুকে' এবং 'তাতে যদি হস্তটি করাই পরশন। স্বর্গবাস হাতে পাই হেন লয় মন' ॥ এতে বুঝি কৃত্তিবাস অবোধের মনেও কেমন একটা বোধ আনতে চেয়েছেন। ভক্তিতে গদ্‌গদ তুলসীদাস কিন্তু বারাঙ্গনার প্রসঙ্গে ভীষণ সঙ্কুচিত। ঋষ্যশৃঙ্গের সমস্ত গল্প উহ্য রেখে তিনি তাকে সোজাসুজি দশরথের রাজসভায় নিয়ে এসেছেন একটিমাত্র পঙ্‌ক্তিতে—সৃঙ্গী রিষিহি বসিষ্ঠ বোলাবা। পুত্রকাম সুভ জজ্ঞ করাবা ॥ ঠিক একই কায়দা কম্ব রামায়ণেও, যদিও রঙ্গনাথের তেলেগু রামায়ণে গল্পটি ঠিক আছে। ঋষ্যশৃঙ্গের আসল পরিচয় কিন্তু তিনি দশরথের জামাই। চার ছেলের অনেক আগে দশরথের মেয়ে হয়েছিল, তার নাম শান্তা। দশরথের কোন স্ত্রীর গর্ভ থেকে তার জন্ম, কন্যা-জন্মের অবহেলায় তা উপেক্ষা করেছেন বাল্মীকি এবং দশরথও তাকে দত্তক দিয়েছিলেন বন্ধু লোমপাদের হাতে। তিনিই তাকে মানুষ করেছেন এবং বিয়েও দিয়ে দিয়েছেন ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে। 'বংশকর' পুত্রের জন্য শেষ পর্যন্ত এই অবহেলিত কন্যার বরকেই প্রণাম করে যজ্ঞের কাজে বরণ করতে হল দশরথকে—ততঃ প্রণম্য শিরসা তং বিপ্রং দেববর্ণিনম্। যজ্ঞায় বরয়ামাস সন্তানার্থং কুলস্য চ ॥

বাল্মীকিতে দেখি শৃঙ্গী মুনির যজ্ঞ থেকে যজ্ঞপুরুষ আবির্ভূত হয়ে দশরথের হাতে দিব্য পায়স প্রদান করলেন। এই যজ্ঞপুরুষকে কৃত্তিবাস বলেছেন বিষ্ণু বলে, তুলসী এঁকে ভেবেছেন অগ্নি আর কম্ব রামায়ণে পায়সের পাত্র হাতে যে উঠে এল সে নাকি একটা 'ভূত'। 'অমৃতপিণ্ড'টি রেখেই সে মিলিয়ে গেছে আগুনে। এরপর পায়েসের ভাগাভাগি নিয়েও নানা মুনির নানা মত। প্রথমেই মনে রাখা দরকার মহারাজ দশরথের পত্নীক্রমে কৈকেয়ী যে মেজোরানী, সে ধারণাও আমাদের হয়েছে কৃত্তিবাসের কল্যাণে। মূল রামায়ণ অনুযায়ী কৈকেয়ী দশরথের ছোটরানী, রাম তাঁকে বলেছেন 'জননী মে যবীয়সী'। কৈকেয়ী কেকয়দেশের পাঞ্জাবী মেয়ে এবং রাজার বুড়ো বয়েসের বউ বলেই রাজার

প্রাণের থেকেও প্রিয়তরা—স বৃদ্ধ স্তরুণীং ভার্যাং প্রাণেভ্যো'পি গরীয়সীম্।

দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পর রানীদের চরু খাওয়ানোর সময়ে দেখি দশরথ কৌশল্যাকে সমস্ত চরুর অর্ধেকটা দিয়েছেন। যে অর্ধেক থাকল তারও অর্ধেকটা আগেই দিলেন সুমিত্রাকে—অর্ধাদর্ধং দদৌ চাপি সুমিত্রায়ৈ নরাধিপঃ। এতেও বুঝি তিনিই মেজোরানী। এবার যে অর্ধেক থাকল, তাও পুরোটাই দশরথ কৈকেয়ীকে দেননি। দিয়েছেন তারও অর্ধেক। যেটুকু হাতে রেখেছিলেন, সেটুকু বেশ চিন্তাভাবনা করে শেষ পর্যন্ত সুমিত্রাকেই দিলেন—অনুচিন্ত্য সুমিত্রায়ৈ পুনরেব মহামতিঃ। আমাদের ধারণা দশরথ কনিষ্ঠা কৈকেয়ীর প্রতি অত্যাসক্ত ছিলেন বলেই মনে মনে হয়তো কিছু পাপবোধ ছিল, কিন্তু পুত্রজন্মের ব্যাপারে সুমিত্রাকে তিনি ধর্মত এড়িয়ে যেতে চাননি। আর ওই যে সুমিত্রাকে দুবার চরু দেওয়া হল তারই সূত্র ধরে প্রাদেশিক রামায়ণকারেরা গপ্পোটাকে তাঁদের ছাঁচে সাজিয়ে নিলেন। কৃত্তিবাসের বর্ণনায় দশরথ কিন্তু চরুহাতে মধ্যযুগীয় বাঙালি বাড়ির বড়ঠাকুরের মত ভেতর-ঘরে এসেছেন এবং সামনে কৌশল্যা এবং কৈকেয়ীকে দেখে অর্ধেক অর্ধেক পায়েস দিয়েই ফিরে গেছেন বড়বাবুর মত। মজা হল দিবাকর ভট্টের কাশ্মীরী রামায়ণেও দশরথের ব্যবহারটা বাঙালি বড় কর্তার মতই। রুচিশীল তুলসীদাস আবার বাল্মীকির ভাগাভাগিটা ঠিক রেখেছেন কিন্তু দশরথ পায়েসটা কৌশল্যা আর কৈকেয়ীর হাতে দিয়ে তাঁদের দিয়েই সুমিত্রার হাতে দেওয়ালেন—কৌসল্যা কৈকঈ হাথ ধরি। দীনহ্ সুমিত্রহি প্রসন্ন করি। আমাদের কৃত্তিবাস কিন্তু সুমিত্রাকে একেবারেই এলেবেলে করে দিয়েছেন। তাঁকে রাজা একফোঁটাও পায়েস দেননি। কোথা থেকে 'ঊর্ধ্বশ্বাসে' ছুটে এসে তিনি দেখলেন পায়েসের ভাগাভাগি শেষ। শেষ পর্যন্ত দয়াবতী কৌশল্যা অর্ধেকটা পায়েস দিলেন এই আশ্বাসে যে সুমিত্রার ছেলে তাঁর ছেলের সঙ্গী হবে। আর কৈকেয়ীর ওপর কৃত্তিবাসের যেন জন্মরাগ। কৌশল্যার কায়দা দেখেই যেন 'ক্রূরমতি' কৈকেয়ী সুমিত্রাকে আধভাগ চরু দিয়ে তাঁর ছেলের জন্য একজন দেহরক্ষী ঠিক করে রাখলেন। সুমিত্রাও প্রতিজ্ঞা করলেন—'তোমার পুত্রের দাস আমার নন্দন।'

আসলে প্রাদেশিক কবিদের মুশকিল হল, বাল্মীকি রামায়ণের ভবিষ্যৎ তাঁদের আগে থেকেই জানা। অতএব তাঁদের রামায়ণের আবহ তৈরি হয়েছে সেইভাবেই। একই কারণে এমন কোন কথা তাঁরা বলতে চাননি যাতে প্রসিদ্ধ চরিত্রের গায়ে কলঙ্কের লেশমাত্র লাগে কিম্বা সুকুমারমতি পাঠকের ভক্তিভাবনায় আঘাত লাগে কোন। সুমিত্রার দুই ছেলে অন্য দুই রানীর পুত্রদের চিরসঙ্গী।

সুমিত্রার এই দুর্ভাগ্যের পূর্ব কারণ হিসেবে কৃত্তিবাস যা বলেছেন তা কিন্তু সেই মধ্যযুগীয় বাঙালির চিরন্তন বিশ্বাসের কথা। দশরথ নাকি কৌশল্যা আর কৈকেয়ীকে লুকিয়ে লুকিয়ে সুমিত্রাকে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন সিংহল দেশে। মূল রামায়ণে কিন্তু সুমিত্রার পিতৃপরিচয় জানাই যায় না। শুধু কালিদাস বলেছেন যে সুমিত্রা মগধের মেয়ে। যাই হোক কৃত্তিবাসকল্পিত সেই সিংহলে গিয়ে দশরথ আপন কুলের বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, শুভদৃষ্টি, শয্যাতোলানি, বাসি বিয়ে—সব একেবারে বাঙালিমতে করেছেন। কিন্তু সুমিত্রাকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসবার পথে রাজা সুমিত্রার রূপ দেখে আর থাকতে পারলেন না—বিলম্ব না সহে রাজা করে ইচ্ছাচার। রথের উপরে রাজা করেন শৃঙ্গার ॥ কৃত্তিবাসের মতে, সেদিন ছিল বাসিবিয়ের দিন এবং কালরাত্রি ; এইদিনে এত সব কাণ্ড করার ফলেই নাকি সুমিত্রা দুর্ভাগা হয়েছেন, তাঁর ছেলেগুলোও তাই খালি বাইরে বাইরে থাকে। এই একটিবার মাত্র কৃত্তিবাস দশরথের ধৈর্যচ্যুতির বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাও সে দোষে দশরথের কিছু হয়নি, দুর্ভাগা হয়েছেন সুমিত্রা।

যা হোক দুর্ভাগা সুমিত্রারও ছেলে হয়েছে বাল্মীকি রামায়ণে, সে ছেলে দুটি রাম আর ভরতের পেছন পেছন ঘোরে এবং তাতে সুমিত্রারও কোন কষ্ট নেই। সব ছেলেরই নামকরণ, চূড়াকরণ বেদবিধি অনুসারে ক্রমে ক্রমে যেমন চলতে থাকল, তেমনি প্রাদেশিক কবিরাও থেমে থাকলেন না। যে কবির কাছে যৌবনকালটাই বেশি রসঘন, তিনি রামের যৌবনটি তুলে রাখলেন অনুকূল সময়ের জন্য, আর সেই অবসরে তুলসীদাস রামের বাল্যলীলায় মিশিয়ে দিলেন গোপালকৃষ্ণের শৈশব-লীলার মায়া। নিঃসন্দেহে তুলসীদাসের উৎসমুখ ছিল অধ্যাত্ম-রামায়ণ, যে রামায়ণ ভাগবত-পুরাণের কায়দায় রামের জন্মকালে কৌশল্যার মুখে দেবকীর বিষ্ণু-স্তুতি বসিয়ে দিয়েছেন, যে রামায়ণ রামের বাল্যলীলা বর্ণনা করেছে যশোদাদুলালের ছাঁচে ফেলে। তুলসীদাসের কৌশল্যা যখন রামের নাম ধরে ডাকেন, রাম তখন নেচে নেচে পালান—কৌসল্যা জব বোলন জাই। ঠুমুকি ঠুমুকি প্রভু চলহি পরাঈ ॥ এ থেকেই রাগপ্রধানীরাও গান ধরলেন—ঠুমক চলত রামচন্দ্র···। আগম, নিগম, শিব যাঁকে তন্ন তন্ন করে খোঁজে তাঁকে রাম-জননী ধরতে যান দৌড়ে। ভাগবতে দামবন্ধনের আগে ঠিক একই রকমভাবে কৃষ্ণের পেছনে দৌড়েছিলেন যশোদা—গোপী অন্বধাবন্ ন যমাপ যোগিনাং/ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ। তুলসীর রামায়ণে ধুলায় ধূসর রামকিশোরকে দেখতে পাই পরম প্রশ্রয়ী দশরথের কোলে ; ক্ষণে ক্ষণে বাল্যচপল রামচন্দ্র দই-ভাত-জ্যাবড়ানো মুখেই খল খল করে হেসে ছুটে

পালায়—ভাজি চলে কিলকত মুখ/দধি-ওদন লপটাই।

ক্ষত্রিয় শিশুর এই দুধেভাতে ল্যাপটানো মুখের ছবি মহাকবি বাল্মীকির কল্পনাতেও ছিল না, যার জন্য পুত্রজন্মের উৎসব মিটতে না মিটতেই মহাতেজা বিশ্বামিত্রের আগমন ঘটেছে বাল্মীকির রামায়ণে। ক্ষত্রিয়পুত্রের বীরত্ব-পরীক্ষার সময় এসে গেছে পুত্রজন্মের পরের সর্গেই। বিশ্বামিত্র দশ দিনের জন্য নিয়ে যেতে চাইলেন রামকে। পনের বছরের ছেলেকে যুদ্ধ জয় করার জন্য পাঠাতে বৃদ্ধ পিতার মনে যে আশঙ্কা থাকে বাল্মীকির দশরথের মনেও সেই ব্যাকুলতা জেগেছিল। মহর্ষি বশিষ্ঠের পরামর্শে সে ব্যাকুলতা রাজোচিত ঔদার্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কৃত্তিবাসের দশরথ বিশ্বামিত্রের ভয়ে রামলক্ষ্মণের নাম ভাঁড়িয়ে পরিবর্তে ভরত-শত্রুঘ্নকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বামিত্রের কাছে, ভরত-শত্রুঘ্নের ক্ষাত্রবীর্য যে তাতে লঘু হল, সে চিন্তা কৃত্তিবাসের নেই। তুলসীদাস কম্বন কি রঙ্গনাথ—এঁরা সবাই যদিও এক্ষেত্রে বাল্মীকির অনুযায়ী, কিন্তু তাড়কা-বধের ঘটনাটি, তাঁরা অল্পকথায় সেরে দিয়েছেন, তাড়কা-বধও করেছেন এক নিমেষে। কৃত্তিবাস বিশ্বামিত্রের পূর্বাশ্রমের ক্ষাত্রতেজ এবং উত্তরকালের ব্রাহ্মণ্যের মাথায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে তাড়কার ভয়ে ভীতু এক ব্রাহ্মণ-বটু তৈরি করেছেন। তাড়কাকে একবারের তরে দেখিয়ে দিয়েই তিনি দৌড়ে পালান, যদিও মূল রামায়ণে তিনি শেষ পর্যন্ত রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে থাকেন এবং উপদেশ দেন।

রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে পথে যেতে যেতে বিশ্বামিত্র পৌঁছোলেন গৌতম মুনির আশ্রমে, যেখানে পাষাণী হয়ে আছেন অহল্যা। অহল্যার কাহিনীটি বাল্মীকি যেমন মুক্তকণ্ঠে বর্ণনা করেছেন, সেই রকম বর্ণনা করার সাহসই পাননি কোন কবি। সমস্ত প্রাদেশিক কবিরাই তামাম দোষ চাপিয়ে দিয়েছেন ইন্দ্রের ঘাড়ে, যিনি অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করেছিলেন। অন্যদিকে অহল্যা হয়ে গেছেন সরলা সতীলক্ষ্মীর প্রতীক, 'মহাপাতকনাশিনী' পঞ্চকন্যার মধ্যে যাঁর নাম স্মরণ করতে হয় প্রথমে—অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা। পঞ্চকন্যাং স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশিনীম্ ॥ মূল রামায়ণে অহল্যা গৌতমের শাপে পাষাণী হননি, মুনির কোপাগ্নিতে এবং অনুতাপে তিনি হয়েছিলেন ভস্মশায়িনী, সকলের অদৃশ্যা—বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী। অদৃশ্যা সর্বভূতানাং আশ্রমে'স্মিন্ বসিষ্যসি। রাম আশ্রমে আসামাত্রই অদৃশ্যা অহল্যা তপঃপ্রভায় উদ্ভাসিতা হয়ে, উঠলেন অথচ প্রাদেশিক রামায়ণগুলির সর্বত্রই অহল্যা হয়ে গেছেন পাষাণী, এবং এর উৎস বোধহয় মহাকবি কালিদাস, যিনি প্রথম

বলেছিলেন, 'গৌতমবধূঃ শিলাময়ী'। অহল্যার কাহিনী নিয়েও মূল রামায়ণের সঙ্গে দেশজ রামায়ণগুলির পার্থক্য বিস্তর। বাল্মীকির মতে, অহল্যা তিন ভুবনের সেরা সুন্দরী। বিধাতা তাঁকে সৃষ্টি করে এমন বিপদে-পড়েছিলেন তাঁকে রাখবার জায়গা পর্যন্ত পাচ্ছিলেন না। শেষে জিতেন্দ্রিয় গৌতম মুনির কাছে তাঁকে রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দেন। বাল্মীকি লিখেছেন—অহল্যার এমন রূপ যে আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে 'মায়াময়ী' বলে মনে হত—দিব্যাং মায়াময়ীমিব। বিবাহিতা অহল্যা যখন ঘোমটার আড়ালে চলে গেছেন, ঠিক এই সময়েই গৌতমের ছাত্র ইন্দ্রের প্রবেশ। ইন্দ্র অহল্যার রূপে মোহগ্রস্ত কিন্তু কিছুতেই সুযোগ পান না গুরুপত্নীর সঙ্গে নির্জনে সঙ্গত হবার। রঙ্গনাথ রামায়ণ লিখেছে—ইন্দ্র নাকি গৌতম মুনির তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য তার পত্নীকে কলুষিত করেছেন ; বাল্মীকি রামায়ণে দেবসভায় আপন লজ্জা ঢাকার জন্য এইরকম একটা কথা প্রচার করেছিলেন মাত্র। রঙ্গনাথের রামায়ণে ইন্দ্র মুরগীর রূপ ধরে কোঁকর-কোঁ ডেকে গৌতম-গুরুকে ভোরবেলার সঙ্কেত দিচ্ছিলেন। মুরগীর ডাক শুনে মুনি ব্যস্তপদে সন্ধ্যাআহ্নিক করার জন্য বেরোলেন। সুযোগ বুঝে মনের বাসনা মেটাতে ইন্দ্র গৌতম মুনি সেজে অহল্যার সঙ্গে মিলিত হলেন। মজা হল, অহল্যা কিন্তু ইন্দ্রকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন এবং এ-তথ্যটি বাল্মীকি রামায়ণেও আছে। তামিলভাষী কম্বনও মূল থেকে বেশি সরে আসেননি, যদিও আশ্রম থেকে পালাবার সময় ইন্দ্র এখানে পালিয়ে গেছেন বেড়ালের রূপ ধরে। আমাদের কৃত্তিবাসে কিন্তু এসব মুরগী কিম্বা বেড়ালের উৎপাত নেই, সমস্ত দোষই এখানে ইন্দ্রের। মধ্যযুগের সতীধর্মের বিড়ম্বনায় ইন্দ্ররূপী নকল গৌতমের শৃঙ্গারেচ্ছামাত্র অহল্যা 'তখনি শয়নগৃহে করিল গমন'। আসল গৌতম এসে অসময়ে আপন স্ত্রীর এলোথেলো চুল উতলা আঁচল দেখে সন্দেহ প্রকাশ করতেই অহল্যা সরলভাবে জবাব দেয়—'আপনি করিয়া কর্ম দোষহ আমারে।' প্রিয় শিষ্যের 'গুরুদক্ষিণা' দেবার ঢঙ দেখে গৌতম তাকে শাপ দিলেন। তার সমস্ত শরীর স্ত্রী-চিহ্নে ভর্তি হয়ে গেল। মুনির শাপে অহল্যাও হলেন পাষাণী। মুনির লজ্জাই যেন প্রস্তরের রূপ নিল।

বাল্মীকি রামায়ণে কিন্তু অহল্যার ঘটনাটি অনেক বেশি বাস্তবানুগ, অনেক বেশি সত্যি। আধুনিক বাগধারায় 'বিছানায় শোয়া' শব্দটি অত্যন্ত খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হলেও ওই একই অর্থে 'গুরুতল্পগ', কিম্বা 'গুরুতল্পগামী' শব্দগুলি সেকালেও লক্ষ করার মত। 'তল্প' মানে বিছানা ; 'গুরুতল্পগামী' বলতে বোঝায় তাকেই, যে গুরুর বিছানায় গুরুপত্নীর সঙ্গে সঙ্গত হয়। একটা সাধারণ কথা

আগে বলে নেওয়া ভাল। সেটা হল, সেকালের দিনে গুরু-শুশ্রূষা যতই চালু থাক, গুরুপত্নীর শুশ্রূষা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। স্বয়ং মনুর মতে গুরুপত্নীকে অবশ্যই শ্রদ্ধা করতে হবে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। শ্রদ্ধা জানানোর জন্য গুরুপত্নীর পা-ছোঁয়া পর্যন্ত বারণ, খুব বেশি হলে তাঁর পায়ের কাছে মাটি খামচে ধরে নিজের নাম বলে প্রণাম করা যায়। মনু আরও অনেক কথা বলেছেন, তবে গুরুপত্নীর ব্যাপারে এত যে কড়াকড়ি, তাতে আমাদের এই বিশ্বাস জন্মেছে যে সেকালের অনেক দুর্বার শিষ্যেরা গুরুসেবার সঙ্গে সঙ্গে গুরুপত্নীদেরও কিছু সেবা করার চেষ্টা করত। এই সেবার চরম পরিণতি ছিল 'গুরুতল্পগমন' অর্থাৎ গুরুর বিছানায় উঠে পড়া। আসল কথা সেকালের দিনে ঐহিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষাতে ব্রাহ্মণেরাই গুরু হতেন এবং বিদ্যার গৌরবে শুষ্ক রুক্ষ বয়স্ক মুনিদেরও সরসা তরুণী বউ জুটে যেত। কখনও বা রুদ্ধযৌবন মুনিদের দৃষ্টি পড়ে যেত রাজা-রাজড়ার সুন্দরী কন্যাদের দিকেও। অভিশাপের ভয়ে রাজারাও বাধা দিতেন না, এমন দৃষ্টান্তও আছে অনেক। অতএব বিয়েও হত, পুত্রাদিও হত, কিন্তু বয়স্ক গুরুর যুবতী স্ত্রীদের মন বলে যে জিনিসটা থাকত, সেটার গতিবিধি সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ গুরুরা অনেক সময়ই খেয়াল করতেন না। কিন্তু যুবতী স্ত্রীদেরই সমানবয়সী যুবা ছাত্র-শিষ্যেরা সেই মনের ব্যাপারে অনবহিত থাকবেন কেন। মনু বারবার তাই যুবা শিষ্য এবং যুবতী গুরুপত্নী সম্বন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। বাস্তবে কিন্তু, এই সব যুবা-শিষ্যদের সন্ধানী দৃষ্টি প্রায়ই অন্তরালবর্তিনী গুরুপত্নীকে অভিষিক্ত করত এবং কুত্রাপি প্রতিদানও মিলত।

আমাদের ধারণা, ঠিক এই ঘটনাটিই ঘটেছে বাল্মীকি রামায়ণের অহল্যার কাহিনীতে। সময়টা সকালবেলাই বটে। মহর্ষি গৌতম স্নানে গেছেন। কিন্তু সেই সাত সকালেই অহল্যার মনে কেমন রঙিন নেশা লেগেছিল। সেই সকালেই তিনি শৃঙ্গারোচিত সাজসজ্জায় শিঙার করে বসেছিলেন, অন্তত রামায়ণের তিলকটীকা তাই লিখেছে—'সঙ্গমোচিতরূপ-প্রসাধনবতি'। সময় বুঝে ইন্দ্র মুনির বেশে প্রবেশ করলেন পর্ণশালায়। বললেন—শৃঙ্গারী ব্যক্তির সময়-অসময় নেই—সঙ্গমং তু অহমিচ্ছামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে। বাল্মীকি লুকোননি ; অহল্যা মুনিবেশী ইন্দ্রকে ঠিক চিনতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন, বহুকাল ধরে ইন্দ্র তাঁকে মনে মনে চান—বহুকালম্ অভিলাষশ্রবণাৎ (টীকা গোবিন্দরাজ)। তা হলে ধরা দেবেন বলেই কি তিনি সেজেগুজে বসেছিলেন ? নিজের অলোকসামান্য রূপ এবং দেবতাদের রাজা সেই রূপের ভিখারি—এমন একটা আপ্লুতিই তাঁকে পেয়ে বসল, আর্যরতির চেয়ে শৃঙ্গার কুশল দেবরাজের

রমণেচ্ছাই তাঁর কাছে প্রিয়তরা মনে হল—দিব্যরতিকৌতুকাৎ। "এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছু রূপের সেবা করিব"— এই ভাবনায় শুধুমাত্র দেবরাজের রসরতি আস্বাদনের জন্যই অহল্যার ধৈর্য নষ্ট হল, তিনি মিলিত হলেন ইন্দ্রের সঙ্গে—মতিং চকার দুর্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ। স্ত্রীলোকের ব্যাপারে ইন্দ্র চিরকালই দুর্বল, বহুবাসনায় প্রাণপণে যা চেয়েছিলেন, আজ তাই তৃপ্ত হল। তিনি আজ কৃতার্থ। আর অহল্যা ! কালিদাস লিখেছেন, ক্ষণকালের জন্য হলেও তিনি যেন ইন্দ্রের পত্নীপদ লাভ করেছিলেন— বাসবক্ষণকলত্রতাং যযৌ। ব্যঞ্জনা-মুখর কবির শব্দচয়নেই বোঝা যায় যে ব্যাপারটা অহল্যার অমতে হয়নি। কিন্তু কম্বন, কৃত্তিবাস কি রঙ্গনাথ যে অহল্যার কথা লিখেছেন, সেই অহল্যা বাল্মীকি রামায়ণে কি করল জানেন ? রতিমুক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে আনন্দে দেবরাজকে আপ্লুত করে অহল্যা বললেন—আমি আজ কৃতার্থ হয়েছি, সুরশ্রেষ্ঠ। এখন আমি এবং আপনি দুজনেই যাতে এই নিন্দাপঙ্ক থেকে উদ্ধার পাই, সেইজন্য এই মুহূর্তে আপনি পালান—কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো। গোপন প্রণয়ীকে পার করে দেওয়ার অপচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হল না। মহর্ষি গৌতমবেশী ইন্দ্রকে ধরে ফেললেন এবং শাপ দিলেন যে, এই অপকর্মের ফলে ইন্দ্রের অণ্ডকোষই খসে পড়বে—বিফলঃ ত্বং ভবিষ্যসি। হলও তাই। সাবধানী প্রাদেশিক কবিরা ইন্দ্রের সারা গায়ে সহস্র স্ত্রী-চিহ্ন এঁকে দিয়ে আবার তাঁকে দিয়েই অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়ে সহস্র স্ত্রী-চিহ্নের পরিবর্তে ইন্দ্রের সহস্রলোচনের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু বাল্মীকিতে ইন্দ্রকে 'সফল' করার জন্য মেষের অণ্ডকোষ জুড়ে দিতে হয়েছে, যার জন্য তাঁর নাম হয়ে গেছে 'মেষবৃষণ'।

গৌতম মুনির পর্ণশালায় পায়ের ধুলো পড়তেই ভস্মশয্যা ছেড়ে আলোর মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন অহল্যা, এবং বাল্মীকি রামায়ণে অহল্যা উদ্ধারের পরেই রাম-লক্ষ্মণ-বিশ্বামিত্র তিনজনেই রওনা দিয়েছেন মিথিলার রাজসভার উদ্দেশে। মাঝখানে পাটনী-মাঝির নৌকোখানা যে রামের পায়ের জাদুস্পর্শে সোনা হয়ে গেল, সে গল্প কৃত্তিবাসেই আছে, বাল্মীকিতে নেই। মিথিলায় জনকনন্দিনী সীতার বিবাহ, ধনুর্ভঙ্গ পণ। বাল্মীকি রামায়ণে এই রাজসভাতেই কথিত হয়েছে বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠের বিবাদ-বিসংবাদের কথা এবং বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তির কথাও। এই দুটি গল্পই পণ্ডিতেরা প্রক্ষিপ্তবাদের গহ্বরে ঠেলে দিয়েছেন বটে, তবে এর মধ্যে যে ঐতিহাসিকতার পুঁজি লুকানো আছে তা 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। আমরা

অবশ্য এখন সোজাসুজি জনকের বিবাহসভায় উপস্থিত হব। কৃষিক্ষেত্রে লাঙলের ফলকে ওঠা সীতার জন্ম নিয়ে কৃষিবিস্তারের রূপক সিদ্ধ হয়েছে অনেক দিনই এবং হলের মুখে সীতার জন্ম নিয়ে প্রাদেশিক রামায়ণগুলির মধ্যেও সম্পূর্ণ ঐকমত্য আছে। একমাত্র ব্যতিক্রম দিবাকর ভট্টের কাশ্মীরী রামায়ণ। এই রামায়ণের মতে সীতা হলেন রাবণ-পত্নী মন্দোদরীর মেয়ে। পূর্বে মন্দোদরী ছিলেন স্বর্গের হুরি এবং তিনি রাবণের বিনাশের জন্যই রাবণের বউ হয়ে জন্মান। রাবণ তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন বটে, তবে রাবণের অবর্তমানে, এমনকি অজান্তেই মন্দোদরীর এক মেয়ে হয়। মেয়ের ঠিকুজি-কুষ্ঠি বিচাব করে জানা যায় যে, সে তার পিতাকে হত্যা করবে এবং এই মেয়েকে যদি বিয়ে করার সুযোগ দেওয়া হয় তা হলে সে বিয়ে করবে এক বনবাসীকে। কিন্তু সেই বন থেকেই সে আবার লঙ্কায় আসবে লঙ্কার ধ্বংস সাধন করতে। এ সব কথা শুনে মন্দোদরী মেয়ের গলায় পাথর বেঁধে ফেলে দেন নদীতে। কিন্তু এ মেয়ে তো মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়। ভাসতে ভাসতে সে মিথিলার চাষের জমিতে এসে ঠেকল। সেখান থেকেই জনক সীতাকে তুলে নিয়ে আসেন। এর পরের ঘটনা অন্যান্য রামায়ণের মতোই। মন্দোদরী কোনদিন রাবণকে নিজের পেটের মেয়ের কথা বলতে পারেননি এবং যেদিন রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে এলেন, সেদিন আর কেউ না হোক মন্দোদরী কিন্তু মেয়েকে চিনেছিলেন। রাবণের কাছে অবশ্য এ সব প্রসঙ্গ তিনি তোলেননি, কিন্তু তাঁকে সাধারণভাবে যথেষ্ট সাবধান করেন। সীতা যে মন্দোদরীর মেয়ে এ কথা বাল্মীকি রামায়ণ একবারও বলেনি তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ খেয়াল করা দরকার। বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অগস্ত্য রামকে রাবণের পূর্বজীবনের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। তিনি বললেন—পুরাকালে বেদবতী নামে এক অতি সুন্দরী তপস্বিনী বিষ্ণুকে বর হিসেবে পাওয়ার জন্য হিমালয় পর্বতের কাছে এক জায়গায় তপস্যা করছিল। ভুবনবিজয়ী রাবণ ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে তাঁর সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তাঁকে বলাৎকার করতে উদ্যত হন। বেদবতী সক্রোধে বললেন—সামনের জন্ম তোকে বধ করার জন্য আবার আমি জন্মাব—তস্মাৎ তব বধার্থং হি সমুৎপশ্যাম্যহং পুনঃ। বেদবতী তখনকার মত অনলপ্রবেশ করলেন বটে তবে তিনি পরজন্মে এক পদ্মফুল থেকে সুন্দরী মেয়ে হয়ে জন্মালেন। সেই সুন্দরীকে দেখে রাবণ তাকে নিয়ে গেলেন লঙ্কায়। ভবিষ্যদ্‌বক্তা মন্ত্রীরা রাবণকে বললেন—এই মেয়ে ঘরে থাকলে ভীষণ বিপদ হবে। রাবণ তখন সেই সুন্দরীকে ভাসিয়ে দিলেন সাগরজলে। সেই মেয়েটিই জনকের যজ্ঞভূমির মাঝে এসে স্থান নিল—সা চৈব

ক্ষিতিমাসাদ্য যজ্ঞায়তনমধ্যগা। জনকের হলের মুখে সে আবার পুনঃপ্রকটিত হল।

দেখা যাচ্ছে সীতার জন্ম যে ভাবেই হোক না কেন, লঙ্কা এবং রাবণের সঙ্গে তাঁর একটা পূর্বসম্বন্ধ বাল্মীকি রামায়ণও অস্বীকার করে না। অদ্ভুত রামায়ণ বলে যে রামায়ণটি পাওয়া যায় এবং যে রামায়ণ থেকে কৃত্তিবাস তাঁর অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সেই রামায়ণেও কিন্তু সীতা মন্দোদরীরই মেয়ে। এখানকার ঘটনা অবশ্য আরও কৌতুকজনক এবং এই কন্যাজন্মের ব্যাপারে রাবণ পরোক্ষভাবে জড়িত। এখানে যেরকম অলৌকিকভাবে মন্দোদরীর গর্ভসঞ্চার হল সেই কথাটা সংক্ষেপে বলি। সেই রাবণ যখন অমরত্বের জন্য তপস্যা করছিলেন তখন ব্রহ্মা এসে তাঁকে 'অমরত্ব' ছাড়া আর যে কোন বর চাইতে বললেন। রাবণ মানুষকে শুধু 'খাবার' ভেবে অবহেলা করে অন্য সবার হাতে যাতে মরণ না হয় সেই বর চেয়ে নিলেন। অতি কামুক রাবণ নিজেকে চিনতেন বলে আরও একটি বর চাইলেন ব্রহ্মার কাছে। তিনি বললেন—আমি যদি কোনদিন নিজের মেয়েকে কামসাধনের জন্য প্রার্থনা করি এবং সে কন্যার যদি তাতে মত না থাকে, তা হলে সেই পাপেই যেন আমার মৃত্যু হয়—আত্মনো দুহিতা মোহাদ রত্যর্থং প্রার্থিতা ভবেৎ। তদা মৃত্যুর্মম ভবেৎ যদি কন্যা ন কঙ্ক্ষতি। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলে চলে গেলেন। রাবণ বাহুবলে তিন ভুবন জয় করে দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হলেন। সেখানে অগ্নিতেজী ঋষিদের দেখে ভাবলেন—এঁদেরও আমি জয় করব। কিন্তু খামোকা ঋষিবধে কোনই বীরত্ব নেই দেখে তিনি প্রত্যেক মুনির গায়ে বাণের খোঁচা মেরে একটু একটু করে রক্ত সংগ্রহ করে একটি কলসীর মধ্যে রাখলেন। এদিকে শতপুত্রের পিতা গৃৎসমদ ঋষি স্বয়ং লক্ষ্মীকে কন্যা হিসেবে লাভ করার জন্য প্রতিদিন মন্ত্রপূত দুগ্ধ সংগ্রহ করে রাখছিলেন সেই কলসীতেই, যেটিতে রাবণ মুনিরক্ত ভরে নিয়ে গেলেন লঙ্কায়। সেখানে গিয়ে মন্দোদরীকে হেঁকে বললেন—খুব সাবধান, এই কলসীর মধ্যে মুনিদের রক্ত আছে, বিষের থেকেও এর ক্ষমতা বেশি—বিষাদপ্যধিকং বিদ্ধি শোণিতং কলসে স্থিতম্—এ জিনিস কাওকে দিও না, নিজেও যেন খেও না। এদিকে ত্রৈলোক্য বিজয় সমাপন করে রাবণ হাজারো সুন্দরীদের নিয়ে আমোদ করতে গেলেন ভারতবর্ষের সমস্ত হিল-স্টেশনগুলিতে—আহৃতা রময়ামাস মন্দরে সহ্যপর্বতে। হিমবন্ মেরুবিন্ধ্যাদৌ···। মন্দোদরীর বড়ো কষ্ট হল। এতদিন পরে স্বামী ফিরলেন আর তাঁর এই ব্যবহার। তিনি বিষের থেকেও শক্তিশালী সেই দুধ-মেশানো রক্ত পান করলেন। এতে তাঁর মৃত্যু তো হলই না,

বরঞ্চ তার জায়গায় আগুন-হেন অদ্ভুত এক গর্ভসঞ্চার হল—গর্ভো জ্বলনসন্নিভঃ। লজ্জায়, ঘৃণায় শেষ পর্যন্ত তীর্থদর্শনের অছিলায় তিনি বেরিয়ে পড়লেন। ঘুরতে ঘুরতে কুরুক্ষেত্রে এসে তাঁর গর্ভ মুক্ত হল, সীতা জন্মালেন। তিনি সেখানেই তাকে মাটি চাপা দিয়ে সরস্বতীর জলে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে ফিরে গেলেন লঙ্কায়। কাউকে কিছু বললেন না। মহারাজ জনক হলকর্ষণ উৎসব সম্পন্ন করার জন্য উপস্থিত হলেন কুরুক্ষেত্রে—কুরুক্ষেত্রং সমাসাদ্য লাঙ্গলং যজ্ঞমাবহৎ। সোনার লাঙলের ফলায় মাটির ওপরে উঠে এল শিশুকন্যা। তাকে মহিষীদের হাতে দিয়ে নাম রাখলেন সীতা।

আমি অদ্ভুত রামায়ণের ঘটনাটি উল্লেখ করলাম এই জন্যে যে শুধু কাশ্মীরী রামায়ণ নয়, বিদেশে প্রচলিত অনেক রামায়ণেই সীতা মন্দোদরীর কন্যা এবং সেখানে সে কন্যাজন্মের ব্যাপারে রামপিতা দশরথেরও দায়িত্ব এসে যায়। আমি এত সব ঝামেলায় যাব না, কারণ এই নিয়ে বাদ-বিসংবাদ অনেক হয়ে গেছে এবং এখনও তার অবকাশ আছে। আমরা মূল রামায়ণের সীতা জন্মকথা ধরেই মিথিলার রাজসভায় হরধনুভঙ্গে যোগ দেব। এরই মধ্যে প্রাদেশিক কবিরা আবার সুযোগ বুঝে রামসীতার পূর্বরাগ সেরে নিয়েছেন। বাল্মীকি যার আভাস পর্যন্ত দেননি সেই পূর্বরাগের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন তামিলভাষী কম্বন। রাজবাড়ির জানলায় দাঁড়ানো সীতাকে দেখে রামের মনে দোলা লাগল আর রামকে দেখে সীতার এমন অবস্থা হল যে কম্বন কবি অন্তত চল্লিশটি পয়ার খরচা করে বসলেন তাঁর হৃদয়রাগ বোঝানোর জন্য। এ ব্যাপারে গোস্বামী তুলসীদাসও কম যান না। বাল্মীকির তোয়াক্কা না করে তিনি রামকে এনে ফেলেছেন এক ফুলের বাগানে আর সীতাকে সেইখানেই নিয়ে এসেছেন গৌরীপূজার ছলে। তারপর শুধুই বর্ণনা—যার সার কথা অবশ্যই—ইনি দেখেন ওঁকে আর উনি দেখেন তাঁকে—সরদসসিহি জগু চিতব চকোরী। তুলসীদাসের বর্ণনা স্তব্ধ করার কোন উপায় ছিল না, ভাগ্যিস এক সেয়ানা সখী সীতার চোখের পলকটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন—দীনহে পলক-কপাট সয়ানী। ভাগ্যিস আর এক চতুরা সখী সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—এই পাখীই কাল ফিরে আসবে আবার—পুনি আউব এহি চিরিয়াঁ কালী। আমাদের কৃত্তিবাস কিন্তু এসব পূর্বরাগের ব্যাপারে বাঙালি বাপের মতই সংরক্ষণশীল। হরধনুভঙ্গের মত একটা সংকুল সময়ে সীতাকে একবারমাত্র রাজবাড়ির ছাদে উঠতে দিয়েছেন তিনি আর কনে হয়ে বসা বাঙালি মেয়ের আশংকা নিয়ে সীতা সেখানে আকুল প্রার্থনা করেছে—'পাছে বা বিরিঞ্চি করে বঞ্চিত এ ধনে।'

মজা হল, চতুর্দশ শতাব্দীর কৃত্তিবাসী রামায়ণে দৈববাণী হয়েছে—'পাবে রাম, গৃহে যাও জনকনন্দিনী' আর ষোড়ষ শতাব্দীর তুলসীদাসের বাগানে গৌরীমাতা সীতাকে আশীর্বাদ করেছেন—সো বর মিলিহি জাহি মনু রাচা—যাকে তোমার মনে ধরেছে সেই বরই তুমি পাবে। হায় পুরাণ মুনি বাল্মীকি ! পূর্বরাগের কথা কি তুমি ভাল করে জানতে না, কারণ সত্যিই তো, তোমার রচিত রামায়ণে পূর্বরাগের কাহিনী তো প্রায় কোথাওই নেই ; তুমি জানতে শুধু বেদবিধি আর ঘটক-ঠাকুরদের মত বংশ-কীর্তন। দুই বৃহৎ রাজবংশের উর্ধ্বতন পুরুষদের নামকীর্তন করেই তুমি সীতা, ঊর্মিলা, মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তির সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ আর ভরত-শত্রুঘ্নের পাণি-গ্রহণ সম্পন্ন করেছ—পাণীন্ পাণিভিরস্পৃশন্। অগ্নিপ্রদক্ষিণ, বেদি আর ঋষি প্রদক্ষিণ করেই তোমার বরবধূরা রেহাই পেয়েছে, সেখানে আমাদের প্রাদেশিক কবিরা তাঁদের তাঁদের রাজ্যের সমস্ত স্ত্রী-আচার, দেশাচার, যা সাধারণে মনে করে সবই বেদে আছে, সে সমস্তই চারভাইকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন।

চারভায়ের বধূযোগের রাগিনীতেই মূল রামায়ণের আদিকাণ্ড শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু শেষের দিনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। ভরতের মামা যুধাজিৎ ভরতকে মামাবাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য প্রথমে গিয়েছিলেন অযোধ্যায়। সেখানে গিয়ে তিনি শোনেন, সবাই বিয়ে করতে গেছে মিথিলায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মিথিলায় চলে আসেন এবং দশরথকে তাঁর মনোবাসনা জানান। বিয়ে-থা হয়ে গেলে বরযাত্রীদের সঙ্গে অযোধ্যায় প্রবেশের পর পরই যুধাজিতের সংকল্প জানিয়ে মহারাজ দশরথ ভরতকে বললেন—তোমার মামা এসেছেন তোমাকে তাঁদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য—ত্বাং নেতুমাগতো বীরো যুধাজিন্ মাতুলস্তব। মামাবাড়ি যাবার নাম শুনেই ভরত এক পায়ে খাড়া ; সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়ে গমনের উদ্যোগ করলেন—গমনায়াভিচক্রাম শত্রুঘ্নসহিতস্তদা।

এই ঘটনাটার বিশেষ মূল্য উল্লেখ করলাম এই জন্যে যে, এ ঘটনা পরবর্তী সমস্ত রামায়ণ বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথমেই দেখা যাচ্ছে দশরথ তাঁর সমস্ত মন্ত্রিমণ্ডলীকে ডেকে বলছেন—আমি বুড়ো হয়েছি, এবার সর্বগুণে গুণান্বিত রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাই—নিশ্চিত্য সচিবৈঃ সার্ধং যৌবরাজ্যমমন্যত। বলার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ, অভিষেকের তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেল; কিন্তু দশরথ যেন সব কিছুই একটু তাড়াতাড়ি করতে চান। এর আগে তিনি বলেছেন—আমি বুড়ো হয়েছি বটে, তবে অনেকদিন এখনও বাঁচব—বৃদ্ধস্য চিরজীবিনঃ। 'অনেকদিন বাঁচব' এই বোধ যাঁর আছে,

তার অত তাড়াতাড়ি তড়িঘড়ি কিসের ? রাজ্যাভিষেকের সময়ও ঠিক হল যেমন তাড়াতাড়ি তেমনি তাড়াহুড়ো করে আনুষঙ্গিক কাজ, জোগাড়যন্ত্রও সারা হল—ত্বরিতবান্ নৃপঃ। এই তাড়াহুড়োটা বাল্মীকিরও চোখে পড়েছে। তিনি লিখেছেন, নানা দেশের নানান জনপদের সমস্ত নরপতিকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন, কিন্তু কেকয়রাজ, যিনি কৈকেয়ীর সম্বন্ধে তাঁরই শ্বশুর, সেই কেকয়রাজ অশ্বপতিকে তিনি নেমন্তন্ন করলেন না, নেমন্তন্ন করলেন না স্বয়ং রামের শ্বশুর জনককেও—ন তু কেকয়রাজানং জনকং বা নরাধিপঃ। আর এই যে তিনি দুজনকেই কিছু জানাননি, তার কারণ নাকি—খুব তাড়াহুড়ো ছিল তো, তাই ; তাঁরা বরং পরে খবর পেয়ে চমকে যাবেন—ন তু কেকয়রাজানং জনকং বা নরাধিপঃ। ত্বরয়া চানয়ামাস পশ্চাত্ তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিয়ম্॥ আশ্চর্য হল, দুনিয়ার সমস্ত প্রধান প্রধান রাজাদের তিনি তাড়াহুড়ো করেও জানানের সময় পেলেন—সমানিনায় মেদিন্যাঃ প্রধানান্ পৃথিবীপতিঃ, কিন্তু এই সেদিন ভরত মামার বাড়ি চলে গেল, তাঁকে দিয়েও তো তিনি কেকয়রাজ অশ্বপতিকে এই রাজ্যাভিষেকের খবর দিতে পারতেন। আবার অতি প্রিয় পুত্রের শ্বশুর রাজর্ষি জনক, যার কন্যা দুদিন পরে সমস্ত পৃথিবীর রানী হবে, তাঁকেও তিনি ডাকলেন না। ভাবে বুঝি, এর মধ্যে শুধু রহস্য নয়, ঘরোয়া 'পলিটিকস'ও আছে ; তবে এই 'পলিটিকসে'র মূল জানতে হলে আমাদের আরও একটু এগিয়ে যেতে হবে অযোধ্যাকাণ্ডের আগের দিকে।

রামের বনবাসের কথা শুনে ভরত যখন তাঁকে ফিরিয়ে আনতে গেছেন ত্রিকূটে, তখন রাম সানুবন্ধে ভরতকে বললেন, তুমি যে আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছ, এ তোমারই উপযুক্ত কথা। কিন্তু ভাই, আমাদের বাবা দশরথ যখন তোমার মা কৈকেয়ীকে বিয়ে করতে চান, তখন তোমার দাদু কেকয়রাজ অশ্বপতির কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, কৈকেয়ীর গর্ভে যে সন্তান হবে, তাকেই তিনি রাজ্য দেবেন—পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্। মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্ রাজ্যশুল্কম্ অনুত্তমম্॥ বিষ্ণুকল্প রামের পিতার চরিত্রে নিন্দারোপণ হবে বলে কৃত্তিবাস, তুলসীদাস কেউ এই পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু দশরথ নিজে এই প্রতিজ্ঞা কখনও ভোলেননি এবং এইজন্যেই তিনি কেকয়রাজ অশ্বপতিকে ইচ্ছাকৃতভাবে নেমন্তন্ন করার সময় পাননি। আবার রামের শ্বশুর জনককে নেমন্তন্ন না করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যেন, তাড়াহুড়োয় কেকয়রাজকে তো ডাকা হল না, আরে ! যে রাজা হবে সেই সদ্য বিবাহিত রামের শ্বশুর জনককেই ডাকতে পারলুম না, তো আমার শ্বশুর বৃদ্ধ

অশ্বপতির কথা আর কি বলব, থাক থাক ওসব কথা, ওঁরা পরে শুনে আনন্দ করবেন—পশ্চাত্ তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিয়ম্। আমরা জানি, যাঁর মেয়ে দুদিন পরে রাজরানী হবে, তিনি আগে জানলেই কি আর পরে জানলেই কি ! কিন্তু যার নাতি রাজা হবে বলে, যিনি আগে থেকেই জানতেন, সেই কেকয়রাজ অশ্বপতি যদি এসে দেখেন দশরথের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা, তাহলে তিনি জনসমক্ষে 'সত্যপ্রতিজ্ঞ' বলে পরিচিত দশরথকে গায়ের জোরে না হোক, বাক্যবেগে কলঙ্কিত করতে পারেন। অতএব সমাগত রাজা-মুনি-ঋষিদের সামনে একটা বিচিত্র অবস্থায় অপদস্থ হওয়ার থেকে শ্বশুরকে না ডাকাই তিনি শ্রেয় মনে করলেন।

কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। ভরতমাতা কৈকেয়ী জানতেন, কেকয় দেশে বিয়ের সময় কোনকালে পিতার কাছে দশরথ তাঁরই ছেলেকে রাজ্য দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সে কথা এতকাল পরে অযোধ্যার রাজবাড়িতে তুলে কোন লাভ নেই। অযোধ্যায় বড় ছেলেই রাজা হয় এই নিয়ম। তাছাড়া যখন রাজা কৈকেয়ীকে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন তখন পর্যন্ত কোন রানীর ছেলেও হয়নি, তাই হয়তো এমন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দশরথ। কৈকেয়ী নিজের বাবার অনুপস্থিতিতে সে প্রতিজ্ঞার কথা ভাবলেনই না, বরঞ্চ কুটিলা মন্থরার কথাই তাঁর মনে ধরল, যে-মন্থরার কথা কৃত্তিবাস বলেছেন—পৃষ্ঠে ভার কুঁজের নাড়িতে নারে চেড়ী। কুঁজ নহে তাহার সে বুদ্ধির চুপড়ি। বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে যে শম্বরবধের প্রসঙ্গ এসেছে, কৃত্তিবাস সে কথা সেরে দিয়েছেন আদিকাণ্ডে। সেখানে রাজার কাছে বর চাইবার ব্যাপারে মন্থরার সঙ্গে কৈকেয়ীর রীতিমত একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়ে গেছে। মন্থরার কথাতেই কৈকেয়ী রাজাকে বললেন যে, সময়মত তিনি বর চেয়ে নেবেন। কুচুটে সতীনটির মত কৃত্তিবাসের কৈকেয়ী রাজা দশরথকে একেবারে কড়ার করিয়ে নিয়েছে—আমার সত্যেতে বন্দী রহিলা গোসাঁই। প্রয়োজন অনুসারে বর যেন পাই ॥ বাল্মীকি রামায়ণে দুটি বরই শম্বরবধের পারিতোষিক, কিন্তু কৃত্তিবাসে দ্বিতীয় বরের জন্য রাজার আঙুলহাড়া রোগ হয়েছে। বৈদ্য এসে বিধান দিয়েছে—'হয় শামুক আর গুগলির ঝোল খাও' 'নহে নখদ্বারে চুম্ব দিক একজনা'। কৈকেয়ী ঘেন্নার মুখে জলাঞ্জলি দিয়ে আঙুল থেকে পুঁজ-রক্ত শুষে বার করে দিয়েছেন, ফলে আবার বর, এবং দুটি বরই থাকল ভবিষ্যতের আশঙ্কা গর্ভে নিয়ে। আসলে কৃত্তিবাস দশরথকে খুব সরল সাদামাটা ধার্মিক রাজা হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন আর যত দোষ ঢেলে দিয়েছেন কৈকেয়ীর ওপর ; কিন্তু মূল রামায়ণের গতি-প্রকৃতি থেকে বেশ বোঝা যায় দশরথ ছিলেন কৈকেয়ীর ব্যাপারে একেবারে

অন্ধ মোহাবিষ্ট। তুলসীদাস, কম্বন কি রঙ্গনাথনের ভাব দেখে মনে হবে দশরথের যেন তিনটি বৈ বৌ ছিল না। বাল্মীকিতে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্তঃপুর জুড়ে দশরথের স্ত্রী ছিল তিনশ-পঞ্চাশটি। রাম বনে যাবার সময় বাল্মীকি একবার তাঁদের রাজসভায় বার করেছিলেন—অর্ধসপ্তশতাস্তত্র প্রমদাস্তাম্রলোচনাঃ (কৃত্তিবাস আবার 'অর্ধ' কথাটি বাদ দিয়ে মাঝে মাঝেই পরিচারিকার মত 'সাত শত রানী'র উল্লেখ করেছেন।) বাল্মীকিতে রামের বনপ্রস্থানের সময় রাজা দশরথ সুমন্ত্রকে আদেশ করেছেন—আমার সবগুলি বৌকে ডেকে নিয়ে এস, আমি স্ত্রীপরিবৃত হয়ে প্রাণারাম রামকে দেখতে চাই—দারৈঃ পরিবৃতঃ সর্বৈঃ দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘবম্। এ আবার কেমন-ধারা সখ জানি না, তবে রাজা দশরথ যে পত্নীসংগ্রহের ব্যাপারে রীতিমত শিল্পী ছিলেন, সে কথা বাল্মীকি পড়ে বেশ বোঝা যায়। ক্ষত্রিয়া ছাড়াও বৈশ্য এবং শূদ্রজাতীয়া সুন্দরী রমণীরাও যে দশরথের অন্তঃপুরের শোভা বর্ধন করেছিলেন, তার খবর পাওয়া যাবে দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়। অশ্বমেধ যজ্ঞের শেষভাগে যজ্ঞীয় অশ্ব ফিরে এলে তার সঙ্গে প্রধানা মহিষীকে রাত কাটাতে হয়। কাজেই রাত কাটালেন প্রধানা কৌশল্যা। কিন্তু তারপর যজ্ঞের পুরোহিতেরা সেই যজ্ঞীয় অশ্বের সঙ্গে দশরথের অন্য ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা এবং শূদ্রা রমণীদেরও সংযোগ করলেন। বিধির অঙ্গ হিসেবে 'সংযোগ' কথাটার অর্থ না হয় গোপনই থাকল, কিন্তু এই যে বৈশ্যা, শূদ্রা রমণীদের কথা এল, তাও বাল্মীকি উল্লেখ করেছেন এমন ভাষায় যাতে সাধারণে বুঝতেই পারবেন না—মহিষ্যা পরিবৃত্ত্যার্থ বাবাতামপরাং তথা। রামায়ণের তিলকটীকা ঐতরেয়ব্রাহ্মণের প্রমাণ উদ্ধার করে বলেছে—মহিষী বলতে রাজার ক্ষত্রিয়া স্ত্রীদেরই বোঝায়। বৈশ্যা স্ত্রীদের পারিভাষিক নাম হল 'বাবাতা' আর শূদ্রা রমণীদের নাম হল 'পরিবৃত্তি'। কৃত্তিবাস অথবা তুলসীদাস, কম্ব অথবা রঙ্গনাথন, কেউই দশরথের এই বৈশ্যা এবং শূদ্রা রমণীদের উল্লেখই করেননি, তাঁদের ধারণায় মহারাজ দশরথের মত শুদ্ধসত্ত্ব মানুষ বোধহয় আর ছিলেন না।

মূল রামায়ণে যদিও দশরথের বিবাহসম্বন্ধের বর্ণনা কিচ্ছুটি নেই, তবে নানা জায়গায় যা তথ্য আছে তাতে স্ত্রীলোকের ব্যাপারে যে দশরথের ধৈর্য কম ছিল, তার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। সুমিত্রাকে দুর্ভাগা করার জন্য যে অধৈর্যের কথা কৃত্তিবাস বলেছেন, যা আমরা আগেই কৃত্তিবাসের জবানীতে উল্লেখ করেছি, সে অধৈর্য যে কেকেয়ীর ব্যাপারে দশরথের আরও বেশি ছিল, সেটা বাল্মীকিই স্পষ্ট করে বলে গেছেন। সারা দিন-রাত দশরথ কৈকেয়ীর ঘরে পড়ে থাকতেন, এবং তার সময়-সীমা এতটাই যে তাঁর ধাড়ি ধাড়ি ছেলেদের চোখেও পড়েছে। রামের

বনগমন এবং দশরথের মৃত্যুর পর ভরত যখন মামাবাড়ি থেকে ফিরে এলেন তখন দশরথের নিজের ঘরে তাঁকে না দেখেই কৈকেয়ীর ঘরে ঢুকেছেন এবং সেখানেও তাকে না পেয়ে প্রায় আশ্চর্য হয়ে ভরত জিজ্ঞাসা করেছেন—কি ব্যাপার বলুন তো মা ! বাবা তো বলতে গেলে প্রায় সবসময়ই আপনার এখানেই থাকেন—রাজা ভবতি ভূয়িষ্ঠমিহাম্বায়া নিবেশনে। তাঁকে এখানে পেয়ে যাব ভেবেই আপনার এখানে এসেছি। কিন্তু কই তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি না—তমহং নাদ্য পশ্যামি দ্রষ্টুমিচ্ছন্নিহাগতঃ।

কৈকেয়ীর ব্যাপারে রাজার পক্ষপাত যেমন বয়স্ক ছেলেদের দৃষ্টি এড়ায়নি, তেমনি স্ত্রীলোকের ব্যাপারে তাঁর অল্প-স্বল্প চিত্ত-চাঞ্চল্যের কথা তাঁর পুত্রবধূদেরও চোখ এড়ায়নি। অত্রিমুনির স্ত্রী অনসূয়া সীতার পাতিব্রত্য ধর্মের খুব প্রশংসা করছিলেন। সীতা তখন যেন একটু কটাক্ষ করেই বলতে চাইলেন যে স্ত্রীলোকের পতিব্রতা হওয়ার সাধনায় তখনই মধু থাকে যখন স্বামী পুরুষটিও একপত্নীব্রত হন। এ ব্যাপারে পতি-মাহাত্ম্য খ্যাপন করতে গিয়ে যে উদাহরণটি দিলেন সীতা সেটিই মোক্ষম। সীতা বললেন—যে সব মেয়েমানুষের দিকে মহারাজ দশরথ নিজের 'ভোগ্যাত্ববোধে' একবারের তরেও দৃষ্টি দিয়েছেন, আমার স্বামী রামচন্দ্র সমস্ত অভিমান ভুলে সেইসব মেয়েদেরও মায়ের মত দেখেন—সকৃদ্ দৃষ্টাস্বপি স্ত্রীষু নৃপেন নৃপবৎসলঃ। মাতৃবৎ বর্ত্ততে বীরো মানমুৎসৃজ্য ধর্মবিৎ ॥ এই কথাগুলি রামচরিত্রের গৌরব না দশরথচরিত্রের লাঘব সে কথা আদিকবি না বললেও আমরা এইটুকু বুঝি—যে বয়সে রামচন্দ্র তাঁরই বয়সী রমণীকে মাতৃবৎ দেখতে পারতেন সেই বয়সেই দশরথ এইসব মেয়েদের দিকে আড়চোখে তাকালে সীতার কিছু বলার থাকত না। কিন্তু কৈকেয়ী যেখানে বৃদ্ধ দশরথের তরুণী ভার্যা সেখানে বৃদ্ধতর বয়সে রামের যোগ্য তরুণীদের প্রতি 'ভোগ্যা' বোধে শুভদৃষ্টি দিলে মেয়েমানুষ সীতার নজর এড়াবে কেন ? দশরথ নিজেও যে নিজেকে চিনতেন না, তা নয়। মনের অগোচর পাপ নেই। তাই কৈকেয়ী যখন রামের বনবাস বর চাইলেন রাজার কাছে, তখন লোকের কাছে কি করে মুখ দেখাব—এইটেই ছিল রাজার প্রথম প্রতিক্রিয়া। কৈকেয়ীর কাছে তিনি বারবার বলেছেন—রাম বনে গেলে লোকেরা তাকে যা তা বলবে। বলবে—বোকা রাজা, কামুক রাজা, বউয়ের কথায় ছেলেকে বনে পাঠাল—বালিশো বত কামাত্মা রাজা দশরথো ভৃশম্। স্ত্রীকৃতে যঃ প্রিয়ং পুত্রং বনং প্রস্থাপয়িষ্যতি।

তরুণী কৈকেয়ীর ওপরে দশরথের এত মোহ ছিল যে, তাঁর জন্য তিনি

কৌশল্যা এবং সুমিত্রাকে পাত্তাই দিতেন না। নিজ মুখেই সে কথা স্বীকার করে কৈকেয়ীকে তিনি বলেছেন—রাম বনে গেলে কৌশল্যা আমাকে কি বলবে ? যখন যেমন দরকার পড়েছে কৌশল্যা আমাকে সেইভাবেই সেবা করেছে। কখনও দাসীর মত, কখনও সখীর মত, প্রিয়পত্নীর মত তো বটেই কখনও ভগিনী কিংবা মায়ের মতও। আর সেই কৌশল্যার সঙ্গে আমি শুধু তোমার জন্য, শুধু তোমারই জন্য একটু ভাল ব্যবহার পর্যন্ত করিনি, যা আমার করা একান্ত উচিত ছিল—ন ময়া সংকৃতা দেবী সৎকারার্হা কৃতে তব। একা কৈকেয়ীকে তুষ্ট করার জন্য দশরথ স্বয়ং বড় রানী কৌশল্যাকে কতখানি অবহেলা করতেন তা মিলিয়ে নেওয়া যায় কৌশল্যার জবানী থেকেই। কৌশল্যা তখন রামের বনবাসের কথা সবেমাত্র শুনেছেন, কিন্তু পুত্রের বনবাসের থেকেও তাঁর আপন করুণ অবস্থাটি যেন তাঁর প্রথম মনে এল। বড় এবং উপযুক্ত ছেলে বাড়িতে না থাকলে তাকে আরও কত নাকানি-চোবানি খেতে হবে, এই চিন্তাতেই তিনি তখন বিভ্রান্ত। তিনি রামকে বললেন—বাবা, তুই কাছে কাছে থাকতেই তোর বাবা আমার এই দশা করলেন, সেখানে তুই বনে গেলে আমার কপালে মরণ লেখা আছে—ত্বয়ি সন্নিহিতে' প্যেবমহমাসং নিরাকৃতা। কিং পুনঃ প্রোষিতে তাত ধ্রুবং মরণমেব মে॥ তুই জানিসনে, বাবা, আমি কত সহ্য করেছি, কত অত্যাচার মাথা পেতে নিয়েছি, আসলে তোর বাবা আমায় দেখতেই পারে না—অত্যন্তং নিগৃহীতাস্মি ভর্ত্তু র্নিত্যমসম্মতা। এই যে ছোটবৌ কৈকেয়ী, তার দাসীর চেয়েও অধম করে আমাকে রেখেছে—পরিবারেণ কৈকেয্যাঃ সমা বাপ্যথবাবরা। তুই এত সব কথা জানবিই বা কি করে। এই যে ঝি-চাকরগুলো পর্যন্ত, যারা আমার সেবা করে, আমার কথায় চলে, তারাও যদি একবার ভরতকে দেখে তাহলে তার সামনে আমার সঙ্গে কথা কয় না, পাছে কৈকেয়ী রাজাকে লাগায় যে আমার খুব সেবা হচ্ছে—যো হি মাং সেবতে কশ্চিদপি বাপ্যনুবর্ত্ততে। কৈকেয্যাঃ পুত্রমন্বীক্ষ্য স জনো নাভিভাষতে॥ এখন বুড়ো হয়ে গেছি এই বয়েসে আর সতীনের মুখ-ঝামটা সহ্য করতে পারব না, আমাকে তুই সঙ্গে নিয়ে চল বাবা—তদক্ষয়ং মহদ্ দুঃখং নোৎসহে সহিতুং চিরম্। বিপ্রকারং সপত্নীনামেবং জীর্ণাপি রাঘব॥

কৌশল্যার বিলাপ শোনানো আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এই বিলাপে সত্য আছে, যে সত্য স্বয়ং দশরথ কর্তৃক সমর্থিত। গোস্বামী তুলসীদাস লিখেছেন—দশরথ রামকে দেখেই বেঁচেছিলেন, রাম বনে যেতেই তিনি মরে গেলেন—জিয়ত রাম বিধু-বদন নিহারা। রাম-বিরহ করি মরনু সবাঁরা॥ বাল্মীকিমতে দশরথ কৈকেয়ীকামিতার জন্যই বেশি প্রসিদ্ধ, কৈকেয়ী-কামুকত্বেই

তাঁর জীবন শেষ হয়েছে—কারণ রামের বনবাস সেই কামুকতারই ফল। দশরথের তৃতীয় পুত্র লক্ষ্মণ, যিনি প্রায়ই উচিতবক্তা বলে বাল্মীকিতে প্রসিদ্ধ, তিনি দশরথের এই কৈকেয়ীপ্রীতি একটুও ভাল চোখে দেখেননি। কৌশল্যাকে তিনি বলেছেন—এই নাকি আবার বাবা, বুড়ো বয়সে খোকা সেজেছেন—পুনর্বাল্যমুপেয়ুষঃ। ওঁর ভীমরতি ধরেছে—বিপরীতশ্চ বৃদ্ধশ্চ স্ত্রিয়ো বাক্যবশং গতঃ—মেনিমুখো পুরুষ, যিনি মেয়েছেলের কথায় ছেলেকে বনে পাঠান। এই বয়েসে এত কামুক হলে তিনি কিই না বলতে পারেন—নৃপঃ কিমিব ন ব্রূয়াচ্চোদ্যমানঃ সমন্মথঃ। কৈকেয়ীর ওপরে গদগদ হয়ে তিনি যদি আমাদের সঙ্গেও শত্রুতা করেন, তবে তাকে মেরে ফেলাই উচিত—বধ্যতাং বধ্যতামপি। এতক্ষণ ধরে ভাববাচ্যে কথা বলে শেষে লক্ষ্মণ আর থাকতে পারলেন না, একেবারে পরিষ্কার স্পষ্টভাষায় যে কথাটা বললেন সেটা কৃত্তিবাস, তুলসীদাসেরা শুনেও শুনতে পাননি, কেন না শুনলে সাধারণের ধর্মবোধে আঘাত লাগত। লক্ষ্মণ বললেন—আমি মেরেই ফেলব ; আমাদের ওপর যার একটুও মায়া নেই আর কৈকেয়ীর ওপর যার এত মোহ, সেই কুচুটে কুৎসিত বুড়ো বয়েসের রামখোকাটিকে আমি মেরেই ফেলব—হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকয্যাসক্তমানসম্। কৃপণঞ্চ স্থিতং বাল্যে বৃদ্ধভাবেন গর্হিতম্॥

দশরথ সম্বন্ধে আর কটূক্তি শোনাতে চাই না। পুরুষ মানুষ স্ত্রীর মুখের দিকে সব সময় চেয়ে থাকলে লোকে যা বলে, তা সবই বাল্মীকি বলেছেন। পুরবাসী থেকে বশিষ্ঠমুনি, পুরনারী থেকে মহামন্ত্রী সুমন্ত্র কেউ কৈকেয়ী কিংবা দশরথকে কথা শোনাতে ছাড়েননি। ভক্ত তুলসীদাস তো পাঁচ কথায় দশরথ-কৈকেয়ীর সংলাপ সেরে দিয়েছেন। তুলসীর কৌশল্যা পুত্রের বনগমনের কথা শুনেও 'ধীরজ' রেখে স্বামীর অধর্মের ভয়ে কবিত্ব করে বলেন— তুমি ঠিকই করেছ বাপ, পিতার আজ্ঞাই সব ধর্মের সার—পিতু আয়সু সব ধরমকো টীকা। আমাদের কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্বও এখানে স্তব্ধ। মধ্যযুগীয় স্বামীর মত তিনি ভেবেছেন, কৌশল্যা ঠিকমত স্বামী-সেবা করেননি বলেই আজকে তাঁর ছেলে রাজা হল না, যদিও বাল্মীকিতে খোদ দশরথের মুখেই তার উল্টো কথা শুনি। কৃত্তিবাস পুত্র রামকে দিয়ে মা-কে শিক্ষা দিয়েছেন— স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের নাহি অন্য গতি। বিমাতার সেবায় পিতার প্রীতি অতি। তুমি যদি সেবা মাতা করিতে পিতার। তবে কেন তাপ ঘটিবে তোমার ॥

এসব কথা শুনলে মনে হবে তুলসীদাস, কৃত্তিবাস মূল রামায়ণের স্বাভাবিকতা এবং মনস্তত্ত্ব সহ্য করতেই পারেননি। বাল্মীকিতে দশরথের মুখ দিয়েই রীতিমত

গ্রাম্যভাষা বেরিয়েছে। তিনি কৈকেয়ীকে বলছেন— বদমাশ মেয়েছেলে, এসব কথা বলতে তোর দাঁতগুলো কেন খসে খসে পড়ছে না— ন নাম তে কেন মুখাৎ পতত্যধো বিশীর্য্যমানা দশনা সহস্রধাঃ। শুধু দশরথ কেন, নিজের ঘরে ঝামেলা হলে রাস্তার লোকেও উপদেশ দেয়। সুমন্ত্র সারথি পর্যন্ত রাজার ঘরোয়া বিবাদে অংশ নিয়েছেন, সর্বসমক্ষে কৈকেয়ীকে বাপ-মা তুলে গালাগালি দিতেও তাঁর বাধেনি। তিনি কৈকেয়ীর মার সম্বন্ধে একটি গপ্পোও শুনিয়েছেন। সুমন্ত্র বললেন— তোমার মা যেমন তুমিও তেমনি, আমড়া গাছে আম হয় না, নিমগাছে মধু হয় না— ন হি নিম্বাদ্ স্রবেৎ ক্ষৌদ্রং লোকে নিগদিতং বচঃ। কৈকেয়ীর বাবা নাকি এক ব্রাহ্মণের বরে পাখির ভাষা বুঝতে পারতেন। একদিন এক পাখির রসালাপ শুনে তিনি হেসে উঠলেন এবং কৈকেয়ীর মা তাঁকে বললেন— কি কারণে হাসছ তুমি, বলতেই হবে। বরদাতা ব্রাহ্মণের নিষেধ থাকায় কেকয়রাজ বললেন— কারণ বললে এখনই যে আমার মৃত্যু হবে। কৈকেয়ীর মা বললেন— ও সব ঠাট্টা চলবে না, তুমি বাঁচ আর মর, তোমাকে বলতেই হবে— শংস বা জীব মা বা ন মাং ত্বং প্রহসিষ্যসি। এবার দশরথের দিকেই ইঙ্গিত করেই যেন সুমন্ত্র বললেন— সেই বরদ ব্রাহ্মণের নিষেধ থাকায় কেকয়রাজ কিন্তু কিছুতেই তাঁর হাসির রহস্য স্ত্রীকে বললেন না। কিন্তু কৈকেয়ীর বায়নাক্কাটি ঠিক তাঁর মায়ের মতনই। কথায় বলে, ছেলেরা হয় তাদের বাপের মত, আর মেয়েরা হয় তার মায়ের মত— —পিতৃণ সমনুজায়ন্তে নরা মাতরমঙ্গনাঃ। স্বামী মরুন আর বাঁচুন সেদিকে চিন্তা নেই, কৈকেয়ী তাঁর মতই জেদ বজায় রাখতে ব্যস্ত।

কোন কিছুতেই কৈকেয়ীর কিছু হল না, তাঁর ক্রূরতা এবং কুটিলতা ক্ষণে ক্ষণে আরও বাড়তেই থাকল। দুখানি বর চাওয়ার পর থেকে একবারও তিনি দশরথের পাশটি থেকে নড়েননি। কারও কথায় তিনি গলেও গেলেন না, মন্দ বললে সেকথা হজম করে নিজের জিদ থেকে একটুও সরে গেলেন না। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বাকল পরে বনে চলে গেলেন আর সেই প্রথম এবং সম্ভবত সেই শেষবারের মত দশরথ কৈকেয়ীকে বললেন— ছুঁয়ো না আমাকে ছুঁয়ো না— মা স্প্রাক্ষীঃ পাপনিশ্চয়ে, আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না। আজ থেকে তুমি আমার স্ত্রী নও, বান্ধবীও নও— ন হি ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ন ভার্যা ন চ বান্ধবী। এতকাল ধরে 'রতিপুত্রফলা' স্ত্রীর মধ্যে যিনি প্রাণের বান্ধবীকে খুঁজে পেয়েছিলেন, আজ তাঁকেই তিনি বললেন—সখ মিটেছে তো, এবার বিধবা হয়ে রাজ্য ভোগ কর— সকামা ভব কৈকেয়ি বিধবা রাজ্যমাবস। এতকাল একমাত্র

কৈকেয়ীর প্রেমাস্পদ দশরথ এই প্রথমবার বোধ হয় শান্তি পাওয়ার জন্য বার্ধক্যের বারাণসী কৌশল্যার ঘরে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু সে কি সত্যি সত্যি শান্তির জন্য, নাকি পুত্রহারা কৌশল্যার স্বাভাবিক রোষের মুখোমুখি হয়ে অনুতাপে পুড়ে মরবার জন্য। রাজাকে নিজের ঘরে দেখে পুত্রহারা জননীর যে প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা বাল্মীকি তাই লিখেছেন যদিও কৃত্তিবাস, তুলসীদাস দশরথের সম্বন্ধে এসব কথা বলতেই চাননি। রাম বনে চলে যাবার পর রাজা দশরথ যে কৈকেয়ীর নাম পর্যন্ত শুনতে চাইছিলেন না, এতদিন পর নিজের ঘরে সেই কৈকেয়ী-সোহাগী রাজাকে দেখে প্রথমেই কৌশল্যা কৈকেয়ীর নাম ধরেই আরম্ভ করলেন— রামের ওপর বিষ ঝেড়ে এখন তোমার কৈকেয়ী খোলসছাড়া সাপের মত ঘুরে বেড়াবে— নির্মুক্তেব পন্নগী। তোমার ভালবাসাতেই সে ভাগ্যবতী, নিজের আখের সে ভালই বোঝে ; এখন ঘরের মধ্যে কালসাপ আমাকে শুধু ভয়ই দেখাবে— ত্রাসয়িষ্যতি মাংভূয়ো দুষ্টাহিরিব বেশ্মনি। কৌশল্যার বিলাপ চলল, ওদিকে সুমন্ত্র সারথি তিনজনকে বনে রেখে ফিরে এলেন অযোধ্যায়। দশরথ পুত্রশোকে কোন কথাই বলতে পারছিলেন না, তো কুশল প্রশ্ন করবেন কি ! কৌশল্যা কিন্তু আবার তেতে উঠে চিমটি কেটে রাজাকে বললেন—কি গো সুমন্ত্রকে যে তুমি কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারছ না। আগে রামের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এখন অনুতাপ দেখাচ্ছ— অদ্যেমমনয়ং কৃত্বা ব্যপত্রপসি রাঘবে। তুমি যার ভয়ে রামের কুশল প্রশ্ন পর্যন্ত করতে পারছ না, সেই কৈকেয়ী এখানে নেই, তুমি নির্ভয়ে কথা বল— নেহ তিষ্ঠতি কৈকেয়ী বিশ্রব্ধং প্রতিভাষ্যতাম্।

আস্তে আস্তে সুমন্ত্র সব জানালেন। বনবাসী ছেলের খবর শুনে কৌশল্যা আবার স্বামী দশরথকে মর্মাঘাত করে বললেন— চোদ্দ বছর পরে রাম যদি ফেরেও তবু ভরত তাকে রাজ্য, রাজকোষ কিছুই দেবে বলে মনে হয় না—জহ্যাদ্ রাজ্যঞ্চ কোষঞ্চ ভরতো নোপলক্ষ্যতে। আর যদি দেয়ও তো, কনিষ্ঠের উপভুক্ত এঁটো সেই রাজ্য রাম আমার নেবে কেন, বাঘ কি কখনো এঁটো খায়। যে মদের সারভাগ খেয়ে নেওয়া হয়েছে, যে যজ্ঞে সোমরসটাই নষ্ট হয়ে গেছে, সেই রকম রাজ্য নিয়ে সে কি করবে— তথাহ্যাত্তমিমং রাজ্যং হৃতসারাং সুরামিব। নাভিমন্তুমলং রামো নষ্টসোমমিবাধ্বরম্। রাম হল গিয়ে আমার সিংহ ছেলে, কিন্তু হলে হবে কি, মাছ যেমন নিজের পোনাগুলো ধরে ধরে খায়, তেমনি তুমিও তোমার ছেলেকে গিলেছ— স্বয়মেব হতঃ পিত্রা জলজেনাত্মজো যথা। আর আমার কথা আর কি বলব ! স্ত্রীলোকের প্রথম গতি হল স্বামী, সেই তুমিই

আমার নও, কৈকেয়ীর ; দ্বিতীয় গতি যে পুত্র, তাকেও তুমি পাঠিয়েছ বনে— তত্র ত্বং মম নৈবাসি রামশ্চ বনমাহিতঃ, তুমি সব নষ্ট করেছ, ছেলে, আমি, রাজ্য, মন্ত্রী, প্রজা সব নষ্ট করেছ, এতগুলি লোকের মূল্যে তুমি যাকে সুখী করেছ সে হল শুধু ভরত আর তোমার প্রিয়তমা কৈকেয়ী।

দশরথ মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন, কৌশল্যার পায়ে ধরার চেষ্টা করেছেন, কারণ অন্যায়টা প্রধানত সেইখানেই। পুত্রশোক, প্রিয়তমা পত্নীর আঘাত, কৌশল্যার বাক্যবাণ— সব কিছুতে জর্জরিত হয়ে মহারাজ দশরথ যেদিন মারা গেলেন সেদিন তাঁর মুখে শেষ জলটুকু দেবার জন্যও কেউ ছিল না। পরিচারক, চারণেরা যখন রাজার দেখা পেল না, তখন কাছের ঘরের সাধারণ রানীরা, কেউ গায়ে হাত দিয়ে, কেউ নাড়ি টিপে বুঝতে পারলেন— রাজা রাত থেকেই মরে পড়ে রয়েছেন। পুত্র শোকাতুরা কৌশল্যা এবং সুমিত্রাও অন্য ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন —তে চ দৃষ্ট্বা তদা সুপ্তে উভে দেবৌ চ তং নৃপম্। সুপ্তমেব উদ্গতপ্রাণম্ অন্তঃপুরমদৃশ্যত ॥ পুত্রশোকের ওপর স্বামী শোকে উদ্‌ভ্রান্ত কৌশল্যা মৃত দশরথের মাথাটি কোলের ওপর রেখে কৈকেয়ীকে বললেন— তোর পথের কাঁটা সবাই সরে গেছে, এবার মনের সুখে রাজ্য ভোগ কর— সকামা ভব কৈকেয়ী ভুঙ্‌ক্ষ রাজ্যমকণ্টকম্।

রাজবাড়ির পলিটিক্সটা ছিল এই রকম। কেউ দশরথকে ছাড়েনি। বাল্মীকির মতে, রাম বনে যাবার পর পাঁচটি রাত দশরথ বেঁচে ছিলেন। ষষ্ঠ রাত্রির অর্ধেকটা ধরে তিনি কৌশল্যা আর সুমিত্রার কাছে কৈকেয়ী-কামুকতার জন্য অনুতাপ করেছেন আর অন্ধমুনির শাপ স্মরণ করেছেন। তারপর সকাল হওয়ার আগেই স্ত্রী-পুত্রহীন একাকী রাজা সবার অলক্ষ্যে প্রাণত্যাগ করে আপন কামুকতার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। আসলে দশরথের সময় থেকেই বিখ্যাত রঘুবংশের ধ্বংস আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। বিষয়ে অনাসক্তিই যেখানে রঘুকুলের আভূষণ ছিল, সেই বিষয়াসক্তিই দশরথকে যেন পেয়ে বসেছিল। এ কথাটি বাল্মীকি যেমন নিজের বক্তব্য একটুও না বলে কেবল ঘটনা পরম্পরায় দেখাবার চেষ্টা করেছেন, তেমনি অন্য কোন প্রাদেশিক কবি এসব কথা উচ্চারণ করবারই সাহস পাননি। একমাত্র কালিদাস তাঁর পরিশীলিত গোপন ইঙ্গিতে প্রকাশ করে দিয়েছেন দশরথের কুলবিষম চরিত্রটি। তিনি বলেছেন— অন্ধমুনির পুত্রবধের আগে দশরথ যথেচ্ছ মৃগয়া করে বেড়াতেন, তাতে ভুল হয়ে গেছিল তাঁর ইতিকর্তব্যতা জ্ঞান— ইতি বিস্মৃতকরণীয়মাত্মনঃ। সমস্ত রাজ্যের ভার তিনি সঁপে দিয়েছিলেন মন্ত্রীদের ওপর এবং ভোগ যেহেতু উপভোগের দ্বারা শান্ত হয়

না তাই চতুরা কামিনীটির মতই চপলচরণ মৃগয়ার হরিণই তাঁর হৃদয় হরণ করেছিল— মৃগয়া জহার চতুরেব কামিনী। ঘরে ফিরে আসলে মৃগয়ার বদলে চতুরা কামিনীই যে দশরথের বিবেকবুদ্ধি নষ্ট করে দিয়েছিল, সে কথা আর উল্টো করে ব্যঞ্জনামুখর কবি স্বকণ্ঠে বলেননি, যদিও বাল্মীকি রামায়ণে মুনি, ঋষি, সারথি, প্রজা— সবাই সে কথা সোচ্চার ধিক্কারে বার বার বলেছে।

রাজবাড়ির ষড়যন্ত্র দশরথ মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। মৃত্যুর পরের সূর্যোদয়েই মন্ত্রীরা নতুন রাজা খোঁজার জন্য মন্ত্রণাসভা বসালেন। লক্ষ করার বিষয়, মন্ত্রণার জন্য যাঁরা রাজসভায় মিলিত হলেন তাঁরা বেশির ভাগই ব্রাহ্মণ। বোঝা যাচ্ছে, রামায়ণ-সমাজের ব্রাহ্মণেরা ব্রত, উপবাস কিংবা 'নবমীতে লাউ খাইতে আছে কিনা', সে বিষয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। ব্রাহ্মণদের নাম করে বাল্মীকি বলেছেন তাঁরা নাকি 'রাজকর্তারঃ' অর্থাৎ 'কিংমেকার্স'। সেকালের সাতজন বিশিষ্ট মুনির নাম করে আদি কবি একেবারে সাধারণভাবে মন্ত্রীদের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন যে, তাঁরা সবাই বশিষ্ঠকে 'চেয়ারম্যান' করে অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে যুক্তি কষতে বসলেন— এতে দ্বিজাঃ সহামাত্যৈঃ পৃথগবাচম্ উদীরয়ন্। ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্রীরা কিন্তু অরাজক রাজ্যে বিভিন্ন বাস্তব অসুবিধের কথা উল্লেখ করে অত্যন্ত নৈর্ব্যক্তিকভাবে— 'ইক্ষ্বাকুবংশের যে কোন একজনকে রাজা করা হোক'— এই রকম একটা অভিমত দিলেন —ইক্ষ্বাকূণামিহৈবাদ্য কশ্চিদ্ রাজা বিধীয়তাম্। এতে বোঝা যায় কৈকেয়ীর কথার পাকে পড়ে দশরথ অনিচ্ছাকৃতভাবে যে রাজপ্রতিনিধি ঠিক করেছিলেন তাঁর প্রতি এই মন্ত্রীদের আস্থা ছিল না। কিন্তু এ যুগেও যেমন ভক্ত মন্ত্রীরা অনভিজ্ঞ হলেও পূর্বতন প্রধানের আত্ম বংশকেই মর্যাদা দেন, তেমনি সব কথার শেষে 'ভেটো' প্রয়োগ করলেন সূর্যবংশের একাধিক রাজার নুন-খাওয়া রাজমুনি বশিষ্ঠ। প্রধানত তাঁর কথাতেই ভরতকে মামাবাড়ি থেকে ডেকে আনার প্রস্তাব সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হল। যাঁকে ডেকে এনে রাজ্য দেওয়ার কথা হল তিনি বোকা ছিলেন না বলেই রামায়ণ মহাকাব্যের নাটকীয়তা বেড়েছে, হয়তো বশিষ্ঠও ভরতকে ভালই চিনতেন। ভরত রামচন্দ্রের জনপ্রিয়তার কথা সবিশেষ জানতেন এবং সেই কারণেই তিনি আপন জননীর মত অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীর ওপরেও বিরক্ত হলেন। ভরত জানতেন— যে রাজ্যের জন্য রামচন্দ্রের বনবাস, সেই রাজ্যের 'দখলী-সত্ত্ব' তাঁর নিজের হাতে থাকলেও রাম-ভজা প্রজাদের মুখের ওপর সেই রাজ্য প্রেমানন্দে ভোগ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। নিতান্তই যদি ভোগ করতে হয় তা হলে রামের থেকেও বেশি জনপ্রিয়তা তাঁর দরকার ছিল,

এবং সারাজীবন মামাবাড়িতে কাটানো ভরত খুব বাস্তবভাবেই জানতেন যে, সে জনপ্রিয়তা তাঁর নেই। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড আরম্ভ হচ্ছে রামের প্রবাদোপম জনপ্রিয়তা দিয়ে। কৈকেয়ীকে কুমন্ত্রণা দেবার সময় মন্থরা একবার অনুযোগ করেছে— তুমি এমনই মাথামোটা যে ছেলেবেলা থেকেই ভরতকে ফেলে রেখেছ মামাবাড়িতে। আরে! কাছাকাছি চোখের সামনে থাকলে নিরেট পদার্থের ওপরেও লোকের মমতা হয়, সেখানে এমন কাজ কেউ করে— বাল এব তু মাতুল্যং ভরতো নায়িতস্ত্বয়া। সন্নিকর্ষাচ্চ সৌহার্দ্যং জায়তে স্থাবরেষ্বপি ॥

আমাদের ধারণা, আধুনিক অনেক মায়ের মত কৈকেয়ী রানীর বাপ-ভাইয়ের ওপর টান ছিল একটু বেশি এবং এ কারণে দশরথও বোধ হয় কিঞ্চিৎ শঙ্কিত ছিলেন। কেননা তিনি ভরতকে রাজ্য দিয়ে প্রতিজ্ঞা পূরণ করলেন বটে কিন্তু মরার আগে কৈকেয়ীকে তিনি বলে গেলেন— তোমাকে অগ্নি প্রদক্ষিণ করে বিয়ে করেছি, কাজেই ইহলোক এবং পরলোকে তোমাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করতে আমি ধর্মত বাধ্য, কিন্তু তুমি যেহেতু ধর্মত্যাগ করেছ তাই আমি তোমাকে ত্যাগ করলাম— ত্যক্তধর্মাং ত্যজাম্যহম্। আর তোমার ছেলে ভরত যদি এই রাজ্য পেয়ে সুখী হয় হোক, কিন্তু তার প্রেতকৃত্যের দান যেন আমার ভোগে না আসে— যন্ মে স দদ্যাৎ পিত্রর্থং মা মাং তদ্ দত্তমাগমৎ। আরও স্পষ্ট করে দশরথ আগেই বলেছেন যে, ভরত যেন তাঁর শ্রাদ্ধতর্পণাদি কিচ্ছু না করে— মাস্ম মে ভরতঃ কার্ষীৎ প্রেতকৃত্যং গতায়ুষঃ। সপুত্রয়া তয়া নৈব কর্ত্তব্যা সলিলক্রিয়া। শুধু কি এই, রাগের মাথায় দশরথ তাঁর মেজছেলেকেও 'ত্যাজ্যপুত্তুর' করে বসলেন— সন্ত্যজামি স্বজঞ্চৈব তব পুত্রং ত্বয়া সহ— তোমার সঙ্গে তোমার ছেলেকেও আমি ত্যাগ করলাম। ভরত কি এসব কথা কিছুই শোনেননি, তিনি রাজার ছেলে বটে এবং কচি খোকাও নন, তিনি ভালই বুঝতেন পিতার এই বিরুদ্ধতার মুখে তাঁর পক্ষে প্রজারঞ্জন করা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে রাজা দশরথ জানতেন, রামচন্দ্রের জনপ্রিয়তার স্রোতে ভরত কুটো গাছটির মত ভেসে যাবে, কেননা তার সঙ্গে প্রজাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। কৈকেয়ীকে বোঝানোর সময় দশরথ ভদ্রভাবে একটু ইঙ্গিতও করেছেন এ বিষয়ে, বলেছেন— রাম ছাড়া ভরত কখনও রাজা হবে না, কেননা সে রামের থেকেও ধার্মিক—ন কথঞ্চিৎ ঋতে রামাদ্ ভরতো রাজ্যমাবহেৎ। বেশি ধার্মিক বলে কিনা জানি না, ভরত রাজ্য নিলেন না এবং আমরা মনে করি এটিই তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং লোকদর্শিতার ফল। লঙ্কাকাণ্ডের শেষে রাম যখন সীতা উদ্ধার করে ফিরে এসেছেন তখন ভরত রামচন্দ্রকে বলেছিলেন— বলবান একটি ষাঁড় যে ভার

বইতে পারে, একটা বাচ্চা ষাঁড় তো সে ভার বইতে পারে না, কাজেই এ রাজ্যের ভার কি আমার সয়— কিশোরবদ্ গুরু ভারং ন বোঢুমুৎসহে। তা ছাড়া রাজ্যের ছিদ্র অনেক, জলপ্রবাহে যেমন বাঁধ ভেঙে যায় তেমনি এ রাজ্যের ফুটো বন্ধ করাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। তা ছাড়া গাধা যেমন ঘোড়ার তেজে ছুটতে পারে না, কাক যেমন হাঁসের গতিতে ছুটতে পারে না, তেমনি আপনার ক্ষমতা কি আমার আছে— নান্বেতুমুৎসহে বীর তব মার্গমরিন্দম।

হতে পারে এসব বিনয়ের কথা, কারণ ভরত ভালই রাজ্য চালিয়েছিলেন। কিন্তু কথা হল ভরত রামের নামেই রাজ্য চালিয়েছিলেন কিন্তু রাজগৃহের প্রথম ভাঙনের মুখে ভরতের লোকদর্শিতাই বেশি কার্যকর হয়েছে। আরও একটা এখানেই বলে রাখি। বাল্মীকি রামায়ণে দশরথ যে পুত্রকে বারংবার শ্রাদ্ধ পর্যন্ত করতে বারণ করে গেছেন, তাঁর পক্ষে সোজাসুজি রাজা হওয়া কঠিন ছিল। সূর্যবংশের বশংবদ রাজপুরোহিত দশরথের এই রাগের কথা মনে রাখেননি। বাস্তব পরিস্থিতি খেয়াল করে তিনি ভরতকে দিয়েই দশরথের অগ্নিকার্য এবং প্রেতকৃত্য সবই করিয়েছেন। প্রাদেশিক রামায়ণগুলির মধ্যে একমাত্র কম্ব রামায়ণ ছাড়া আর কেউই বাল্মীকির ওপরে টেক্কা দেননি এবং ভরতকে শ্রাদ্ধাধিকার থেকেও বঞ্চিত করেননি। আমরা অবশ্য অযোধ্যাকাণ্ডে শ্রাদ্ধ নিয়ে আর সময় নষ্ট করব না, কেননা স্বয়ং রামচন্দ্র বনে আছেন, তাঁর কথাও আমাদের ভাবতে হবে।

প্রথম কথা, আমাদের দেশজ রামায়ণগুলির আদি থেকে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত পড়লে মনে হবে, রাম যেন চিরকালই খুব নির্বিকার, ভালোমন্দে সমযোগী। ফলমূল-খাওয়া ঝুঁটিবাঁধা এক তপস্বী যেন আমাদের রাম-কল্পনা জুড়ে বসে আছে। বাল্মীকির বাস্তবে কিন্তু রামের জীবনটি এত নিরামিষ ছিল না। রাজধানীতে থাকাকালীন রামচন্দ্রের ভোগবিলাসের কথা রাজা দশরথ তো বার বার বিলাপ করে বলেছেন। রাজবেশ, হাতি-ঘোড়া— এসব তো ছিলই, খাবার ব্যাপারেও রাম ছিলেন রীতিমত সুরসিক। ভাল ভাল রাঁধিয়েরা রামের কাছে রান্নার তারিফ শোনার জন্য 'আমি রাঁধব, আমি রাঁধব' বলে সুস্বাদু পান-ভোজন প্রস্তুত করতেন— অহংপূর্বাঃ পচন্তি স্ম প্রশস্তং পান-ভোজনম্। রামের পানীয়ের মধ্যে যে শুধু দুধ আর ঘোলই ছিল এমন ধারণা যেন পাঠক মনেও না আনেন। একে রাজপুত্র বলে কথা, তাছাড়া অযোধ্যার পথেঘাটে ছিল সুরা-মদের ছড়াছড়ি। ভরত রামকে ফিরিয়ে আনতে না পেরে দুঃখ করে বলেছেন— রামবিহীন অযোধ্যায় থাকবই না। যে রাম অযোধ্যায় থাকতে কত রমরমা ছিল,

অযোধ্যার রাস্তাঘাট যেখানে বারুণী মদ আর ফুল-মালা- চন্দনের গন্ধে ম-ম করত, সে গন্ধ তো পাচ্ছি না— বারুণী মদ গন্ধশ্চ...ন প্রবাতি সমন্ততঃ। অযোধ্যার রাস্তাঘাটের যখন এই নমুনা সেখানে ক্ষত্রিয়কুমার মদ্যস্পর্শ করতেন না, এটা বিশ্বাসের কথা নয়। আরও কথা, গুহকের রাজ্য ছেড়ে প্রথমে গঙ্গা এবং পরে যমুনা পার হবার সময় সীতাদেবী এই দুই পুণ্যা নদীর কাছে মানত করেছেন —রাম যদি ভালোয় ভালোয় অযোধ্যা ফিরে আসেন তা হলে তোমার প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণদের প্রচুর খাওয়াব আর তোমাকে পুজো দেব মা, হাজার কলসী মদ আর পোলাও দিয়ে— সুরা-ঘট সহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ।...সুরা-ঘট শতেন চ। গঙ্গা-যমুনার ভোগ্যা এই সুরার প্রসাদ কি রাজমহিষীরাও পেতেন না। বিশেষত সুরা বিষয়ে রাজমহিষীদের অন্তরঙ্গ জ্ঞানও ভালই ছিল। 'মণ্ড' বলে একটা জিনিস ছিল, সেটাই ছিল মদের সার ভাগ। মদিরার মণ্ডভাগটি পান করার পর যেটা জলের মত পড়ে থাকত সেটার কোন কদর ছিল না মদ্যপায়ীদের কাছে। কৌশল্যা বিলাপ করে দশরথকে বলেছিলেন—ভরত এ রাজ্যে রাজা হলে সার শুষে নেওয়া সুরার মত এ রাজ্য আমার ছেলে নেবেই না— হৃতসারাং সুরামিব। আবার বনগমনের সময় দশরথ যখন নানা ধনরত্ন রামের সঙ্গে দিতে চাইলেন, তখন কৈকেয়ী রাজাকে বললেন— 'মণ্ড' শুষে নেওয়া মদিরার মত এ রাজ্য ভরত নেবেই না—পীতমণ্ডাং সুরামিব। মদিরার মণ্ডভাগটির প্রস্তুত-প্রণালী আমার জানা নেই, তবে এর সঙ্গে যে রাজমহিষীদেরও ব্যক্তিগত নিবিড় পরিচয় ছিল, সে কথা বোধকরি আর বলে দিতে হবে না। ঠিক এই অবস্থায় আমরা কি এখনও বিশ্বাস করব যে, রাম মদ্যপানের সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন। যদিও রাম বসে বসে গেলাসের পর গেলাস মদ খাচ্ছেন এ রকম কোন পরিষ্কার বর্ণনা বাল্মীকিতে নেই, তবে ইঙ্গিত আছে যথেষ্টই। বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যখন সীতার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ হয়েছে তার বহু বছর আগে রামচন্দ্র স্বয়ং সীতাকে বাম বাহুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে টলটলে মৈরেয় মার্কা মদ্যপান তুলে দিয়েছেন সীতার হাতে—ঠিক যেমন দেবরাজ স্বর্গীয় সুরা তুলে দেন ইন্দ্রাণীর হাতে— সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি। পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমেব পুরন্দরঃ। 'মৈরেয়' কিন্তু বেশ কড়া মদ, কিন্তু এর পরেও কি আমরা বলব রামচন্দ্র মদ ছুঁতেন না! স্বাধীনভাবে রামচন্দ্রের মদ খাওয়ার ঘটনা পরিষ্কার করে বাল্মীকি না জানালেই কি? তাঁর মদ্যপানের পরিবেশ তো বাল্মীকিই তৈরী করেছেন। যেদিন রামচন্দ্র সীতার হাতে মৈরেয় মদের পানপাত্রখানি এগিয়ে দিয়েছিলেন,সেদিন তিনি অযোধ্যার

নবনির্মিত ক্রীড়াকানন অশোকবনে ফুলের আসনে বসেছিলেন। মাংসের চাট এবং বহু মিষ্ট ফলও তাঁর অলস-হাতের নাগালের মধ্যেই ছিল— মাংসানি চ সুমৃষ্টানি ফলানি বিবিধানি চ। সুন্দর অপ্সরা-কিন্নরীরা তাঁর সামনে নাচ দেখাচ্ছিল এবং তারা মদ খেয়েই নাচছিল— দক্ষিণা রূপবত্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পানবশং গতাঃ। রাম সেই সুন্দরী ললনাদের সন্তুষ্টও করলেন। অবশ্য কিভাবে— তা বাল্মীকি লেখেননি। কিন্তু এমনি এক নাচের আসরে, যেখানে নাচিয়ে, বাজিয়ে এমনকি সীতা পর্যন্ত মদ্যপানে মত্ত, সেখানে রামচন্দ্র বসে বসে আপন অঙ্গুলি-লেহন করছিলেন বলে মনে হয় না। বিশেষত বাল্মীকি লিখেছেন— দেবকন্যাদের সঙ্গে দেবতারা যেভাবে কামক্রীড়া করে, রামচন্দ্র বৈদেহীর সঙ্গে সেই রকমভাবেই প্রতিদিন ক্রীড়া করছিলেন— রময়ামাস বৈদেহীম্ অহন্যহনি দেবযৎ। দেবতাদের তো অমৃতে অরুচি নেই বলেই জানি এবং এই রকম দেবভোগ্য ব্যবহারে বিলাসে-বিহারে রাম-সীতার দিন কেটেছে বহু বছর, যেটাকে বাল্মীকি বাড়িয়ে বলেছেন— দশবর্ষ-সহস্রানি গতানি সুমহাত্মনোঃ। মদের ব্যাপারে সীতা যে একেবারেই বিমুখ ছিলেন না, তা যেমন তাঁর গঙ্গা-যমুনার কাছে মানত করা থেকে বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় তাঁর সাধারণ সংলাপ থেকে। রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি তপস্বী বনবাসী রামকে হেয় করে তাঁকেই সপ্রেমে বরণ করে নিতে বলেন। প্রত্যুত্তরে সীতা রাম-রাবণের তুলনা করে এমন কতকগুলি উপমার কথা বলেন যার মধ্যে একটিতে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, ভাল কিসিমের মদ স্বয়ং সীতাদেবী কি রকম চিনতেন। সীতা বললেন— সিংহে আর শেয়ালে যে তফাত, খাড়ি আর সমুদ্রে যে তফাত, উত্তম সুরা আর সুবীর দেশের ধেনো মদে যে তফাত— সুরাগ্র্য-সৌবীরকয়োর্যদন্তরং— রামে আর তোতে সেই তফাত। পাঠক মহাশয় নিশ্চয় জানুন, সীতা, কৌশল্যা, কৈকেয়ী— সবাই মদ খেতেন আর লঙ্কার অশোকবনে সীতাকে হনুমান রামের খবর দিয়ে বলেছে— তিনি আপনার বিরহে মদ-মাংস সব ছেড়ে দিয়েছেন— ন মাংসং রাঘবো ভুঙ্‌ক্তে ন চৈবং মধু সেবতে। তার মানে, সীতাবিরহ না থাকলে মদ এবং মাংস দুই-ই যে রামের চলত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মদ্যপান ছাড়া, খাবারের মধ্যে যে জিনিসটি রামের অতি প্রিয় ছিল সেটি হল মাংস, বিশেষ করে হরিণের মাংস। দশরথ আর কৈকেয়ীর কাছে বনবাসের আদেশ পেয়ে রাম যখন কৌশল্যাকে সে কথা জানালেন, তখন তিনি বলেছিলেন—আমাকে এখন চোদ্দ বছর ফল-মূল খেয়ে ঋষি-মুনির মত বনেই

কাটাতে হবে, আমিষ আমার চলবে না— কন্দমূলফলৈ জীবন্ হিত্বা মুনিবদামিষম্। আবার অশোকবনে হনুমানের 'রিপোর্টে' দেখছি তিনি সীতা বিরহে মদ-মাংস দুই-ই ছেড়েছেন। তা হলে মদ-মাংস ধরার প্রশ্নও থেকে যায়। আসলে অতিরিক্ত মনঃকষ্টে বনবাসের শেষের দিকটায় রামচন্দ্র হয়তো মদ-মাংস সবই ছেড়ে দিয়েছিলেন কিন্তু বনবাসের প্রথমদিকে অরণ্য-প্রকৃতির মাধুর্য তাঁকে রাজভোগ ভুলিয়ে দিলেও মাংস খাওয়া ভোলাতে পারেনি। বনবাসের প্রথম দু-তিনদিনের রাত্রি রামচন্দ্র শুধু জল খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছেন— সেটা অভিমানবশত, না অন্য কোন কারণে —বাল্মীকি তা স্পষ্ট করে বলেননি। কিন্তু বনবাসের তৃতীয় দিনে সুমন্ত্র সারথি আর গুহককে বিদায় দিয়ে যেই না রামচন্দ্র গঙ্গাপারের অরণ্যসঙ্কুল ভূমিখণ্ডে পৌঁছেছেন, তখনই ক্ষিদের চোটে আগে তিন রকমের হরিণ আর একটি শুয়োর মেরে নিলেন— তৌ তত্র হত্বা চতুরো মহামৃগান্ বরাহমৃষ্যং পৃষতং মহারুরুম্। আদায় মেধ্যং ত্বরিতং বুভুক্ষিতৌ। ক্ষিধে বেশি লাগলে খাবারের জোগাড় কম থাকলে ভাল লাগে না— এই মনস্তত্ত্ব থেকেই হয়তো তিন জনের জন্যে চারটে গোটা পশু মেরে নিয়েছিলেন দুই ভাই, কিন্তু পুরোটা তাঁরা খেতে পেরেছিলেন কিনা সে খবর আমরা বাল্মীকির কাছে পাইনি। বনবাসের চতুর্থ দিনে এবং রাতে রামচন্দ্র ছিলেন ভরদ্বাজ মুনির অতিথি, কাজেই খাওয়া-দাওয়া ভালই হয়েছিল, যদিও তাঁর 'মেনু'তে আমিষ ছিল না। কিন্তু ভরদ্বাজের নির্দেশে দু ভাই সীতাকে নিয়ে যেদিন চিত্রকূটে বাল্মীকির আশ্রমে পৌঁছলেন সেদিনটা ছিল বনবাসের পঞ্চম দিন। জায়গাটাও রামের ভারি পছন্দ হল এবং তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণকে তিনি বললেন কাঠ-পাতা দিয়ে একটি পর্ণকুটির তৈরি করতে। পর্ণকুটির তৈরি হলে, সেই বনবাসের মধ্যেও রামের ইচ্ছে হল সামান্য একটি গৃহ-প্রবেশের অনুষ্ঠান করতে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের প্রথম অঙ্গ হিসেবে রাম ছোট ভাইকে বললেন— একটা হরিণ মেরে আন আগে— মৃগং হত্বানয় শীঘ্রম্, কেননা হরিণের মাংস দিয়েই আজ আমাদের বাস্তুপূজা সারতে হবে— ঐণেয়ং মাংসমাহৃত্য শালাং যক্ষ্যামহে বয়ম্। বাস্তবে আমরা দেখেছি যে, দেবভক্ত মানুষেরা নিজেরা যে জিনিসটি খেতে পছন্দ করেন, সেই জিনিসটি ইষ্টদেবতার পছন্দ বলে নিবেদন করেন। এখানে বাস্তুযাগের উদ্দেশ্যে হরিণ মারা হল, না হরিণের মাংস খাওয়ার জন্যই বাস্তুপূজা করা হল— সে তর্ক নিষ্প্রয়োজন, তবে রামচন্দ্র আপন গৃহিণীকে মাংস রান্না করতে বললেন না। ছেলেরা বোধ হয় মাংস ভাল রাঁধে, তাই লক্ষ্মণকেই তিনি বললেন— ধ্রুব নক্ষত্র পার হয়ে যাচ্ছে, ভাই লক্ষ্মণ, তাড়াতাড়ি মাংস রান্নার ব্যবস্থা কর—

ঐণেয়ং শ্রপয়স্বেতৎ...ত্বর সৌম্য। লক্ষ্মণ খাবার যোগ্য একটি কালো হরিণ মেরে আনলেন এবং তার বিশুদ্ধ পাক-প্রণালীটি হল এই রকম—প্রথমেই তিনি আগুন জ্বালিয়ে হরিণটাকে ঝলসে নিলেন— অথ চিক্ষেপ সৌমিত্রিঃ সমিদ্ধে জাতবেদসি। তারপর যখন দেখলেন সমস্ত মাংসটি একেবারে গরম হয়ে গেছে, রক্তধারাগুলি গেছে সম্পূর্ণ শুকিয়ে তখন বুঝলেন হরিণের মাংস একেবারে সুসিদ্ধ হয়ে গেছে— তত্তু পক্বং সমাজ্ঞায় নিষ্টপ্তং ছিন্নশোণিতম্। রামকে গিয়ে বললেন— আমি একেবারে গোটা হরিণটাই 'রোস্ট' করে এনেছি— অয়ং সর্বঃ সমস্তাঙ্গঃ শৃতো কৃষ্ণমৃগো ময়া। এরপর সবাইকে দিয়ে থুয়ে মাংস খেয়ে গৃহপ্রবেশ করার পর বাল্মীকি মন্তব্য করেছেন— রাম যেন অযোধ্যার বিয়োগব্যথাই ভুলে গেছেন— জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ। হরিণের মাংস রামের কাছে এমনই জিনিস। আপনারা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু চিত্রকূটে রাম অনেকদিন ছিলেন এবং হরিণের মাংসের 'রোস্ট' মাঝে মাঝেই তাঁর প্রবাস-দুঃখ হরণ করেছে। এমনকি যেদিন ভরত সদলবলে রামকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলেন, সেদিনও লক্ষ্মণ হরিণের মাংস ঝলসাচ্ছিলেন, কেননা সেই আগুনের ধোঁয়া দেখেই ভরত রামের বাসস্থানটি চিনতে পারেন— ভরতো যত্র ধূমাগ্রং তত্র দৃষ্টিং সমাদধৎ। ভরত আসার আগেই রান্না হয়ে গেছে এবং লক্ষ্মণ তা দাদার হাতে তুলেও দিয়েছেন। চিত্রকূট পাহাড়ের এক জায়গায় বসে পাহাড়-ছোঁয়া মন্দাকিনীর তরঙ্গশোভা দেখাতে দেখাতে রামচন্দ্র যে বিষয়ে সীতাকে প্রলোভিত করে তুলতে চাইছিলেন, সেটা কিন্তু সেই হরিণের মাংস— সীতাং মাংসেন ছন্দয়ন্। সীতা বোধ হয় আর খেতে চাইছিলেন না। রাম বললেন— একটু খেয়েই দেখ না, খুব স্বাদ; ঘেন্না কিসের? খুব পরিষ্কার, খুব স্বাদের মাংস—ইদং মেধ্যম্ ইদং স্বাদু, আগুনে ঝলসে কিরকম তুকতুক করছে দেখ না—নিষ্টপ্তমিদম্ অগ্নিনা।

হরিণমাংসের স্বাদু গন্ধে সীয়াবর রামচন্দ্র অরণ্যের মধ্যে কালক্ষেপ করতে থাকলেন বটে কিন্তু কৌশল্যার কাছে রামের যে নিরামিষ খাওয়ার প্রতিজ্ঞা ছিল, সে প্রতিজ্ঞার কথা বনবাসের আতুর অবস্থায় অতি সঙ্গত কারণেই বাল্মীকি মনে রাখেননি। আমাদের প্রাদেশিক রামায়ণগুলি কিন্তু একান্ত ভ্রমবশত অথবা প্রভু রামের প্রতি অতি সম্ভ্রমবশত, রামকে মদ্য-মাংসের ধারে কাছে যেতে দেননি। কৃত্তিবাস, তুলসীদাস—এঁরা সবাই ব্রাহ্মণ্য এবং বৈষ্ণবী হাওয়ায় মানুষ; এঁরা কোন অবস্থাতেই ক্ষত্রিয়কুমারের স্বাভাবিক খাদ্য রাম-লক্ষ্মণকে খেতে দেননি। তুলসীদাস তো শুধু চিত্রকূট পাহাড়ের আনাচেকানাচে লক্ষ্মণ আর সীতাকে দিয়ে

প্রচুর তুলসীগাছ লাগিয়ে দিয়েছেন— তুলসী তরুবর বিবিধ সুহায়ে। কঁহু কঁহু সিয় কঁহু লষণ লগায়ে ॥ এই বৃন্দাবিপিনে রাম-সীতা হরিণের মাংস খাবেন কি, তাঁরা বটের ছায়ায় বেদি বাঁধিয়ে শুধু বেদ-পুরাণের কাহিনী শোনেন। আমাদের কৃত্তিবাস আবার আরেক কাঠি! তিনি এসব কথা বলতে না পেরে কোথাও সীতাকে দিয়ে দশরথের উদ্দেশে বালির পিণ্ড দিইয়েছেন, কোথাও ব্রাহ্মণ, তুলসী আর ফল্গুনদীকে মিথ্যা সাক্ষ্যের অপরাধে অভিশাপ দিইয়েছেন, কোথাও বা রামসীতাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন গয়াধামে দশরথের সাংবৎসরিক পিণ্ডি দেবার জন্য, যদিও মূল রামায়ণে এসব কিছুই নেই। চরিত্রের দিক দিয়েও এই সব রামায়ণগুলিতে রামচন্দ্রকে এমন এক আদর্শের পদ্মাসনে বসানো হয়েছে যে স্বয়ং বাল্মীকিও তাঁর আপন হাতে-গড়া চরিত্রগুলিকে চিনতে পারবেন না। কৃত্তিবাসে বনে যাবার কথা শুনে রাম সহাস্যবদনে কৈকেয়ীকে বলেন— 'তোমার আজ্ঞায় মাতা এই যাই বনে' এবং বনে গিয়েও কৈকেয়ী সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন বিক্রিয়া হয়নি, পিতা দশরথ সম্বন্ধে তো নয়ই। বরঞ্চ 'যেখানে শুনেন রাম পিতার নিন্দন। করেন সে স্থান হতে ত্বরিতে গমন ॥' কিন্তু বাল্মীকির রাম যে মানুষ। বনে যাবার সময় আদর্শবাদের ঠেলায় তিনি যত বড় বড় কথাই বলুন না কেন, বনবাসের তৃতীয় রাত্রিতে যখন সুমন্ত্র কিংবা গুহক কেউই আর কাছে নেই, তখন নীল আকাশের তলায় রামের বোধহয় বড়ো একা লাগল। লক্ষ্মণকে তিনি বললেন— মনুষ্য বসতির বাইরে একেবারে অরণ্যের মধ্যে এই আমাদের প্রথম রাত্রি— অদ্যেয়ং প্রথমা রাত্রি যাতা জনপদাদ্ বহিঃ। কিছুক্ষণ আগে বন্য শুয়োর আর মৃগমাংস খেয়ে বিশাল বনস্পতির তলায় শুয়ে রাম একেবারে মানুষের মতই বললেন— ভাই লক্ষ্মণ! এতদিনে ভরত অযোধ্যায় এসে গেছে, তাকে দেখে জোর পেয়ে কৈকেয়ী আবার দশরথকে প্রাণে না মেরে ফেলেন— অপি ন চ্যাবয়েৎ প্রাণান্ দৃষ্ট্বা ভরতমাগতম্। এর আগে রামের মুখ দিয়ে বাল্মীকি রামায়ণেও দশরথ সম্বন্ধে কোন তিক্ত মন্তব্য শোনা যায়নি। কিন্তু আজ যেন তাঁর সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, রামের মুখ যেন খুলে গেল। তিনি বললেন— একে আমি কাছে নেই, তায় বুড়ো আবার কামুক, কৈকেয়ীর হাতের পুতুল, কি যে করবে— কিং করিষ্যতি কামাত্মা কৈকেয্যা বশমাগতঃ? পিতার বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখে আজ মনে হচ্ছে ভাই ধর্ম-অর্থ— এগুলোর থেকে কামই বড়, নইলে কোন্ মূর্খ বৌ-এর কানভাঙানি খেয়ে একান্ত বশংবদ পুত্রকে তাড়িয়ে দিতে পারে— কো হ্যবিদ্বানপি পুমান্ প্রমদায়াঃ কৃতে ত্যজেৎ। আর ভরত আর তার বৌ-এর ভাগ্য দেখ! আজ বাদে কাল বুড়ো রাজা মারা যাবে, আর আমিও

বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আজকে অযোধ্যার রাজ্য পেয়ে তারাই সবচেয়ে সুখী হল·। যে মানুষ ধর্ম অর্থ বাদ দিয়ে শুধু কামনার সেবা করে সে হয়তো দশরথের মত বিপদে পড়ে। তা পড়ুক, লক্ষ্মণ ভাই, তুমি বরং বাড়ি যাও, নইলে কৈকেয়ী আমার মা কিংবা তোমার মা-কে বিষ খাইয়ে মারতে পারে— ক্ষুদ্রকর্মা হি কৈকেয়ী দ্বেষাদ্ অন্যায়মাচরেৎ। পরিদদ্যাদ্ হি ধর্মজ্ঞ গরং তে মম মাতরম্ ॥

মানুষের মত রামচন্দ্রের এই সব স্বাভাবিক সন্দেহের কথা, মনের কথা প্রাদেশিক রামায়ণগুলি ভুলেও উচ্চারণ করেনি। কিন্তু কোন্ মুনিকে রাম কতবার প্রণাম করেছেন, উল্টে কত মুনি রামচন্দ্রকে 'নারায়ণ' বলে চিনতে পেরেছেন— এই সব চিন্তাতে তুলসীদাস, কৃত্তিবাস, কম্ব এবং রঙ্গনাথ পদে পদে বাল্মীকিকে ছাপিয়ে গেছেন। এই যে নিষাদরাজ গুহ তাঁর সঙ্গে রামচন্দ্রের মাখামাখি বেশি দেখানইনি প্রাদেশিক রামায়ণকারেরা। কম্ব তো তাঁকে প্রথম থেকেই পুরো রামভক্ত সাজিয়ে দিয়েছেন। অথচ বাল্মীকিতে নিষাদরাজ গুহক রামের 'আত্মসমঃ সখা'। সে গুণী লোক, বড় একজন স্থপতি বলে সে বিখ্যাত— স্থপতিরিতি বিশ্রুতঃ। রাম তাঁকে দেখলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সম্ভাষণ করেন, আর দেখামাত্র জড়িয়ে ধরেন। আসলে রামের সমাজে যে অস্পৃশ্যতার অত বালাই ছিল না, এ কথাটা চেপে যাবার জন্যই প্রাদেশিক রামায়ণকারেরা গুহককে সখ্যরসের ভক্ত সাজিয়ে দিয়েছেন। গুহ রামকে তুই-তোকারি করলে কৃত্তিবাস ভয় পেয়ে বলেন— ভক্তিমাত্র লন রাম, নাহি লন দোষ। অথচ বাল্মীকিতে নিষাদরাজ হেঁটে এসে রামের সঙ্গে দেখা করতেই রাম কৃতার্থ বোধ করেন— পদ্ভ্যাম্ অভিগমাচ্চৈব স্নেহসন্দর্শনেন চ। তফাতটা এইখানেই।

স্পৃশ্যতা অস্পৃশ্যতা ছেড়ে আবার মূল প্রসঙ্গে আসি। অরণ্যবাসে রামের দিন ভালই কাটছিল, তবে কৃত্তিবাসী কায়দায় 'ফুলধনু হাতে রাম বেড়ান কাননে'— এমন কায়দায় তাঁর দিন চলছিল না। যত গভীর অরণ্যে প্রবেশ করছিলেন, রাক্ষসের ভয় তত বাড়ছিল। কত তপস্বী মহামুনির আশ্রম দেখে, এ বন থেকে সে বনে ঘুরে রামের দশ বছ্ছর কেটে গেল— রমতশ্চানুকূল্যেন যযুঃ সংবৎসরা দশ। অগস্ত্যমুনি, পিতৃবন্ধু জটায়ুর সঙ্গে পরিচয় হল, রাম দণ্ডকারণ্যে এসে পৌঁছোলেন। ঠিক এই সময়টা সীতা রামচন্দ্রকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন— ঋষিরা বললেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি প্রতিজ্ঞা করে বসলে— 'আমি দণ্ডকবনের সমস্ত রাক্ষস বধ করব'। কেন ? রাক্ষসেরা তোমার কি শত্রুতা করেছে যে, বিনা কারণে তাদের ধরে ধরে তুমি মারবে— ন কথঞ্চন সা

কার্যা···বুদ্ধিবৈরং বিনা হন্তুং রাক্ষসান্ দণ্ডকাশ্রিতান্। রাম সীতার কথার খুব একটা মূল্য দিলেন না এবং ক্ষত্রিয়ধর্মকে সাক্ষী মেনে সীতাকে বুঝিয়েও দিলেন। ঠিক এই রকম একটা সময়েই সব কিছু উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। রাবণের বোন শূর্পণখার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কির শেষরক্ষা করতে পারলেন না রাম লক্ষ্মণ। শূর্পণখার নাক-কান কাটা গেল, দণ্ডকারণ্যের 'কেয়ারটেকার' খর এবং তার সেনাপতি দূষণও রামের হাতে মারা গেল। রাক্ষসদের সঙ্গে বৈরিতার এই সূত্রপাত।

দণ্ডকারণ্য রাবণের বাগানবাড়ির মত। আর্য ভূখণ্ডের এত কাছে রাবণের বাগান, ব্যক্তিগত জনস্থান— এসব রাবণের প্রতিপত্তির পরিচয় দেয়। বাল্মীকি রামায়ণে রাবণের কাছে প্রথম যে শূর্পণখার নাক-কান কাটার খবর দেয় সে হল অকম্পন, শূর্পণখা নয়, যা কৃত্তিবাস-তুলসীদাসে আছে। বাল্মীকিতে রাবণের কাছে খবর দেবার সময় শূর্পণখা রামের প্রতি তার নিজের আসক্তির কথা চেপে গিয়ে বলেছিল— সুন্দরী সীতা, সে শুধু তোমারই যোগ্য। তোমার জন্য আমিই তাকে তুলে আনছিলাম, কিন্তু বাদ সাধল লক্ষ্মণ —ভার্যার্থে তু তবানেতুমুদ্যতাহং বরাননাম্। বিরূপিতাস্মি ক্রূরেণ লক্ষ্মণেন মহাভুজ ।।সব শুনে রাবণ সমুদ্র পার হয়ে মায়াবী মারীচকে সহায় করে সীতা হরণ করতে এলেন। মায়াবী রাক্ষসের মনোহরণ সোনার রূপে যিনি একটুও বিচলিত হননি, তিনি হলেন লক্ষ্মণ, তিনি মারীচকে পরিষ্কার চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু মায়ামৃগের অলোকসামান্য রূপ দেখে সীতা যেমন রামকে প্ররোচিত করেছেন, রামেরও তেমনি লোভ হয়েছিল— লোভিতস্তেন রূপেন সীতয়া চ প্রচোদিতঃ। মহাভারতকার ব্যাসদেবও তাই লিখেছেন— সোনার হরিণ অসম্ভব জেনেও রামের লোভ হল—অসম্ভবং হেমমৃগস্য জন্ম তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়। যা হোক রাম গেলেন কিন্তু মারীচের মায়াস্বরের আকুতি অনুধাবন করে সীতার যতটুকু অনুতাপ হয়েছে, তার চেয়ে বেশি তিনি সতী হয়ে উঠলেন। চির হিতাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্মণকে তিনি তখন যে ভাষায় গালাগালি দিয়েছেন তাতে ধারণা হয় সীতা রামের জন্য যতখানি দুশ্চিন্তা ভোগ করছিলেন, তার চেয়েও তিনি নিজের রূপ সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। বহু জায়গায় এই সচেতনতার প্রকাশ ঘটেছে আড়ে-ঠারে, কোথাও বা একটু নগ্নভাবেই। পরবর্তী লঙ্কাকাণ্ডে ইন্দ্রজিৎ যখন রাম-লক্ষ্মণকে রণক্ষেত্রে নাগপাশে বন্ধ করে রেখে গেলেন, তখন রাবণ আদেশ দিলেন সীতাকে পুষ্পক বিমানে চড়িয়ে নিহত রাম-লক্ষ্মণকে দেখিয়ে আনতে। ভূমিশায়িত রাম-লক্ষ্মণকে দেখেই সীতা বিলাপ করতে থাকলেন। সেই বিলাপে

আপাত শোকের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল সীতার আপন রূপ-গুণের সচেতনতা। সীতা বললেন— জ্যোতিষীগুলো কি সব মিথ্যা বলেছে। যে সমস্ত দুর্লক্ষণ থাকলে মেয়েরা দুর্ভাগা হয়, তার একটা লক্ষণও তো আমার মধ্যে নেই। আমার চুলগুলো কিরকম সরু, সমান এবং ভীষণ কালো, ভুরু দুটোও তো জোড়া নয়। জঙ্ঘা দুটো সুগোল, এমনকি একফোঁটা লোম নেই তাতে। ঝকঝকে দাঁতের মধ্যে কোথাও একটু ফাঁক নেই। অপাঙ্গ, চোখ, হাতের আঙুল— কোথাও কোন খুঁত নেই। ঊরু দুটি আমার পরস্পর সংযুক্ত, স্তনযুগল পীন, উন্নত এবং সে দুটির মধ্যে অভাব আছে একমাত্র স্থানের, চূচুকদুটি আপনাতে আপনি নিমগ্ন— স্তনৌ চাবিরলৌ পীনৌ মামকৌ মগ্নচূচুকৌ। আমার স্তনের পাশটা এবং বক্ষোদেশ বিশাল, নাভির পাশটা উন্নত কিন্তু নাভিটি সুগভীর। আমার গায়ের রঙ মণির মত উজ্জ্বল। হায়! যেসব কারণে কন্যালক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতেরা আমাকে সুলক্ষণা বলেছে, তাঁরা কি সব মিথ্যে বলেছে— তৎ সর্বং বিতথীকৃতম্।

অতিশোকের মধ্যেও যে মহিলা আপন মুখে নিজের উন্নত দেহলক্ষণ বর্ণনা করতে পারেন, তিনি নিজের রূপ সম্বন্ধে সজাগ নয়তো কি! কেননা এর মধ্যে গুণের বর্ণনা কিছুই নেই, আছে শুধু আত্মরূপের স্তুতি যা কিনা ক্ষেত্র-বিশেষে বিকারের রূপ নিয়েছে, যার বলি হয়েছেন লক্ষ্মণ। এই বিকারবশেই সীতা লক্ষ্মণকে বললেন—বন্ধুর ছলে আসলে তুমি রামের শত্রু। তুমি ভাবছ রাম মরবে আর তুমি আমাকে বিয়ে করবে— ইচ্ছসি ত্বং বিনশ্যন্তং রামং লক্ষ্মণ মৎকৃতে। আমাকে পাবার লোভেই তুমি আসলে রামের ডাক শুনতে পাচ্ছ না— লোভাত্তু মৎকৃতে নূনং রাঘবং নানুগচ্ছসি। লক্ষ্মণ অনেক বোঝালেন, কিন্তু সীতা যে কথা বিনয়-মধুর বাক্যে লক্ষ্মণকে বলতে পারতেন, তার ধারেকাছে না গিয়ে অত্যন্ত অপমানসূচকভাবে লক্ষ্মণকে বললেন— দুরাচার, নৃশংস কুলপাংসন, রামের বিপদই তোর কাম্য, তুই চিরকালই নিজের আসল স্বভাবটি চেপে রেখেছিস— নিত্যং প্রচ্ছন্নচারিষু। হয় ভরতের কথামত, নয়তো নিজেই আমাকে হাত করবার জন্য নিজের অভিপ্রায় গোপন রেখে একা রামের সঙ্গে এসেছিস—মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা। কিন্তু ভরত কিংবা তোর, কারও ইচ্ছেই পূরণ হবে না, রাম ছাড়া আমি এক মুহূর্তও বাঁচব না— তন্ন সিধ্যতি সৌমিত্রে তবাপি ভরতস্য বা।

চিরকালের সঙ্গী, ভৃত্যের মত বিশ্বস্ত লক্ষ্মণকে এ সব কথা বলার পেছনে রামের জন্য সীতার উদ্বেগ এবং সতীত্বই বড় ছিল, কিন্তু সেইটেই সব নয়। সময়কালে দেবী সীতা বড়ই মুখরা ছিলেন। চরম সতীত্বের অন্তরালে সীতার

আত্মসচেতনতাও কম ছিল না। বনে আসবার সময় রাম সীতাকে বলেছিলেন— বনে বড়ো বিপদ সীতা, তুমি অযোধ্যাতেই থাক। এখানে তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি আছেন, তাঁদের সেবা করে দিন কাটিয়ে দাও। প্রাণের ভাই ভরত এখন রাজা হয়েছে, তুমি তার অনুবর্তিনী হয়ে অযোধ্যাতেই থাক— স ত্বং বসেহ কল্যাণি রাজ্ঞঃ সমনুবর্তিনী। কিন্তু জননী কৌশল্যা অযোধ্যায় থাকতে পারলেও, লক্ষ্মণ-পত্নী উর্মিলা অযোধ্যায় থাকতে পারলেও সীতা কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ি কিংবা ভরতের অধিকারে থাকতে পছন্দ করেননি। তিনি বলেছেন— বাপ, ভাই, মা, বন্ধু— এঁরা আমার আশ্রয় নন— ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ। স্বামীই আমার আশ্রয়। তোমার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে, আমাকে এত ছোট ভাব বলেই তুমি এ কথা বলতে পারলে— কিমিদং ভাষযে রাম বাক্যং লঘুতয়া ধ্রুবম্। এরপর সীতা অবশ্য অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন। কিন্তু ভরতের কাছে থাকার ব্যাপারে তাঁর ক্ষোভটা প্রকাশ করলেন রাম যখন আবার বনবাসের বিপদ শোনাতে আরম্ভ করলেন। সীতা বললেন— আমার পিতা জনক কি করে জানবেন যে তাঁর জামাই আসলে পুরুষের চেহারায় একটা মেয়েমানুষ— স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহম্। চরিত্র শক্তিহীন রঙ্গমঞ্চের অভিনেতারা যেমন কুমারী অবস্থায় পরিণীতা বহুকালের সহবাসিনী স্ত্রীকে অন্যের ভোগে দেয়, আমাকেও তুমি তেমনি পরের কাছে রেখে যেতে চাইছ— শৈলূষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি। যে ভরত মহারাজের হিতসাধনে অনুবর্তিনী হওয়ার জন্য আমায় এত উপদেশ দিচ্ছ, সেই ভরতের অধীন হয়ে তুমি থাকগে যাও— ত্বং তস্য ভব বশ্যশ্চ বিধেয়শ্চ সদানঘ।

হয়তো বনে পর্যন্ত স্বামী-সহবাসে থাকার জন্যই এত সব কটু কথা বলেছেন, হয়তো রামের জন্য দুশ্চিন্তা হেতুই লক্ষ্মণকে তিনি যা-তা বলেছেন। কিন্তু রাম যে বলেছিলেন, 'ভরতের কাছে থাক'—তার মানে কি ভরতের ভোগ্যা হয়ে থাকা, অথচ সীতা এইরকমই একটা অর্থবিকার কল্পনা করেছেন, যে বিকার আবার ঘটেছে লক্ষ্মণকে যা নয় তাই বলার মধ্যে। এমন হতে পারে, রেগে গেলে সীতাদেবীর কথার মাত্রাই ছিল এমনিধারা, আর তা না হলে সীতার মনের কোণে কি এমন কোনও ধারণা ছিল যে, ভরত লক্ষ্মণ সবাই তাঁকে পাবার জন্য একেবারে ছোঁক ছোঁক করছেন। বাল্মীকি রামায়ণে সীতার কথা অসহ্য বোধ করেই লক্ষ্মণ শেষ পর্যন্ত ঘর ছাড়লেন। যাবার আগে বলে গেলেন—আমার সম্বন্ধে যখন এইসব সন্দেহ করছ, তখন মর তুমি, মেয়েছেলে তো আরও কত হবে—ধিক ত্বাম্ অদ্য বিনশ্যন্তীং যন্মামেবং বিশঙ্কসে। স্ত্রীত্বাদ্ দুষ্টস্বভাবেন…।

আসলে লক্ষ্মণের কপালটাই খারাপ। বনবাসে আসা অবধি তাঁর কাজকর্মের কামাই নেই। বাড়ি বানানো, হরিণ শিকার, রান্না করা—সবই তাঁর ঘাড়ে। আমাদের কৃত্তিবাস এবং রঙ্গনাথ আবার সম্পূর্ণ বনবাসকালে লক্ষ্মণের খাওয়া এবং ঘুম দুই-ই কেড়ে নিয়েছেন, তাতে লক্ষ্মণ হয়ে উঠেছেন আরও মহনীয়। কৃত্তিবাসে তো এই ঘুম এবং খাওয়া বন্ধের ফলেই লক্ষ্মণের পক্ষে ইন্দ্রজিৎ বধ সম্ভব হয়েছিল। বাল্মীকি রামায়ণে এসব অবাস্তব কল্পনা নেই, লক্ষ্মণের ঘুম এবং খাওয়ার ওপর তিনি কোনও হস্তক্ষেপ করেননি। বনবাসের তিন-চার দিনের মধ্যেই রাম-লক্ষ্মণ যখন চিত্রকূটে এসে পৌঁছেছেন, সেদিন রাতটা লক্ষ্মণ এমন ঘুমিয়েছিলেন যে সকালবেলাও তাঁর ঘুম ভাঙেনি, তাঁকে আস্তে আস্তে ডেকে তুললেন রাম—অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামবসুপ্তমনন্তরম্। প্রবোধয়ামাস শনৈ লক্ষ্মণং রঘুপুঙ্গবঃ ॥ লক্ষ্মণের খাওয়া এবং ঘুম নিয়ে অবশ্য আমাদের কোনও মাথা ব্যথা নেই, আমাদের বক্তব্য—সীতা না হয় বেবুঝ, কিন্তু লক্ষ্মণ সীতার কটু বাক্যগুলি আনুপূর্বিক রামের কাছে উদগিরণ করা সত্ত্বেও, রাম উল্টে লক্ষ্মণকেই বকাবকি করলেন। অবলা স্ত্রীলোকের কথায় ক্রোধের বশীভূত হওয়া নাকি লক্ষ্মণের ঠিক হয়নি। কিন্তু অবলা স্ত্রীলোকের বায়নাক্কা শুনে সোনার হরিণের বশীভূত হয়েছিলেন যিনি—মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতম্ অন্বধাবৎ—তাঁর কথা কে বলবে? লক্ষ্মণ তো বারণও করেছিলেন। যা হোক সীতার কথায় লক্ষ্মণ ঘর ছাড়লেন, যদিও পঞ্চবটীর পর্ণশালার সামনে গণ্ডি কেটে দেওয়ার ব্যাপারটা শুধুমাত্র কৃত্তিবাসী এবং রঙ্গনাথী রামায়ণেই আছে, বাল্মীকি রামায়ণেও নেই, কম্ব রামায়ণেও নেই। বাল্মীকির লক্ষ্মণ শুধু স্বস্তিবাচন করে সীতাকে রেখে গেছেন বনদেবতাদের ভরসায়—স্বস্তি তে'স্তু বরাননে। রক্ষন্তু ত্বাং বিশালাক্ষি সমগ্রা বনদেবতাঃ ॥

সীতা নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না। সুযোগ বুঝে ভিখারি-বেশী রাবণ সীতাকে হরণ করলেন, রাস্তায় মারা পড়লেন বৃদ্ধ জটায়ু। রাম যখন পঞ্চবটীতে এলেন তখন এই গৃধ্ররাজ বৃদ্ধ জটায়ু নিজেই রামকে বলেছিলেন—আমি তোমার পঞ্চবটী-বাসের সহায় হব। বাড়িতে যখন তুমিও থাকবে না, লক্ষ্মণও থাকবে না, আমি তখন সীতার রক্ষাবিধান করব—সীতাঞ্চ তাত রক্ষিষ্যে ত্বয়ি যাতে সলক্ষ্মণে। কম্ব রামায়ণে তাই দেখি, লক্ষ্মণ সীতার কথার জ্বালায় বেরিয়ে পড়ার পর বৃদ্ধ জটায়ুকেই স্মরণ করেছেন সীতাকে রক্ষা করার জন্য। অরণ্যকাণ্ডের মাঝামাঝি জায়গায় ঋষ্যমূক পর্বতের ওপর আমরা পাঁচজন বানরকে দেখতে পাই, যাদের লক্ষ করে সীতা তার গায়ের গয়না আর সোনার বরন ওড়নাখানি

খুলে ফেলে দেন রাবণের রথের ওপর থেকে। সীতাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা এই বানরেরা বিশেষভাবে লক্ষ করল।

আশ্চর্যের কথা হল একটি বুড়ো পাখি রাম-লক্ষ্মণের অবর্তমানে সীতাকে রক্ষার ভার নিয়েছে এবং কতকগুলি বানর সীতাকে জোর করে নিয়ে যাবার ব্যাপারটা বিশেষভাবে খেয়াল করেছে—এসব কি তা হলে রূপকথার গল্প? বাল্মীকি রামায়ণ যদি আর্যদের সঙ্গে অনার্য রাক্ষসদের যুদ্ধবিগ্রহের প্রতিরূপ হয়, তা হলে পণ্ডিতদের মত করে বলতেই হবে যে, রামচন্দ্র একটি উন্নত অনার্যগোষ্ঠীকে প্রতিহত করার জন্য আরও একটি অনার্যগোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। এই হাত মেলানো আরম্ভ হয়েছে সেই শৃঙ্গবেরপুরে নিষাদ রাজা গুহকের রাজ্য থেকে। নিষাদ রাজা যদি রামচন্দ্রের অভিন্নহৃদয় বন্ধু হন, তো গৃধ্ররাজ জটায়ু ছিলেন রামপিতা দশরথের বয়স্য। আসলে গৃধ্রেরা এমন একটি জাতি যাদের ডাকা হত গৃধ্র কিংবা সুপর্ণ নামে (উপাধি হিসেবে পক্ষী শব্দটি তো এই সেদিনও চলেছে)। এঁরা অরণ্যচারী ছিলেন এবং যাযাবরবৃত্তি। ভারতের পশ্চিমঘাট এবং পশ্চিম সমুদ্র তীরে গৃধ্রদের হয়তো কিছু ক্ষমতাও ছিল, যে ক্ষমতার অবসান ঘটে জটায়ু এবং তাঁর ভাই সম্পাতি মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে। জটায়ু রামকে সীতাহরণের সংবাদ দিয়েছিল আর তার ভাই সম্পাতি সমুদ্র তীরে ভগ্নহৃদয় বানরগোষ্ঠীকে রাবণের স্পষ্ট সংবাদ দিয়েছিল কাজেই যাযাবরবৃত্তি গৃধ্রদের ক্ষেত্রে সংবাদদাতার ভূমিকাটি বিশেষত লক্ষণীয়।

বাল্মীকি রামায়ণের বানরেরা, আমি বাঁদর না বলে এদের বানরই বলব—এরা মোটেই আমাদের দৃষ্ট-শ্রুত বানরদের মত ছিল না। তাদের বুদ্ধি, হৃদয় ক্ষমতা এবং চেহারার যে পরিচয় খোদ রামায়ণ থেকেই মেলে তাতে বোঝা যায়, এরা মানুষই ছিল, তবে অবশ্যই অনার্য সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রথম কথা, প্রাচীন সংস্কৃতে 'বা' শব্দটি উপমার্থে ব্যবহৃত হত এবং ভাষাগত দিক দিয়ে বা-নর মানে দাঁড়ায় নরের মত, মানুষের মত। মূল রামায়ণে বানরদের চেহারাও মোটেই বানরোচিত নয়। কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালির মুখটি যেন উষার আলোয় ধোয়া সূর্যের মত—তরুণার্কনিভাননম্ আর গায়ের রঙ ঠিক সোনার মত—বালী স কনকপ্রভঃ। বালির ভাই সুগ্রীবও তাই—'বরহেমবর্ণঃ' অথবা 'সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ'। বানরদের মধ্যে হনুমান, অঙ্গদ—এদের চেহারা ফর্সা বলেই সর্বত্র বলেছেন বাল্মীকি। তবে রঙচাপা বানরও যে ছিল না, তা নয়। সুগ্রীব, বালি, হনুমান এরা সবাই আর্যসমাজের প্রতিভূ সূর্য, ইন্দ্র, বায়ুর পুত্র হওয়ায় এঁদের রঙ কাঁচা সোনার মত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ব্রহ্মার অশ্রুবিন্দু থেকে ত্রিভুবনের

সেরা সুন্দরীটি জন্মেছিল, নাম তার ঋক্ষরজা। তার রূপ দেখে ইন্দ্র এবং সূর্য কেউই আত্মসংবরণ করতে পারেননি। ঋক্ষরজার চুলের মধ্যে ইন্দ্রের তেজ পতিত হওয়ায় কিষ্কিন্ধ্যার বানররাজার জন্ম, নাম হয় বালি—বালেষু পতিতং বীজং বালি নাম বভূব সঃ। আর গ্রীবার ওপরে পতিত সূর্যতেজ থেকে জন্মালেন সুগ্রীব। হনুমানের জন্মও এমনিধারা অলৌকিক। এ-ক্ষেত্রে সুন্দরী অঞ্জনা ধর্ষিতা হয়েছেন বায়ুদেবতার দ্বারা। দেবতাদের ঔরসে এইসব বানরদের জন্ম দিয়ে বাল্মীকি নিজের জন্য অদ্ভুত এক বৈজ্ঞানিক ফাঁপর তৈরি করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় এঁরা কেউই আক্ষরিক অর্থে বানর ছিলেন না। যদি লেজের কথা বলেন, তা হলে প্রথমে মনে রাখতে হবে—বালির বৌ তারা, সুগ্রীবের বৌ রুমা কিংবা অন্য কোন বানরীর লেজের কথা বাল্মীকি ভুলেও উচ্চারণ করেননি। তবে হ্যাঁ, বালি, সুগ্রীব, হনুমান অথবা কাপড়চোপড়-পরা রামায়ণের সব বানরেরাই একটা করে লেজ নিজের দেহে লাগিয়ে নিতেন। সুন্দরকাণ্ডে হনুমান যখন সমুদ্র পার হওয়ার জন্য বিরাট এক লম্ফ দিলেন, তখন তাঁর পশ্চাৎদেশে লাগানো লেজটি গরুড়ের মুখে লটকানো সাপের মত লাগছিল—তস্য লাঙ্গুলম্ আবিদ্ধম্ অতিবেগস্য পৃষ্ঠতঃ। দদৃশে গরুড়েনের হ্রিয়মানো মহোরগঃ॥

'আবিদ্ধ', 'সমাবিদ্ধ'—এইসব শব্দগুলি তো 'আটকানো', 'লাগানো' অর্থেই সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। যদি বা পণ্ডিতেরা শব্দের নানার্থ ভাবনায় 'আবিদ্ধ' শব্দের অন্য মানে করেন, তা হলে বলি বাল্মীকি রাবণের মুখ দিয়েই পরিষ্কার জানিয়েছেন যে রামায়ণী বানরদের লেজটা হল সম্মান এবং সৌন্দর্যের প্রতীক। সীতার খবর নেওয়ার পর রাবণকে দেখার ইচ্ছায় হনুমান রাবণের নন্দনকানন ভেঙে দিলেন এবং ইন্দ্রজিতের হাতে ধরা দিলেন। সবাই অবধ্য দূতকে বধ করবার উপদেশ দিলেও বিভীষণের কথামত রাবণ বললেন —বাপু হে, লেজ জিনিসটা বানরদের অত্যন্ত আদরের জিনিস এবং এটাই তাদের অলঙ্কার, সম্মানের প্রতীক—কপীনাং কিল লাঙ্গুলমিষ্টং ভবতি ভূষণম্। সাধারণভাবে বানরদের সম্বন্ধে এ কথা বলেই রাবণ বললেন—দাও ব্যাটার লেজগাছি পুড়িয়ে। পোড়া লেজ নিয়ে চলে যাক ও নিজের বানরসমাজে—তদস্য দীপ্যতাং শীঘ্রং তেন দগ্ধেন গচ্ছতু। আমাদের কৃত্তিবাস তো আমাদের চোখে দেখা হনুমানগুলির সঙ্গে বাল্মীকির হনুমানের স্বাজাত্য প্রণয়ন করার জন্য হনুমানের লেজের আগুন সাগরের জলেও নিভতে দেননি এবং প্রতিকারের জন্য হনুমানকে আবার সীতার কাছে নিয়ে এসেছেন। সীতা হনুমানকে বললেন লেজটা মুখের ভেতর পুরে দিতে। "তবে হনূ হয়ে অতি জ্বালায় কাতর। জ্বলন্ত

লাঙ্গুল পূরে মুখের ভিতর ॥" জ্বালা নির্বাণ হল বটে কিন্তু সেই অবধি সে মুখপোড়া হনুমান। সাগর-জলের আয়নায় মুখ দেখে বিষণ্ণ হনুমান আবার ফিরে এসেছে সীতার কাছে। সীতা অভয় দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেছেন—সমুদ্রের ওপারে গিয়ে দেখবি তোর আত্মীয় বন্ধু, সবারই মুখ-পোড়া—মম বাক্যে সকলেই হবে মুখ পোড়া। বাল্মীকির রামায়ণে লেজের আগুনে হনুমানের কোন কষ্টই বর্ণিত হয়নি এবং সে আগুন সাগরের জলেই নিভে গেছে, কাজেই লেজটা যে বানরদের কোন উপাঙ্গ ছিল না, সে কথা পরিষ্কার। তা ছাড়া বাল্মীকি রামায়ণের বানরেরা অনেকেই বেদ-বেদান্ত অর্থশাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদ ভাল জানত। কিন্তু অনেক বিচক্ষণতা সত্ত্বেও এই বানরেরা মাঝে মাঝেই উল্টোপাল্টা কাজ করে ফেলত এবং এই চাঞ্চল্যই ছিল এদের স্বভাবদোষ। কিন্তু কৃতকর্মের জন্য যখন তারা লজ্জিত হত, তখন নিজেই বলে উঠত—এটা একেবারে বাঁদরামি করে ফেলেছি—কপিত্বঞ্চ প্রদর্শিতম্। বাঁদর বাঁদরামি করছে—এ কথা আমরা বলি না, আমরা মানুষের উদ্দেশেও বলি বাঁদরামি কোর না। কিন্তু লঙ্কাদাহের পর হনুমান ভাবলেন লঙ্কার আগুন যদি অশোকবনেও বিস্তৃত হয় তা হলে তো সীতাও মারা পড়বেন—ইস্ ছি ছি, এই চাঞ্চল্যের জন্যই বাঁদরামি ব্যাপারটা বিখ্যাত হয়ে গেছে—প্রথিতং ত্রিষু লোকেষু কপিত্বমনবস্থিতম্। আবার বালিবধের পর সুগ্রীব অনুতাপে আত্মসমালোচনা করে বলছেন—বালিই নিজের মান রক্ষা করেছেন, তিনি কখনও আমাকে মেরে ফেলবার কথা ভাবেননি, কিন্তু আমি! আমি তার সঙ্গে ক্রোধ ব্যবহার এবং বাঁদরামি সবই করেছি—ময়া ক্রোধশ্চ কামশ্চ কপিত্বঞ্চ প্রদর্শিতম্।

বাঁদরামি বলতে 'কপিত্ব' কথাটির ব্যবহার অবশ্যই বাল্মীকির যোজনা, কিন্তু বাল্মীকির বক্তব্যেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁর রামায়ণের বানরদের জাত আলাদা এবং রাজনীতি জিনিসটা এই বানরেরা ভালই বুঝতেন। একটু পরেই আমরা সে কথায় আসব। রামের সঙ্গে ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা হবার আগে রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই শবরীর আশ্রমে যান। শবরী অবশ্যই শবর জাতির মেয়ে, মতঙ্গ মুনির কথায় তিনি রামদর্শনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে বুড়ো হয়ে গেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের ভাষ্যমত, শবরী পম্পা সরোবরের তীরে জন্মানো বন্য ফল সংগ্রহ করে রেখেছিলেন রামের জন্য—ময়া তু সঞ্চিতং বন্যং—পম্পায়াস্তীরসম্ভবম্। একমাত্র কম্ব রামায়ণেই দেখি, ভক্তি এবং অনুরাগের আতিশয্যে সেই বন্য ফলগুলি মিষ্টি কি না আগে চেখে দেখে তার পর সেগুলি রামের জন্যে রেখে দিয়েছেন শবরী। রঙ্গনাথী রামায়ণে এই খবরটি

সোজাসুজি না থাকলেও, তেলেগুভাষীরা শবরীর কথা উঠলেই এই ফল চাখার অনুরাগটুকু না জানিয়ে পারেন না।

শবরীর আশ্রম ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ঢুকে পড়ব। রাম যখন এখানে এলেন তখন বসন্তকাল এসে গেছে। সীতার অভাবে তিনি যতখানি মর্মাহত তার থেকেও বেশি মদনাহত। পম্পা সরোবরের তীরে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে রাম যে বিরহোক্তি করেছেন, তা খুব পরিস্রুত নয়, ধীরোদাত্ত নায়কের উপযুক্ত তো নয়ই। এগুলি যতখানি বিরহোক্তি তার থেকেও বেশি কামুকোক্তি। এটা অস্বাভাবিক তা আমি বলছি না,কিন্তু এই উক্তিগুলি সারা পথ, সমস্ত অধ্যায় ধরে শুনতে হয়েছে লক্ষ্মণকে।

বাল্মীকি তাঁর রামচন্দ্রকে কামগন্ধশূন্য কোন অতিদেব বানাতে চাননি। মহিমান্বিত প্রেমের মৃদু প্রলেপ গায়ে মেখে রামচন্দ্র এখানে শুধু বিরহোক্তি করেননি, বরঞ্চ বসন্তোদয়ে মৃগ-পক্ষীর রতিক্রীড়া দেখে তিনি নিতান্ত অলজ্জভাবে মানুষের মতই কামাসক্ত বোধ করেন। হাঁস-কোকিলের পারস্পরিক কামনার ডাক শুনে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলেন—ইস্, এখন সীতা থাকলে আমাকেও এইভাবে আকুল-ডাকে ডেকে নিয়ে আনন্দিত করত। এই দেখ না, ময়ূরী ময়ূরের সঙ্গে যে কামার্ত্ত ব্যবহার করছে, আমার সীতা অপহৃত না হলে ঠিক একইরকম সকাম ব্যবহার করত—মদনেনাভিবর্ত্তেত যদি নপেহৃতা ভবেৎ।

পম্পা সরোবরের তীরে মনোহর অরণ্যের মধ্যে রামচন্দ্র যত তির্য্যকপ্রাণীর কামক্রীড়া দেখেছেন, তাঁর কামবেগ তত বেড়েছে। বারবার তিনি বলেছেন—এরা কেমন রমন করছে, আর আমার কামোদ্দীপনা হচ্ছে—রমতে কান্তয়া সার্ধং কামম্ উদ্দীপয়ন্নিব।

সখেদে লক্ষণকে বলেন, যদি এখন শুধু সীতার সঙ্গে থাকতে পেতাম তা হ'লে ইন্দ্রপুরী কি অযোধ্যায়ও আমি ফিরে যেতাম না। বাল্মীকির রাম এই রকমই রক্তমাংসের মানুষ। অনেক ধীরোদাত্ত গুণের সঙ্গে তাঁর কামনা-বাসনাও বড় স্বাভাবিক করে দেখিয়েছেন বাল্মীকি।

এর পরেই সুগ্রীবের সঙ্গে রামের দেখা। সুগ্রীব যদিও রামকে বালির চর ভেবে হনুমানকে পাঠিয়েছিলেন যথাযথ খবর নিতে। কিন্তু হনুমানের ব্যাকরণসম্মত সংস্কৃত উচ্চারণ আর বাগ্মিতায় রাম এত অভিভূত হয়ে গেছিলেন যে অন্তত ন'টা শ্লোকে হনুমানের বাক্যবিন্যাসের প্রশংসা করেছেন। শেষে আপন বংশমর্যাদার কথা বারবার বলে তিনি সুগ্রীবের শরণ নিয়েছেন—সুগ্রীবং শরণং গতঃ। রাম এবং সুগ্রীব যে অগ্নিসাক্ষী করে পরস্পরের বন্ধু হলেন—সুগ্রীবো

রাঘবশ্চৈব বয়স্যত্বমুপাগতৌ—এইখানেই রাজনীতির আরম্ভ, দু'জনের প্রয়োজন ছিল দু'জনকেই। পাঠক মনে রাখবেন, রাম জন্মানোর অনেক আগে রাবণ এক সময় বালির সঙ্গে লড়তে এসেছিলেন। বালির সন্ধ্যা-বন্দনার সময়ে রাবণ উপস্থিত হওয়ায় বালি তাঁকে বগলদাবা করে চার সমুদ্রে সন্ধ্যা করে এলেন। বালির শক্তি দেখে রাবণ তাঁকে বললেন—তোমার সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করতে চাই অগ্নিসাক্ষী করে—ত্বয়া সহ চিরং সখ্যং সুস্নিগ্ধং পাবকাগ্রতঃ। বাল্মীকিতে বালি আর রাবণের সখ্যবন্ধনে যে আলিঙ্গন আর ভ্রাতৃভাবের ছবি ফুটে ওঠে, ঠিক একই ছবি আছে সুগ্রীব আর রামের বন্ধুত্বে।

মনে রাখতে হবে রামায়ণের যুগটা আর্যায়ণের যুগ। উত্তর ভারতে আর্যদের ঘাঁটি যখন সুরক্ষিত, তখন আস্তে আস্তে তাঁরা হাত বাড়িয়েছেন বিন্ধ্য পর্বতের ওপারটায়। আর্যায়ণের এই সম্ভাব্যতার কথা অনার্যদের অজানা ছিল না এবং ঠিক এই কারণেই অনার্য রাবণের সঙ্গে আরও এক ক্ষমতাশালী অনার্য প্রধানের বন্ধুত্ব রাজনীতির দিক থেকে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আবার দেখুন বালি আর সুগ্রীব যমজ ভাই, একটু বড়-ছোট। বড় ভাই রাজা হওয়ায় আরেক ভাইয়ের রাজ্যভোগের আশা জীবনের মত ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। রাজ্যের লোভেই সে 'ডিফেক্ট' করে বেরিয়ে গিয়ে হাত মেলাচ্ছে আর্যগোষ্ঠীর প্রধান পুরুষ রামচন্দ্রের সঙ্গে। একই গোষ্ঠীর মধ্যে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ নিতে রামচন্দ্র ছাড়েননি এবং ছাড়েননি এই জন্যেই যে বালির সঙ্গে রাবণের মৈত্রী চুক্তি অগ্নিশিখায় লিখিত হয়েছিল অনেক আগেই। দুই বিরোধী গোষ্ঠীর দুটি আলাদা আলাদা মৈত্রী চুক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করেই আমরা দেখব সুগ্রীব বারবার রামকে বলছেন যে, বিনা কারণে বালি তাঁকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছে এবং তাঁর স্ত্রী রুমাকেও নিজের অঙ্কশায়িনী করেছে—'এবং বিনিকৃতো রাম···হৃতভার্যো বনে ত্রস্তঃ'। সুগ্রীব 'হৃতভার্য', রাম হৃতভার্য। রামও বিনা কারণে রাজ্য থেকে বনে নির্বাসিত, সুগ্রীবও তাই। একই ভাব, একই সুর। রাম প্রতিজ্ঞা করলেন—আজ থেকে আমাদের এক দুঃখ, এক সুখ—একং দুঃখং সুখঞ্চ নৌ। মারব সেই বালিকে, যে তোমার পত্নীকে হরণ করেছে—বালিনং তং বধিষ্যামি তব ভার্যাপহারিণম্। হৃতপত্নীক রামের কাছে তখন যে কোন ভার্যা-হরণকারীই বধযোগ্য। সুগ্রীব কিন্তু রামের কাছে তাঁর নিজের অন্যায়ের কথা পুরোপুরি চেপে গেছেন। বালির স্ত্রী তারাবৌদির ওপরে সুগ্রীবের যে ভীষণ আসক্তি ছিল, সে কথা সুগ্রীব একবারও রামকে বলেননি। মায়াবী দুন্দুভিকে বধ করার জন্য বালি গুহায় ঢুকলে প্রহরারত সুগ্রীব যে গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে,

বালির শ্রাদ্ধ পর্যন্ত করে ফিরে এসেছিলেন—তার একটা বড় কারণ ছিল সুন্দরী তারা। বালির অনুপস্থিতিতে তারাকে আপন অঙ্কশায়িনী করতে তাঁর একটুও বাধেনি। আর বালি যে সুগ্রীবের স্ত্রী রুমাকে অধিকার করেছিলেন সে শুধু প্রতিহিংসাবশতই। কিন্তু রামের কাছে রুমা হরণের গপ্পোটি সুগ্রীব ফলাও করে বলেছেন কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে লঙ্ঘন করার কথা সুগ্রীব পুরোপুরিই চেপে গেছেন। রামও কি আর এসব কিছুই জানতেন না, কিন্তু নিজের অবস্থা বুঝে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই এসব কথায় কান দেননি বরঞ্চ অন্যায়ভাবে বালিবধ করে বসলেন। বালিবধের পর সাময়িক শ্মশানবৈরাগ্য এবং কুম্ভীরাশ্রুবর্ষণের পর সুগ্রীব আবার যাকে নিয়ে দিন-রাত মত্ত হয়ে উঠলেন সে কিন্তু তাঁর নিজের স্ত্রী রুমা নন, বালির স্ত্রী তারা—তারয়া সহিতঃ কামী সক্তঃ কপিবৃষস্তদা। রসে-রমণে, রামের কাছে নিজের প্রতিজ্ঞার কথাও সুগ্রীব ভুলে গেছেন। কিন্তু সুগ্রীবের এই কামোন্মত্ত অবস্থায় সীতার অন্বেষণ-কার্য বিলম্বিত হওয়ায় রাম যে সুগ্রীবের ওপর খুব চটে গেলেন তার পেছনে কারণ কিন্তু রামও সীতার জন্য একধরনের কামনা বোধ করছিলেন। দিন যত যাচ্ছিল সীতার জন্য তাঁর কামনা, আকাঙ্ক্ষা বেড়েই চলছিল। বিশেষত তিনি জানতেন সুগ্রীব কাম-ক্রীড়া করতেই বালিপত্নী তারা এবং রুমার সঙ্গে অন্তঃপুরে ঢুকেছেন অথচ সীতা-বিহনে রামের সে উপায় নেই—কামবৃত্তঞ্চ সুগ্রীবং নষ্টাঞ্চ জনকাত্মজাম্। এর ওপরে শরৎকালের নিসর্গ সৌন্দর্য তাঁর কামবেগ দ্বিগুণিত করছিল। তিনি ভাবলেন—সুদূরবাসিনী সীতাও হয়তো তাঁরই মত কাম-পীড়িত বোধ করছেন—সুদূরং পীড়য়েৎ কামঃ শরদ্‌গুণনিরন্তরঃ। এমনই রামচন্দ্রের বিপর্যস্ত অবস্থা যে, ফল-মূল কুড়িয়ে ফিরে এসে লক্ষ্মণ তাঁর দাদার কাম-প্রলাপ শুনে তাঁকে এক বকা লাগিয়েছেন। তিনি বললেন—এ কি! আর্যপুত্র, এত কামাবেশ হলে চলে, এরকম করলে তো আপনার পৌরুষ ধুলোয় মিশে যাবে—কিমার্য কামস্য বশংগতেন, কিমাত্ম-পৌরুষ্য-পরাভবেন। রামচন্দ্র অবশ্য লক্ষ্মণের বকায় খানিকটা আত্মস্থ হলেন এবং তাঁকেই বললেন সুগ্রীবকে সতর্ক করে দিতে। অবশ্য রাম যা বললেন তাতে বোঝা গেল তাঁর রাগটা কোথায়। তিনি বললেন—আমরা শোকে-তাপে মড়ছি, আর সুগ্রীব বসে বসে কামক্রীড়া করছে আর মদ খাচ্ছে—সামাত্য-পরিষৎ ক্রীড়ন্ পানমেবোপসেবতে। রামের কথার শেষে লক্ষ্মণ স্বয়ং কিষ্কিন্ধ্যায় এসে সুগ্রীবকে রীতিমত হুমকি দিয়ে বললেন—বালির মরার পথটি এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি—ন স সংকুচিতঃ পন্থা যেন বালি হতো গতঃ। সর্বত্র কামোন্মত্ততার ছড়াছড়ি দেখে লক্ষ্মণের রাগ আর

কিছুতেই কমে না। সুগ্রীব ভাবলেন তারার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে যদি লক্ষ্মণের কাছে যায়, তবে নির্ঘাত কাজ হবে, তার রাগও থাকবে না—ত্বদ্ দর্শনে বিশুদ্ধাত্মা মাস্ম কোপং করিষ্যাতি।

তারা চললেন। মদের ঘোরে টালমাটাল পায়ে মদবিহ্বলাক্ষি তারা গেলেন লক্ষ্মণের কাছে, আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণের মাথাটি নিচু হল—অবাঙ্‌মুখো'ভূৎ। তাঁর দৃষ্টিও প্রসন্ন হল। লক্ষ্মণ বললেন—সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন। বসে বসে শুধু মদ খেয়ে আর স্ত্রী বিহার করে সীতাকে খোঁজার সময়ই পার করে দিয়েছেন—ব্যতীতাংস্তান্ মদোদগ্রো বিহরন্ নাববুধ্যতে। এবারে তারা লক্ষ্মণকে একটু চিমটি কেটেই বললেন—কুমার! সবই বুঝি কিন্তু কাম জিনিসটা যে কি তা বোধ হয় তুমি জান না—ন কামতন্ত্রে তব বুদ্ধিরস্তি। এতকাল পরে সুগ্রীব আমাকে পেয়েছেন তো, তাই কামবশত নিয়ত আমার আঁচল-ধরা সুগ্রীবকে আপনি ক্ষমা করুন—তং কামবৃত্তং মম সন্নিকৃষ্টং/ কামাভিভোগাচ্চ বিমুক্তলজ্জং/ক্ষমস্ব.... । বেচারা আগে বহু কষ্ট পেয়েছে, এত দিনে একটু সুখের মুখ দেখেছে—সুদুঃখশায়িতং পূর্বং প্রাপ্যেদং সুখমুত্তমম্—তাই তাঁর বিশ্বামিত্র মুনির মত একটু বেসামাল অবস্থা। বিশ্বামিত্রের কথা আপনার মনে আছে তো? সেই যে সেই ঘৃতাচী অপ্সরার সঙ্গে দশ বছর রতিক্রীড়া করার পর, তপঃক্লিষ্ট মুনির মনে হয়েছিল, বুঝি এক দিন কেটেছে। সুগ্রীবেরও সেই অবস্থা, আপনি ক্ষমা করুন—জহি কোপম্ অরিন্দম। হয়তো লক্ষ্মণের রাগ কমে যেত, হয়তো ক্ষমা হয়ে যেত। কিন্তু তারার সঙ্গে লক্ষ্মণ যখন সুগ্রীবের অন্তঃপুরে পৌঁছোলেন, তখন যে তিনি তাঁকে চিন্তাকুল বিব্রত দেখবেন, তা নয়। তারা বাইরে গেছেন, অতএব তাঁর ফাঁকটুকু পুরিয়ে দিচ্ছিলেন রুমা। বিশেষত অন্তঃপুরে এসে রুমাকে সুগ্রীবের শীতল বক্ষে আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখেই লক্ষ্মণ আবার রাগে ফেটে পড়লেন। তাতে কাজও হল অবশ্য, বানর-রাজ্যে সীতা অন্বেষণের সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যার বহির্দ্বারে এবং অন্তঃপুরে সমস্ত পরিস্থিতিটি যিনি সামাল দেন, তিনি সুগ্রীব নন, তারাই। মূলত এই রুচিরা রমণীর জন্যই লক্ষ্মণ শান্ত হন এবং তাঁর কথাও শোনেন—প্রতিজগ্রাহ তদ্বচঃ।

লক্ষ্মণ-তারা-সুগ্রীব—এঁদের ঘটনা-পরম্পরা, যেমনটি আমরা বাল্মীকি রামায়ণে দেখলাম, তার মূল সুরটি কৃত্তিবাসী এবং রঙ্গনাথী রামায়ণেও ধরা আছে। তবে কৃত্তিবাস সুগ্রীবপত্নীর রুমা নামটি আধুনিকগন্ধী মনে করে তার নাম দিয়েছেন উমা। তুলসীদাসে এসব বর্ণনা ভক্তিরসে আপ্লুত। বাল্মীকিতে যা আছে তা সেখানে থাকা সম্ভবই নয়। কম্ব রামায়ণে কিন্তু লক্ষ্মণকে দেখে অঙ্গদ

প্রথম ছুটে যায় তারার কাছে এবং তারা সেখানে অঙ্গদ আর হনুমানকে রামের কার্যে বিলম্ব করার জন্য খুব একচোট বকাবকি করেন। শেষে তিনি লক্ষ্মণের কাছে পৌঁছোলেন, তখন তাঁকে দেখেই লক্ষ্মণের মনে পড়ল বিধবা মায়েদের কথা। বালিপত্নী তারা বিধবার বেশে সাদা থান কাপড় পরে লক্ষ্মণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। কম্বের বর্ণনামত তাঁর গলায় নেই মঙ্গলসূত্র, কপালে নেই কুমকুম। তারার এ চেহারা অবশ্যই সতীর তেজে অঙ্কিত কেন না প্রাতঃস্মরণীয়া মহাপাতকনাশিনী পঞ্চকন্যার মধ্যে বালি-সুগ্রীবের অন্তরঙ্গা পত্নী তারাও আছেন। মূল রামায়ণে অবশ্য তারার এই সতীলক্ষ্মী বর্ণনা নেই এবং সে বিষয়ে তাঁর কোন লজ্জাও নেই।

প্রকৃত কথায় আসি। বস্তুত লক্ষ্মণের হুঙ্কারেই সুগ্রীব আত্মস্থ হলেন, রামের কাছে প্রতিজ্ঞাপালনের ধর্মভয়ে নয়। অন্তত বালিপুত্র কুমার অঙ্গদেরও সেই ধারণা। তিনি বলেছেন সুগ্রীবের আবার ধর্ম! তিনি সীতাকে খোঁজবার আদেশ দিয়েছেন লক্ষ্মণের ভয়ে, ধর্মের ভয়ে নয়—লক্ষ্মণস্য ভয়েনেহ নাধর্মভয়ভীরুণা। আদিষ্টা মার্গিতুং সীতাং ধর্মস্তস্মিন্ কথং ভবেৎ॥ বালি মারা গেছে, রাজ্যও পাওয়া গেছে, মন্ত্রীরা বশ্যতাপন্ন, সুন্দরী তারাও হাতের মুঠোয়, এ অবস্থায় কেই বা পরের বৌ হারিয়ে গেছে বলে অত মাথা ঘামায়। প্রথম দিকে সমস্ত রাজ্যের ভার মন্ত্রীদের ওপর দিয়ে সুগ্রীব ইচ্ছেমত কামক্রীড়া করে বেড়াচ্ছিলেন। হনুমানের উপদেশে ত্রস্ত হয়ে একদিন খুব গরমভাবে তিনি আদেশ দিলেন—সমস্ত ভারতবর্ষের বানরকে আমি পনের দিনের মধ্যে কিষ্কিন্ধ্যায় দেখতে চাই, না আসলে মৃত্যুস্তস্য প্রাণান্তিকো দণ্ডো নাত্র কালবিচারণা। কিন্তু এও লোক-দেখানো আদেশ। তিনি তারারানীর সঙ্গে মত্ত হয়েই রইলেন এবং সত্যি কথা বলতে কি লক্ষ্মণের হুমকি না এলে তিনি মত্ত হয়েই থাকতেন। লক্ষ্মণের কথায় সুগ্রীবের ঘুম ভেঙেছে, তিনি সমস্ত বানরসেনাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে চারদিকে পাঠিয়ে দিলেন। শত অন্বেষণেও সীতাকে পাওয়া গেল না। যে পথে সবচেয়ে বিচক্ষণ দলটি গেছিল অর্থাৎ যে দলের দলপতি ছিলেন যুবরাজ অঙ্গদ, যে দলে হনুমান জাম্ববানের মত বুদ্ধিমান শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা ছিলেন, সে দলটি পর্যন্ত সমুদ্রের তীরে এসে হতাশ্বাস হয়ে বসে রইল, কেন না সীতা অন্বেষণের নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে। ঠিক এই মুহূর্তে যুবরাজ অঙ্গদের মুখ দিয়ে কতকগুলি সত্য কথা বেরিয়ে পড়ে ; হতাশা থেকেই হোক কিংবা সন্দেহ থেকেই হোক, অঙ্গদের কথাগুলি যথেষ্ট অনুধাবনযোগ্য। অঙ্গদ সমস্ত বানরদের উদ্দেশ করে বক্তৃতা করে বললেন—আমি আর বাড়ি ফিরব না। আপনারা

জানেন সুগ্রীব এখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং তার শাসনটাও বড়ো কড়া—তীক্ষ্ণঃপ্রকৃত্যা সুগ্রীবঃ স্বামিভাবে ব্যবস্থিতঃ। সময় পেরিয়ে গেছে, এখন ফিরে গেলেই প্রাণদণ্ড। মনে রাখবেন, আমি যুবরাজ বলে রেহাই পাব না, কেন না সুগ্রীব আমাকে যুবরাজ করেননি, করেছেন রাম—ন চাহং যৌবরাজ্যেন সুগ্রীবেনাভিষেচিতঃ। আমি বালির ছেলে বলে আগে থেকেই সুগ্রীব আমায় দেখতে পারেন না—স পূর্বং বদ্ধবৈরঃ—তার মধ্যে সীতার খবর পাইনি, আমাকে অবশ্যই মেরে ফেলবে। অতএব মরলে এখানেই মরব, সম্মান খুইয়ে মরতে চাই না। অঙ্গদের বক্তৃতা শুনে অনেক বানরই সুগ্রীবের ওপর ক্ষেপে গেল। আমাদের ধারণা, এরা ছিল সব অঙ্গদপক্ষীয় বানরের দল। কেন না যুবরাজ অঙ্গদের কিছু সাকরেদ ছিল এবং তাদের আমরা একবার দেখেছি বালিবধের সময়ে। বালিবধের খবর পেয়ে অঙ্গদপক্ষীয় বানরেরা এদিক-ওদিক পালাচ্ছিল—যে তু অঙ্গদপরীবারা বানরা হি মহাবলাঃ। এখন অঙ্গদের কথা শুনে তারাই ক্ষেপে উঠল মনে হয়, কিন্তু ক্ষেপার মুখে যে কথাটি তারা বলল, সেই কথাটি খুব খাঁটি। বানরেরা বলল—সত্যিই তো; সুগ্রীব ভীষণ নিষ্ঠুর, আর রামের কথাই বা কি বলি, তিনি প্রিয়ার প্রেমে বড়ো বেশি পাগল—তীক্ষ্ণঃপ্রকৃত্যা সুগ্রীবঃ প্রিয়ারক্তশ্চ রাঘবঃ।

যে রামের কাছে মিথ্যে কান ভাঙানি দিয়ে ভাইকে মারে সেই সুগ্রীবের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু রামের প্রেমে দুর্নাম—এ তো বড় সাংঘাতিক কথা। সন্দেহ নেই, রাম বড় প্রেমিক ছিলেন, কিন্তু বানরদের দিক থেকে জিনিসটা লক্ষ করুন। সীতা উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র এক ফোঁটা আর্যরক্ত খরচ করেননি, যা গেছে সব এই বানরদের ওপর দিয়ে। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে খবর পাচ্ছি—সীতাহরণের কথা শুনে ভরত তিনশ সামন্ত-রাজাকে সমরসজ্জায় সজ্জিত করে অযোধ্যায় মজুত রেখেছিলেন সময়মত রামের সাহায্যে পাঠাবার জন্য। রাম না হয় অভিমানে তাঁদের ডেকে পাঠাননি, কিন্তু যে ভরত রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য বন পর্যন্ত দৌড়েছিলেন, তিনি কেন সেই তিনশ নরপতিকে—ত্রিংশতং পৃথিবীপতীন্—পাঠালেন না রামের সাহায্যার্থে। তা হলে কি ধরে নিতে হবে রামের আমলে আর্যেতর মনুষ্যেরাই ভাল যুদ্ধ জানতেন, বালি কিংবা রাবণ। কিন্তু তাও তো নয়। বানরেরা তো যুদ্ধ করতেন গাছ পাথর আর বাহুবলের ক্ষমতায়। রাক্ষসেরাও বহু তপস্যায় যেসব অস্ত্র সংগ্রহ করতেন সেগুলিও তো আর্যদের চিরাভ্যস্ত ব্রহ্মাস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র প্রভৃতি। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, উন্নততর অস্ত্রবিদ্যাই ভারতবর্ষে আর্যদের প্রতিপত্তি দিয়েছে

এবং এই উন্নততর অস্ত্রকৌশল রাম-লক্ষ্মণের অবশ্যই জানা ছিল। এই কৌশলেই বানরগোষ্ঠী বিজিত হয়েছে এবং বিজিত রাজার সৈন্যবাহিনী নিয়ে রামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। বানরগোষ্ঠীর পরিশ্রমেই সীতার খোঁজ মিলেছে, তাদের রক্তের মূল্যেই লঙ্কার যুদ্ধে রামচন্দ্রের জয়। সমুদ্রতীরে যে বানর সৈন্যেরা এসেছিল তাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে, আবার ঘরে ফিরলেও প্রাণদণ্ড। এই অবস্থায় তাদের এই স্বাভাবিক খেদোক্তি এসেছে যে রাম তাদের পরিশ্রম এবং প্রাণের মূল্যে প্রিয়া-প্রেমের প্রমাণ দিচ্ছেন—প্রিয়ারক্তশ্চ রাঘবঃ। লক্ষ্মণ যে কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীবকে হুমকি দিয়েছিলেন, সেই হুমকির প্রথম চেহারাটা দেখেছিলেন অঙ্গদ ; তাই অঙ্গদের বক্তৃতার পর হনুমান অঙ্গদকে বারবার লক্ষ্মণের সেই শাণিত শরগুলির ভয়ই দেখিয়েছিলেন—অত্যুগ্রবেগা নিশিতা ঘোরা লক্ষ্মণসায়কাঃ। তার মানে, সুগ্রীব যেমন লক্ষ্মণের ভয়ে বানরদলকে সীতার অন্বেষণে লাগিয়েছিলেন, তেমনি এদের মধ্যেও লক্ষ্মণের ভয় ছিল। হনুমান অঙ্গদকে সুগ্রীবের গুণের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কিন্তু অঙ্গদের যেন আজকে মুখ খুলে গেছে। প্রিয় পিতার মৃত্যু, আপন জননীর প্রতি সুগ্রীবের লোভ, অবশেষে সেই সুগ্রীবের সঙ্গেই জননীর মাখামাখি দেখে অঙ্গদ আর স্থির থাকতে পারেননি। তিনি হনুমানকে সর্বসমক্ষে অভিযোগ করে বললেন—আপনি যে সুগ্রীবের স্থিরতা, শুচিতা—এইসব গুণ দেখতে পাচ্ছেন, এগুলি সুগ্রীবের মধ্যে একটুও নেই। বড় ভাই বেঁচে থাকতেই যে মায়ের সমান বড় ভায়ের বৌকে—ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য যো ভার্যাং জীবিতাং মহিষীং প্রিয়াম্—নিজের অঙ্কশায়িনী করে, তার আবার শুচিতা, তার আবার ধর্ম—কথং স ধর্মং জানীতে! যে অগ্নিসাক্ষী করে রামের হাত ধরে বলেছিল, 'সীতাকে খুঁজে দেব', সে দু'দিনেই তা ভুলে গেছে। এই কি উপকার স্মরণে রাখার শ্রদ্ধা ? আপনি যাই বলুন, অধর্মের ভয়ে নয়, লক্ষ্মণের বাণের ভয়েই তিনি আমাদের সীতার অন্বেষণে পাঠিয়েছেন—লক্ষ্মণস্য ভয়েনেহ নাধর্মভয়ভীরুণা।

আমরাও তাই মনে করি। রাম সোজাসুজি প্রবল পরাক্রান্ত বালির সঙ্গে যুদ্ধ করেননি ; সুগ্রীবের গলায় গজপুষ্পীর মালা দুলিয়ে একটি বাণেই তিনি বালিকে সাবাড় করেছেন, যা বালি রামের সম্বন্ধে ভাবতেও পারেননি। বালি রামকে অজস্র গালাগালি দিয়েছেন এবং বলেছেন—সামনাসামনি যুদ্ধ করলে আজকে তোমায় যমের মুখ দেখিয়ে ছাড়তাম—অদ্য বৈবস্বতং দেবং পশ্যেস্ত্বং নিহতো ময়া। বালি বললেন—আমার মত বানরের সঙ্গে যুদ্ধ করার কি কারণ থাকতে পারে তোমার ? অরণ্যজাত বস্তু, ফলমূল—এই তো আমাদের সম্পদ ; তোমরা

নিশ্চয়ই এই বন্য ফলের লোভে যুদ্ধ কর না। তোমরা যুদ্ধ কর জমি-জায়গা কিংবা সোনা-রুপোর জন্য—ভূমি র্হিরণ্যং রূপ্যঞ্চ নিগ্রহে কারণানি চ। তত্র কস্তে বনে লোভো মদীয়েষু ফলেষু বা॥

বস্তুত ভারতীয় ইতিহাসের পটভূমিকায় এ কথা অনস্বীকার্য যে, বন্য ফল কিংবা বন্যসম্পদে রামেরও লোভ ছিল না, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল স্বর্ণলঙ্কা জয় করা, সেই ফাঁকে যদি সুন্দরী অরণ্যভূমিও হাতে আসে তো মন্দ কি? বিশেষত পরাক্রান্ত বালিকে অন্যায়ভাবে বধ করে দুর্বলতর সুগ্রীবকে তিনি হাতের পুতুল বানিয়ে নিয়েছেন। আর স্বর্ণলঙ্কা জয় করাই যে রামের আসল উদ্দেশ্য ছিল, এমন কি সীতা উদ্ধারও নয়, সে কথা রাম নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন সীতা উদ্ধারের পর, সেই লঙ্কাকাণ্ডে। সীতার মনে দুঃখ দিয়েও তিনি তখন বলেছেন—তোমাকে রাক্ষসেরা যে অপমান করেছে, তা ক্ষালন করা আমার কর্তব্য। আমি নিজের মানরক্ষার জন্যে তাই রাবণকে মেরেছি—তৎকৃতং রাবণং হত্বা ময়েদং মানকাঙ্ক্ষিনা। মনে রেখো সীতা, বন্ধুদের সাহায্যে যে রণপরিশ্রম আমি করেছি তা মোটেই তোমার জন্যে নয়— ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ। তোমাকে হরণ করা হয়েছিল—এই অপবাদ খণ্ডন করে আমি আমার প্রখ্যাত বংশের মর্যাদা রক্ষা করেছি—প্রখ্যাতস্য আত্মবংশস্য ন্যঙ্গঞ্চ পরিমার্জিতা। রাম আরও একটা কথা বলেছেন—অগস্ত্য ঋষি যেমন এই দুর্জয় দক্ষিণ দিক জয় করেছিলেন, তেমনি রাবণকে মেরে আমি তোমাকে জয় করেছি—অগস্ত্যেন দুরাধর্ষা মুনিনা দক্ষিণেব দিক্।

উপমাটা খেয়াল করুন। অগস্ত্যের সঙ্গে রামের তুলনা আর দুর্জয় রাবণকে মেরে সীতা উদ্ধারের সঙ্গে দক্ষিণ দিকের তুলনা। আমরা জানি এই দক্ষিণ দিকটা পুরো জয় করাই ছিল রামের উদ্দেশ্য, যেটা বালি সাধারণভাবে বলেছেন—ভূমি র্হিরণ্যং রূপ্যঞ্চ। কিন্তু স্বর্ণলঙ্কা জয়ের আগে, বানরদের কাছে তিনি সীতা উদ্ধারের জিগির তুলেছেন এবং এতে বানরেরা ভেবেছে—একটিমাত্র স্ত্রীলোকের জন্য রামের এই বিশাল আয়োজন বড়ো বাড়াবাড়ি, তাই ছোট্ট করে তারা অনুযোগ করেছে—প্রিয়ারক্তশ্চ রাঘবঃ। অন্য দিকে সীতা উদ্ধারের পর সেই রামচন্দ্রই বলছেন—সীতা নয়, রাবণকে জয় করে বংশমর্যাদা রক্ষা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। বালি আর রাবণই যেহেতু ছিলেন দক্ষিণ জয়ের বাধা, তাই সে দু'জনকে মেরে ফেলায় অগস্ত্যের মত সম্পূর্ণ দক্ষিণ দিকটাও এসে গেল রামচন্দ্রের হাতে।

আপাতত এই বিশ্লেষণটা মনে রেখেই আমরা সমুদ্রতীরে বানরদের কাছে

ফিরে যাব। অঙ্গদের কথা শুনে সবাই খুব করে সুগ্রীবের নিন্দা করতে থাকল এবং মৃত বালির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। এই সময়ে জটায়ুর ভাই সম্পাতির কথায় সীতার ঠিকানা মিলে গেল, সম্পূর্ণ পরিস্থিতি আবার চলে গেল রাম এবং সুগ্রীবের অনুকূলে। সীতার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বানর সৈন্যদের মধ্যে উন্মাদনা ফিরে এসেছিল। সুগ্রীব এবং রাম সেইটাকেই কাজে লাগিয়েছেন সেতুবন্ধে এবং লঙ্কা জয়ে। সেতুবন্ধনের সময় কাঠবেড়ালীরা যে বানরদের সাহায্য করেছিল, এ খবর মূল রামায়ণে নেই কিন্তু কৃত্তিবাসে আছে, আর আছে রঙ্গনাথের রামায়ণে। রামের কোমল অঙ্গুলিস্পর্শে কাঠবেড়ালীর পিঠের ওপর যে লম্বা লম্বা আঁচড় পড়ল, তার খবর আছে শুধু রঙ্গনাথের রামায়ণে। কৃত্তিবাসের কোনও কোনও সংস্করণে এই ঘটনাটা আছে বটে, তবে সব সংস্করণে নেই। সেতুবন্ধে রামেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠার কাহিনীও শুধু কৃত্তিবাসেই আছে, বাল্মীকিতে নেই। কিন্তু এ ঘটনা এতই প্রসিদ্ধ যে আর্য দেবতা রামচন্দ্র এবং অনার্যদের দেবতা শিবকে একেবারে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে পণ্ডিতেরা রামেশ্বর শব্দটির সমাস ভেঙে বলেছেন—'রামের ঈশ্বর' রামেশ্বর শিব, ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস অথবা 'রাম যাঁর ঈশ্বর' এমন শিব বহুব্রীহি সমাস। সমুদ্রের পারে রাম আর শিবের মুচকি হাসির সুধাবৃষ্টি এবং পরস্পর-প্রশংসা বাল্মীকির কল্পনাতে আসেনি। যা হোক আমরা আপাতত রামকে বানরবৃন্দসহ সমুদ্রের পারে রেখে অল্পক্ষণের জন্য রাক্ষসরাজ রাবণের লঙ্কাপুরীতে ঢুকব।

কি করে বোঝাই, রামায়ণের বানরেরা যেমন বাস্তবের বানর নয়, রামায়ণের রাক্ষসেরাও তেমনি আসলে রাক্ষস নয়। রাবণ তো ব্রাহ্মণদের মত হোম করতেন রীতিমত। বেদান্ত শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত, বৈদিক কর্মকাণ্ডেও অগ্রণী পুরুষ—এষ আহিতাগ্নিশ্চ মহাতপাশ্চ বেদান্তগঃ কর্মসু চাগ্র্যশূরঃ। রাবণের আপন গৃহের গার্হপত্য অগ্নি থেকেই রাবণের শবদেহে অগ্নিসংস্কার করা হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা সেখানে চোখের জলে মন্ত্র পড়েছে—রাবণং রাক্ষসাধীশং অশ্রুপূর্ণমুখা দ্বিজাঃ। রাবণকে চিতাতেও তোলা হয়েছে রীতিমত বেদবিধি অনুসারে—ব্রাহ্ম্যা সংবর্ত্তয়ামাসুঃ, যদিও তান্ত্রিক আচারও ছিল যথেষ্ট। যদি বলেন রামের সংস্পর্শে আসার পর রাক্ষসেরা এইসব আর্য আচার গ্রহণ করেছেন, তা তো মোটেই নয়, আহিতাগ্নি, 'বেদবিদ্যাবিধিস্নাত' বেদান্তবিৎ—এইসব বিশেষণ তো রাবণের চিরকালের। এতেও যদি বিশ্বাস না হয়, তা হলে আমাদের হনুমানের সঙ্গে রাবণের অন্তঃপুরে ঢুকতে হবে। সেই যখন হনুমান একা সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে রাবণের অন্তঃপুরে ঢুকে পড়েছিলেন। লঙ্কা-গৃহের নান্দনিক স্থাপত্য দেখে

হনুমান ভেবেছিলেন—এ কি স্বর্গপুরী না দেবলোক, নাকি ইন্দ্রপুরী—স্বর্গোঽয়ং দেবলোকোঽয়ম্ ইন্দ্রস্যাপি পুরী ভবেৎ। লঙ্কার মধ্যে ঢুকে হনুমান যেমন মদনবিদ্ধা রমণীদের শিঞ্জিনীধ্বনি শুনেছিলেন তেমনি বেদ্যাধায়ী রাক্ষসদের মন্ত্রধ্বনি স্তবস্তুতিও শুনতে পেলেন—শুশ্রাব জপতাং তত্র মন্ত্রান্ রক্ষোগৃহেষু বৈ। স্বাধ্যায়-নিরতাংশ্চৈব যাতুধানান দদর্শ সঃ। হনুমান যেমন খারাপ চেহারার রাক্ষস দেখেছেন, তেমনি আবার সুন্দর সুন্দর রাক্ষসও দেখেছেন বুদ্ধিদীপ্ত চারুভাষী রাক্ষসও দেখেছেন—ননন্দ দৃষ্টবা চ স তান্ সুরূপান্, নানাগুণান্ আত্মগুণানুরূপান্। কিন্তু হনুমানের সবচেয়ে ভাল লাগল লঙ্কা-সুন্দরীদের দেখে। বানর-রাজ্যে বালিপত্নী তারার চেয়ে বেশি সুন্দরী হনুমান দেখেননি, তেমন মনস্বিনী বুদ্ধিমতীও দেখেননি। কিন্তু লঙ্কার সব সুন্দরীদের বালিপত্নী তারার মতই লাগল হনুমানের—তেষাং স্ত্রিয়স্তত্র মহানুভাবা, দদর্শ তারা ইব সুস্বভাবাঃ। এর পরে রাবণের অন্তঃপুরের যে মনোগ্রাহী বর্ণনা বাল্মীকি দিয়েছেন, তা শত রসশাস্ত্রের সাগর-ছেঁচা ধন, অযোধ্যা, কিষ্কিন্ধ্যার সৌন্দর্য সেখানে ম্লান হয়ে গেছে। তা এতই নিপুণ, এতই স্নিগ্ধ আবার এতই প্রকট যে হনুমান ছাড়া আর কেউ দেখলে বিব্রত বোধ করবে। রাবণের স্ত্রীরত্নগুলি দেখে হনুমান মন্তব্য করেছে যে, একমাত্র সীতা ছাড়া আর সব মহিলাই রাবণের গুণে কিংবা বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আপনি এসে রাবণের বাহুর ডোরে ধরা দিয়েছে, কাউকে হরণ করে আনতে হয়নি—ন তত্র কাশ্চিৎ প্রমদা প্রসহ্য, বীর্যোপপন্নেন গুণেন লব্ধা। এঁদের মধ্যে দৈত্য, রাক্ষস কিংবা গন্ধর্বদের মেয়েরা তো আছেনই, রাজা, ঋষি এবং ব্রাহ্মণের মেয়েরাও আছেন—রাজর্ষি-বিপ্র-দৈত্যানাং গন্ধর্বানাঞ্চ যোষিতঃ। সে যুগে রাজা, ব্রাহ্মণ এমন কি ঋষিকন্যারাও যাঁকে মোহবশত স্বেচ্ছায় স্বামিত্বে বরণ করেছে, সে লোকটিকে শুধু রাক্ষস বললেই হল! সবচেয়ে বড় কথা রাবণের প্রধানা পত্নী মন্দোদরীর রূপ দেখে হনুমান ভেবেছিলেন যে তিনিই সীতা। মন্দোদরী সীতার চেয়ে কোনও অংশে কম সুন্দরী ছিলেন না; তাঁর হাব-ভাব, রূপ এবং আভিজাত্য দেখে হনুমানের মনে হল, এই সীতা—তর্কয়ামাস সীতেতি রূপ-যৌবনসম্পদা। মুহূর্তের জন্য কপিবর একেবারে আত্মবিস্মৃত হলেন। আবিষ্কারের আনন্দে, অকারণে লাফিয়ে লাফিয়ে নিজের লেজেই চুমু খেতে লাগলেন। মুহূর্তেই হনুমানের ভুল ভাঙল, তিনি ভাবলেন—সীতা কি রাম-বিহনে সেজেগুজে মদ খেয়ে রাবণের পাশে শুয়ে থাকবেন—ন ভোক্তুং নাপ্যলংকর্তুং ন পানমুপসেবিতুম্।

কিন্তু এ তো একটা ধারণামাত্র। একটা আরোপিত আদর্শবোধ। সীতাও তো

মদ খেতেন। তবে হয়তো রাম-বিহনে খেতেন না, যেমন রাম খেতেন না সীতা-বিহনে। কিন্তু 'রাজর্ষি বিপ্র'দের অভিজাত কন্যারাই যেখানে স্বেচ্ছায় রাবণের কণ্ঠলগ্না হতেন সেখানে সীতার পক্ষেও এই ব্যবহার আশ্চর্য ছিল না। আসলে বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা মহিলাদের মধ্যে অনেকেরই রাবণের ব্যাপারে মোহ থাকলেও, সীতার যে সে মোহ ছিল না, বা সে মোহ যে কোনওদিন হয়ওনি—এইটে দেখানোই তো বাল্মীকি-মহাকাব্যের অভিপ্রায় এবং মহাকাব্য বিস্তারের সম্বলও বটে। কিন্তু তবু বলব হনুমানের যুক্তিটা বাল্মীকির মতই জোলো, বরঞ্চ তাঁর পূর্বতন শঙ্কাটি ছিল ঠিক। হনুমান ভেবেছিলেন যে, রামের স্ত্রী যদি এই হাজারো স্ত্রীলোকের মত রাবণ কর্তৃক উপভুক্তা হয়েই থাকেন—যদি ঈদৃশী রাঘবধর্মপত্নী, তবে অবশ্য রাবণের পক্ষেই মঙ্গল—সুজাতমস্যেতি হি সাধুবুদ্ধেঃ, কেন না আমার মুখে শুধু এই খবরটি শুনলেই রাম আর যুদ্ধ করতে আসবেন না। বাল্মীকির কাব্য আর তা হলে মহাকাব্য হত না, লঘুকাব্যের নটেগাছেই মুড়িয়ে যেত। আপাতত অবশ্য মহাকাব্যের সম্প্রসারণ নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। আমাদের বক্তব্য রাবণ রাক্ষস হয়ে গেছেন শুধু তাঁর আপন স্বভাবে ; মদ মাংস এবং স্ত্রীলোকের ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত দুর্বলতাই রাবণকে রাক্ষস বানিয়েছে। রাবণ বলেছিলেন—এ আমাদের ধর্ম—'স্বধর্মো রক্ষসাং ভীরু', জোর করে পরস্ত্রীগমনে কি হরণে আমাদের রাক্ষসজাতির কোন দোষ নেই—গমনং বা পরস্ত্রীনাং হরণং সংপ্রমথ্য বা। আমরা জানি, রাক্ষস-বিবাহেও তো কন্যাহরণ অনুমোদিত। কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই যে মাত্রাজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, এই মাত্রাটা মন্দোদরীর কপালদোষে এবং রাক্ষসজাতির স্বভাবদোষে রাবণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই মাত্রাই ছিল আর্যসমাজের সঙ্গে রাক্ষসদের পার্থক্যরেখা, নইলে তাঁরা শুধুই রাক্ষস নন।

আসলে সীতার-ব্যাপারে রাবণের রোখ চেপে গেছিল। রাবণ নিজে এতটাই বড় ছিলেন যে, কোন স্ত্রীলোক তাঁকে 'না' বলবে, এ তিনি ভাবতেই পারতেন না। সীতার ব্যাপারে রাবণের কামনা-বাসনা যতখানি ছিল, তার চেয়েও বেশি ঘা খেয়েছে তাঁর অহংবোধ। নইলে মন্দোদরী ঠিক কথাই বলেছিলেন। অপরূপা সম্পূর্ণ আত্মসচেতন এই মহিলা রাবণ মারা যাবার পর বলেছিলেন—সীতার চেয়ে হাজার গুণে সুন্দরী মহিলা তো তোমার অন্তঃপুরেই ছিল কিন্তু সীতার মোহবশে সে কথা তুমি বুঝলে না—সন্ত্যন্যাঃ প্রমদাস্তুভ্যং রূপেনাভ্যধিকাস্ততঃ। অনঙ্গবশমাপন্ন স্তং তু মোহান্ন বুধ্যসে। আর মৈথেলী সীতা ! রূপে, আভিজাত্যে

দয়া-দাক্ষিণ্য কিংবা কোনও গুণে, সে আমার চেয়ে বড় হওয়া দূরে থাকুক আমার ধারে কাছেও আসতে পারবে না—ন কুলেন ন রূপেন ন দাক্ষিণ্যেন মৈথেলী। ময়াধিকা বা তুল্যা বা তত্তু মোহান্ন বুধ্যসে ॥ কথাটা মন্দোদরী মিথ্যে বলেননি, সীতার চেয়ে রূপে-গুণে হয়তো তিনি বেশিই ছিলেন, কিন্তু মোহবশে নয়, রাবণ তা বুঝতে পারেননি আপন অহংবোধে। অতএব রাম এবং তাঁর বানরবাহিনী যে সময়ে সমুদ্রের পরপারে সমুদ্র লঙ্ঘনের চিন্তায় ব্যস্ত, সেই সময় রাবণ তাঁর মন্ত্রী এবং অমাত্যদের নিয়ে একটি বিশেষ সভা ডাকলেন। ভাগ্যবশত সেদিনটি ছিল রাবণের অপরাজেয় ভাই কুম্ভকর্ণের জেগে থাকার দিন। সভায় তিনিও উপস্থিত। সবার সামনে রাবণ মুক্তকণ্ঠে বললেন—দেখ, রামের প্রিয়া মহিষী সীতাকে আমি দণ্ডকারণ্য থেকে ধরে এনেছি। অনেক দিন হয়ে গেল, তাকে বশ করবারও চেষ্টা নিয়েছি অনেক। কিন্তু এ পর্যন্ত সে কিছুতেই আমার সঙ্গে বিছানায় শুতে চাইছে না—সা মে ন শয্যামারোঢুম্ ইচ্ছত্যলসগামিনী। তোমরা আলোচনা করে দেখ, কিভাবে সীতাকেও ফিরিয়ে দিতে না হয়, এবং দশরথের ছেলে দুটোকেও মেরে ফেলা যায়—অদেয়া চ যথা সীতা বধ্যৌ দশরথাত্মজৌ।

'অলসগামিনী' সীতা রাবণের শয্যায় ওঠার ব্যাপারেও কেন 'অলসগামিনী', সে তর্কের মধ্যে যতটুকু কামনা আছে তার চেয়েও বেশি আছে অহংবোধ। এই কামনা এবং অহংবোধ-এর কোনওটাই অনুমোদন করলেন না মহামতি কুম্ভকর্ণ। তিনি বললেন—সীতাকে অন্যায়ভাবে হরণ করার সময় তো তুমি আমাদের কারও সঙ্গে মন্ত্রণা করনি, কাজেই তুমি একা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ, তার ফলাফল নিয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছ, তাতে কোনও লাভ নেই। সীতাকে ছলে-বলে হরণ করে তুমি খুবই অন্যায় করেছ। রাম যে তখুনি তোমাকে জানেপ্রাণে মারেনি, এই তোমার ভাগ্য—দিষ্ট্যা ত্বাং নাবধীদ্ রামো বিষমিশ্রমিবামিষম্। তবে হ্যাঁ, যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে তুমি আমার সাহায্য চাও, সে আমি করব। রাম, লক্ষ্মণ এবং বানরদের আমি একে একে গিলে খেয়ে ফেলব। তুমি মজাসে থাক, ভাল-মন্দ মদ খাও—রমস্ব কামং পিব চাগ্র্যবারুণীং, যুদ্ধের ব্যাপারে তুমি কোনও চিন্তা কোর না। কুম্ভকর্ণ যতই সাহস দিন, তাঁর পূর্ব কথাগুলি শুনে রাবণ যে মর্মাহত হবেন সে কথা রাবণের মোসাহেব মন্ত্রীরা বুঝেছিল। সেনাপতি মহাপার্শ্ব তাই মোসাহেবির সুরেই বললেন—সীতাকে ছিনিয়ে এনে আপনি বেশ করেছেন। ঘোর অরণ্যে ঢুকে মধু পেয়েও মধু খাব না—এ আবার কি মূর্খামি—ন পিবেৎ মধু সংপ্রাপ্য স-নরো বালিশো ভবেৎ। শত্রুর মুখে লাথি মেরে আপনি নিশ্চিন্তে সীতাকে ভোগ করুন।

সীতা যদি স্বেচ্ছায় ধরা না দেয়, বাধা দেয়, তা হলে মোরগের মত মাঝে মাঝে বল প্রয়োগ করে তাকে ভোগ করুন—আক্রম্যাক্রম্য সীতাং বৈ তাং ভুঙ্ক্ষ্ব চ রমস্ব চ।

কথাগুলি রাবণের বেশ পছন্দ হল কিন্তু বিভীষণের সতীমার্কা বক্তৃতায় ইন্দ্রজিৎ এবং রাবণ দু'জনেই খেপে গেলেন। রাবণ বললেন—জ্ঞাতির বিপদ হলে জ্ঞাতিরা খুশি হয়—হৃষ্যন্তি ব্যসনেষ্বেতে জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃ সদা। বরং শত্রু এবং সাপের সঙ্গেও আমি ঘর করব কিন্তু নামেমাত্র বন্ধু এই শত্রুসেবী বিভীষণের সঙ্গে থাকব না—ন তু মিত্রপ্রবাদেন সংবসেৎ শত্রুসেবিনা। রাবণ বিনা কারণে সর্বসমক্ষে অপমানজনকভাবে বিভীষণকে ভর্ৎসনা করায় বিভীষণ চারজন বন্ধুর সঙ্গে রাবণের রাজসভা ছেড়ে আকাশপথে বেরিয়ে এসে রামের সঙ্গে যোগ দিলেন। বাল্মীকি রামায়ণে বিভীষণকে রাবণের পদাঘাতে সভার মধ্যে শুইয়ে ফেলা হয়নি, খড়্গ হাতে রাবণ তাঁকে মেরে ফেলতেও ওঠেননি অথচ এসব ঘটনাই কৃত্তিবাসে আছে, রঙ্গনাথেও আছে। এই দুই জায়গাতেই অপমানিত বিভীষণ মাতা কৈকসীর কাছে গেছেন, রামের কাছে যাবার অনুমতিও লাভ করেছেন তাঁরই কাছ থেকে। কৃত্তিবাস আবার এই সুযোগে বিভীষণকে নিয়ে গেছেন কৈলাস পর্বতের অধিবাসী বড়দাদা কুবেরের কাছে। সেখানে কুবের এবং শিবের কাছে রামপক্ষে যোগ দেওয়ার সুপারিশ পেয়েই বিভীষণ এসেছেন রামের কাছে। কৃত্তিবাস বলেছেন, রাম বরঞ্চ নিজের অপমান সহ্য করবেন কিন্তু ভক্ত বিভীষণের অপমান তিনি সহ্য করবেন না। কৃত্তিবাসের শিব বিভীষণকে বলেছেন—রামের পক্ষে যোগ দিলে, বিভীষণের ঘরভেদী ভূমিকা নিয়ে কেউই সমালোচনা করতে পারবে না কারণ বিভীষণ তো আর রাজ্যের জন্য রামের পক্ষে যোগ দিচ্ছেন না—'যেহেতু রাজ্যের আশা নাহিক তোমার'।

কিন্তু আদিকবি বাল্মীকির এ ব্যাপারে কিছু বক্তব্য আছে। শত্রুপক্ষীয় বিভীষণকে যখন সুগ্রীব, জাম্ববান সবাই সন্দেহ করতে আরম্ভ করল, তখন সকলের যুক্তি খণ্ডন-মণ্ডন করে একেবারে শেষে হনুমান বললেন—বিভীষণ বুদ্ধিমান মানুষ। রাম বালি বধ করে সুগ্রীবকে রাজা করেছেন বলেই বিভীষণও ভেবেছেন রাবণ মারা গেলে বিভীষণকে রাজা করা হবে—এবং এই আশাতেই বিভীষণ রামের কাছে আশ্রয় নিতে এসেছেন—বালিনং তু হতং শ্রুত্বা সুগ্রীবঞ্চাভিষেতিম্। রাজ্যং প্রার্থয়মানস্তু বুদ্ধিপূর্বমিহাগতঃ ॥ রামও কিন্তু সবার সাবধানবাণী শুনেও প্রকারান্তরে হনুমানকেই অনুমোদন করেই বললেন যে, বিভীষণ জ্ঞাতিভেদ সৃষ্টি করে রাজ্যলাভের আশাতেই তাঁর কাছে

এসেছেন—'রাজ্যাকাঙ্ক্ষী চ রাক্ষসঃ' । রাম বললেন, যত দিন রাজ্যপ্রাপ্তির আশা না থাকে তত দিন ভাইয়েরা সব একসঙ্গে সন্তুষ্টচিত্তেই দিন কাটায়, কিন্তু কোনও কারণে রাজ্যভোগের ইচ্ছা হলেই একের থেকে অন্যের ভয় আসে। বিভীষণ সেই কারণেই রাবণকে ছেড়ে আমাদের কাছে এসেছেন—ইতি ভেদং গমিষ্যন্তি তস্মাৎ প্রাপ্তো বিভীষণঃ।

সবার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও রাম বিভীষণকে আশ্রয় দিলেন এবং প্রথম আলাপেই বিভীষণ রামকে বললেন—আমি অপমানিত হয়ে ধন, জন, বন্ধু-বান্ধব এমন কি লঙ্কা ত্যাগ করে আপনার শরণ নিয়েছি। এখন আমার রাজ্যলাভ, জীবন এবং সুখ সবই আপনার ওপর—ভবদ্গতং হি মে রাজ্যং জীবিতঞ্চ সুখানি চ। পাঠক লক্ষ করবেন, প্রথমেই এখানে রাজ্যলাভের প্রসঙ্গ। রামের কাছে বিভীষণের প্রথম টোপ ছিল—আমি আপনার সৈন্যের মধ্যে থেকে, যখন যেমন দরকার সেইভাবে রাক্ষসদের বধে সাহায্য করব, সাহায্য করব লঙ্কার অধিকারে—রাক্ষসানাং বধে সাহ্যং লঙ্কায়াশ্চ প্রধর্ষণে। এইবারে রামের রাজনৈতিক বুদ্ধি লক্ষ করুন, তিনি বিভীষণের টোপ গিললেন এবং এই কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্র সেই উন্মুক্ত সমুদ্রতীরেই বিভীষণের রাজ্যাভিষেকের নির্দেশ দিলেন, বললেন—সমুদ্রাৎ জলম্ আনয়। অভিষেক হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে, যাতে বিভীষণ বিশ্বাস করেন যে, রাবণের সিংহাসনে বিভীষণকে বসাতে রামচন্দ্রের কোনও দ্বিধা নেই। তবে হ্যাঁ, রাক্ষসবধ এবং লঙ্কাজয়ে তাঁকে নির্লজ্জভাবে সাহায্য করতে হয়েছিল। দুর্জয় রাক্ষসবধের অন্ধি-সন্ধি ঘরের গোপন খবর সবই তিনি সময়ে সময়ে রামচন্দ্রকে জানিয়েছেন ; তাতে তাঁর আপন ঘরের লোকেরা তাঁকে সামনাসামনি দুর্নামের ভাগী করেছে। কিন্তু তাই বলে রাজা হওয়ার ব্যাপারে তাঁর অভিলাষ যে কমে গেছে তা মনে হয় না। রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই যখন ইন্দ্রজিতের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছেন, তখন বিভীষণ কেঁদে উঠে বলেন, যাদের ওপর ভরসা করে, যাদের ক্ষমতার জোরে আমি লঙ্কার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হব ভেবেছিলাম,—যয়োর্বীর্যমুপাশ্রিত্য প্রতিষ্ঠা কাঙ্ক্ষিতা ময়া—তারাই এখন যুদ্ধভূমিতে ঘুমিয়ে পড়েছে যেন। বিভীষণের এই আকুল আর্তিতে যিনি প্রথম সাড়া দিলেন তিনি রাজ্যলাভের মর্ম বোঝেন, তিনি সুগ্রীব। তিনি তাঁর আপন অভিজ্ঞতায় বিভীষণকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—তুমি ঠিকই রাজ্য পাবে দেখো, লঙ্কায় রাজা হবে তুমিই—রাজ্যং প্রাপ্স্যসি ধর্মজ্ঞ লঙ্কায়াং নেহ সংশয়ঃ। বিভীষণ অবশ্য সারা লঙ্কাকাণ্ড জুড়ে যেরকম বিনীতভাবে, যেরকম অনুবর্তিতায় রামকে

সাহায্য করেছেন তাতে পরবর্তী রামায়ণকারেরা তাঁকে ভক্তভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন সর্বত্র। কিন্তু বাল্মীকির চোখে তিনি যেমন রামের বশংবদ আবার তেমনি ঘরভেদীও বটে। বিভীষণের দিক থেকে রাবণকে ত্যাগ করার পেছনে যে যুক্তিগুলি ছিল, যা পরবর্তী রামায়ণকারদের অবলম্বনও বটে, সেগুলি বিশুদ্ধ ধর্মবোধে পরিব্যাপ্ত হলেও বিভীষণের গৃহভেদী ভূমিকার অপযশ ঘোচাতে পারেনি।

সম্পূর্ণ লঙ্কাকাণ্ডে বাল্মীকির রামচন্দ্র খুব একটা বিপদে কিছু পড়েননি। তাঁর আধিপত্য এবং প্রভাব এত গভীর ছিল যে রাবণ কিছুতেই আপনা থেকে রামকে আক্রমণ করছিলেন না। শেষে অঙ্গদকে দূত করে পাঠিয়ে রাবণকে খুব খানিকটা গালাগালি বর্ষণ করে তাঁর যুদ্ধোন্মাদনা উসকে দিতে হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে অঙ্গদের দৌত্যে কোনও বাড়াবাড়ি নেই। তবে সমস্ত প্রাদেশিক কবিরাই অঙ্গদের দূতকর্মের সুযোগে নিজেদের কবিত্ব প্রকাশ করেছেন, সে কবিত্ব তুলসীদাসেও চমৎকার, কৃত্তিবাসেও তেমনি। কৃত্তিবাসে 'অঙ্গদের রায়বার' অংশটি পাঁচালীকারদের প্রক্ষেপ বলে অনেকে মনে করেন, কেউ বলেন তা কবিচন্দ্রের রামায়ণের ধারায় লেখা। এই অংশটি গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট হলেও অসাধারণ। রাবণের সভায় আসন না পেয়ে লেজের 'কুশন' বানিয়ে অঙ্গদের আত্মসম্মান বাঁচানোর আভাসমাত্রও বাল্মীকি রামায়ণে নেই, যেমনটি নেই রাবণের মুকুট ছিনিয়ে নিয়ে আসার কাহিনী, যা কৃত্তিবাসে আছে।

অঙ্গদের দৌত্যকর্মের পরেই বাল্মীকি রামায়ণে দু'পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। রাবণের কয়েকজন পুত্র-সেনাপতি মারা যাবার পর রামের প্রথম বিপদ এল ইন্দ্রজিতের নাগপাশে। বাল্মীকিতে রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে নারদ, ব্রহ্মা, পবন এবং হনুমান কাউকে কোনও কষ্ট করতে হয়নি। জটায়ু-সম্পাতি যেমন রামের হিতকার্য সাধন করেছিল, তেমনি গরুড় নাগপাশের বৃত্তান্ত শুনেই সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে এসে নাগপাশ মুক্ত করে বন্ধুকার্য করে গেছেন—ইমং শ্রুত্বা তু বৃত্তান্তং ত্বরমাণোহমাগতঃ। সহসৈবাবয়োঃ স্নেহাৎ সখিত্বম্ অনুপালয়ন্। রঙ্গনাথন রামায়ণে নারদ এসে রামকে তাঁর আপন বিষ্ণু-স্বরূপ স্মরণ করে গরুড়কে আহ্বান করার নির্দেশ দেন, তাতেই নাগপাশ থেকে মুক্তি আসে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে পবনে আর রামে কানাকানি কথা হয়েছে এবং গরুড় এসে নাগপাশ মুক্ত করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর আবদারে রামকে ধনুক ছেড়ে বাঁশি হাতে নিতে হয়েছে। ভক্তপ্রাণের টানে গরুড়ের পাখার আড়ালে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ঠামে, মোহন-বাঁশি হাতে দাঁড়াতেও হয়েছে। উপায় কি, এইসব

রামায়ণগুলিতে রাম যে অবতার হয়ে গেছেন এবং অবতার হলে ভক্তের জন্যে এসব ল্যাঠা পোয়াতেই হয়।

রঙ্গনাথী কিংবা কম্ব রামায়ণে কুম্ভকর্ণের চরিত্রটি আঁকা হয়েছে কবিহৃদয়ের সমস্ত আকুতি দিয়ে। একদিকে সে যেমন রাজা রাবণের আদেশ মান্য করে যুদ্ধে প্রাণ দিতে আসে অন্যদিকে ছোটভাই বিভীষণকে সে আকুল পরামর্শ দেয় রামচন্দ্রকে জীবনের আশ্রয় করে নিতে। নীতিগত প্রশ্নে বাল্মীকি রামায়ণে পরস্ত্রীর প্রতি রাবণের মোহকে সে যথোচিত নিন্দা করেছে, অন্যদিকে রাজা রাবণকে সে অস্বীকার করে না তাঁরই আদেশ মেনে সে যুদ্ধে এসেছে। বাল্মীকি রামায়ণের এই সামান্য পটভূমিকাই কম্ব রামায়ণে রাবণ-কুম্ভকর্ণ এবং কুম্ভকর্ণ-বিভীষণের সংলাপে চরম নাটকীয়তার রূপ নিয়েছে। তবে কুম্ভকর্ণকে তাঁর মহানিদ্রা থেকে জাগানোর জন্য সমস্ত কবিই অপূর্ব রসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কোনও কিছুই যখন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ করতে পারল না, তখন আমাদের কৃত্তিবাস বাঙালির খাদ্যমন্ত্র উচ্চারণ করে আদেশ দিয়েছেন—'মদিরা মাংসের দেহ খুলিয়া ঢাকনি'। মনোহর সেই খাদ্যগন্ধেই কুম্ভকর্ণের ঘুম ভেঙেছে। বাল্মীকিতে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙার কাহিনীতে শুদ্ধ হাস্যরস মিশে গেছে কুম্ভকর্ণের আতঙ্কের সঙ্গে। হাজারো হাতি যখন কুম্ভকর্ণের শরীর দলাই-মলাই করতে থাকল, তখন সেই সুখস্পর্শে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙল বাল্মীকি রামায়ণে—কুম্ভকর্ণস্তদা প্রাপ্য স্পর্শং পরমবুধ্যত।

অবশ্য কাঁচা ঘুম ভাঙা, মদ-মাংসে মাতাল কুম্ভকর্ণের বিশাল বপু থেকে রামের কোনও বিপদ আসেনি। আসলে কুম্ভকর্ণের চেহারাটাই ছিল উৎকট, বিখ্যাত বানর বীরেরাও তাকে দেখে পালিয়ে যাচ্ছিল। রাম বললেন, কুম্ভকর্ণকে দেখেই বানরদের এই অবস্থা, যুদ্ধ লাগলে কি হবে—কথমেনং রণে ক্রুদ্ধং বারয়িষ্যন্তি বানরাঃ। বিভীষণ নির্দেশ দিলেন—সেনাপতি নীল যেন বানরদের মধ্যে প্রচার করে দেন যে, এই কুম্ভকর্ণ আসলে হল একটা দৈত্যাকার 'রোবট'—যন্ত্রমেতৎ সমুচ্ছ্রিতম্। কিন্তু এ নির্দেশ জারি করার আগেই রণক্ষেত্রে কুম্ভকর্ণ এসে গেছেন এবং তাঁকে দেখে প্রথম যে পালানো শুরু করল সে হল সেনাপতি নীল। সাহসী অঙ্গদ তখন ঘোষণা করল যে, এটা যুদ্ধ করতে আসেনি, এটা হল রাবণের বিভীষিকা-যন্ত্র—নায়ং যুদ্ধায় বৈ রক্ষো মহতীয়ং বিভীষিকা। কিন্তু এই যন্ত্র-রাক্ষসের প্রতাপ বুঝতে কারোরই দেরি হয়নি, যদিও রামের পক্ষে বিরাট অনিষ্ট কিছু হয়নি। অনিষ্ট ঘটল আবার ইন্দ্রজিতের হাতেই। কুম্ভকর্ণ এবং আর চার-পাঁচজন রাক্ষস সেনাপতি মারা যেতেই ইন্দ্রজিৎ আবার এসে সমস্ত

প্রধান বানরদের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণকেও রণক্ষেত্রে শুইয়ে রেখে গেলেন। একমাত্র সুস্থ ছিলেন হনুমান আর বিভীষণ। দু'জনে রাতের অন্ধকারে মশাল জ্বালিয়ে মৃত, অর্ধমৃত মুখ্য সেনানীদের খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন—উল্কাহস্তৌ তদা রাত্রৌ রণশীর্ষে বিচেরতুঃ। বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে যখন প্রায় নিহত জাম্ববানকে পাওয়া গেল, তখন তিনিই হনুমানকে বললেন, হিমালয়ের কৈলাস-শিখর থেকে মৃতসঞ্জীবনী নিয়ে আসতে। হনুমান পাহাড় উপড়ে নিয়ে এলেন। মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী—ইত্যাদি চার রকমের ওষুধের গন্ধে সবাই বেঁচে উঠল। মজা হল, হনুমানকে ওষুধ আনতে দু'বার হিমালয়ে যেতে হয়েছিল, একবার তো এই জাম্ববানের কথায় আরেকবার যখন খোদ ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর রাবণ লক্ষ্মণকে শক্তিশেল মেরে গেলেন। বানরদের বৈদ্য ছিলেন সুষেণ, যাকে গোস্বামী তুলসীদাসের কল্যাণে আজকাল আমরা রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহচিকিৎসক বলে মনে করি। হনুমান যখন পাহাড়-পর্বত উপড়াতে পারেন তখন ক্ষুদ্ররূপে লঙ্কায় গিয়ে রাবণের গৃহবৈদ্যকে গৃহসমেত তুলে আনা, এ আর এমন কি কঠিন কাজ। অতএব তুলসী লিখলেন—জামবন্ত কহ বৈদ সুষেনা। লঙ্কা রহ কোই পঠইয় লেনা। ধরি লঘু রূপ গয়উ হনুমন্ত। আনেউ ভবন-সমেত তুরন্তা। কিন্তু বাল্মীকিতে, সুষেণ হলেন বানররাজ বালি এবং সুগ্রীবের শ্বশুর, তারা এবং রুমা দু'জনেই তাঁর কন্যা। ধন্বন্তরির মত তাঁর চিকিৎসা-প্রতিভা, এবং প্রথম থেকেই তিনি বানরদলের সঙ্গে কিষ্কিন্ধ্যা থেকে এসেছেন, ঠিক যেমনটি সেনাদলের সঙ্গে চিকিৎসক থাকে সেইভাবেই। বানর-বৈদ্য সুষেণ হনুমানকে জাম্ববানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—কৈলাস-শিখর থেকে আবার সেই ওষুধগুলিই নিয়ে এস—পূর্বন্তু কথিতো যোহসৌ বীর জাম্ববতা তব। দক্ষিণে শিখরে জাতাং মহৌষধিমিহানয় ॥ হনুমান আবার পাহাড় উপড়ে নিয়ে এলেন, বানর-বৈদ্যের চিকিৎসায় লক্ষ্মণ আবার বেঁচে উঠলেন।

দোষের মধ্যে বাল্মীকি বলেছিলেন, পাহাড়-চূড়োয় ওষুধ চিনতে না পেরে হনুমান ভাবলেন—দেরি করলে মহাবিপদ হয়ে যেতে পারে, লক্ষ্মণ মারা যেতে পারেন—কালাত্যয়েন দোষঃ স্যাদ্ বৈক্লব্যঞ্চ মহদ্ ভবেৎ—অতএব পাহাড়-চুড়োটাই উপড়ে নিয়ে যাওয়া ভাল—গৃহীত্বা হরি-শার্দূলঃ হস্তাভ্যাং সমতোলয়ৎ। কিন্তু এই 'কালাত্যয়ের দোষ', মানে দেরি করলে লক্ষ্মণের বিপদ হবে—এই সূত্র ধরেই পরবর্তী রামায়ণকারেরা বহুতর 'সাসপেন্‌স্' তৈরি করেছেন ; বিশেষত উৎকণ্ঠার পর উৎকণ্ঠা তৈরি করে যদি শেষ পর্যন্ত প্রায় মৃতরোগীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়, তাহলে কাহিনীতে

নাটকীয়তা আসে আরও বেশি। অতএব কৃত্তিবাস পরের দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত লক্ষ্মণের জীবন-সময় বেঁধে দিয়েছেন, গন্ধমাদন পর্বতের কাছের সরোবরে কুমিরের রূপ-ধরা গন্ধকালীকে স্থাপন করেছেন হনুমানের পায়ে কামড় দেওয়ার জন্য, কালনেমিকে পাঠিয়েছেন তপস্বী-বেশে হনুমানকে প্রবঞ্চনা করে তাঁর সময় নষ্ট করার জন্য, অযোধ্যায় ভরতের হাত দিয়ে আশি লক্ষ মণের খেলার 'বাঁটুল' মেরে হনুমানকে অজ্ঞান করে দিয়েছেন, এমনকি আর একটু হলে সূর্যকেও উঠিয়ে দিচ্ছিলেন কৃত্তিবাস, নেহাত হনুমান তাকে বগলদাবা করে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন বলে শেষ রক্ষে হয়েছে।

অবশ্য আমরা শুধু কৃত্তিবাসের কবিত্ব-বিস্তারে মুগ্ধ হচ্ছি কেন, 'কীলাত্যয়' দোষের সুযোগ নিয়ে একই রকমভাবে রঙ্গনাথ এবং তুলসীদাসও কালনেমি, কুমির (রঙ্গনাতে ধন্যমালিনী, তুলসীদাসে অপ্সরা) এবং ভরতের প্রসঙ্গে বিলম্বিত করেছেন হনুমানের অমূল্য সময়। বাল্মীকি রামায়ণে এসব কিছুই নেই। বাল্মীকিতে ইন্দ্রজিৎ বধের সূত্র ধরেই রাবণের শক্তিশেল নিক্ষেপ এবং হনুমৎ-প্রসাদে লক্ষ্মণ খুব তাড়াতাড়ি রোগমুক্ত হওয়ায়, সঙ্গে সঙ্গে রাম-রাবণের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। আসলে বাল্মীকি যে রসের কবি, তাতে বেশি অলৌকিকতারমধ্যে কবিত্ব ফলাতে তিনি ভালোবাসেন না। ভক্তি জিনিসটাও বোধহয় তাঁর হৃদয়ে কম ছিল। সমুদ্রের ওপর অলৌকিক সেতু-টেতু বেঁধেই বোধহয় তাঁর সংকোচ হয়েছিল মনে, কাজেই কোন বীরচূড়ামণি বীরবাহু বা তরণীসেনের কাটা মুণ্ডু দিয়ে তিনি রাম-নাম নিষ্কাশন করতে পারেননি। সীতাকে পাতালে পাঠিয়ে যিনি করুণরসের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন, তিনিও পাতালে কোন অহিরাবণ-মহীরাবণের সন্ধান পাননি রাম-লক্ষ্মণের মরণ-ফাঁদ তৈরি করতে। এমনকি এই যে রাম-রাবণের যুদ্ধ, সেটা বাল্মীকি রাম-রাবণের যুদ্ধের মত করেই দেখিয়েছেন, যার জন্য কবিরা লিখেছেন রাম-রাবণের যুদ্ধ রাম-রাবণের যুদ্ধের মতই—রামরাবণয়ো যুদ্ধং রাম-রাবণয়োরিব। যুদ্ধটা বড়োই সোজাসুজি হয়েছে। শুধু 'আদিত্যহৃদয়' মন্ত্র জপ করা ছাড়া ক্ষত্রিয়বীর রামচন্দ্রের আর কিছুই পূজা-উপচার ছিল না। অথচ কৃত্তিবাসে রাবণবধের জন্য রামচন্দ্রকে দুর্গাপূজার অকালবোধন করতে হয়েছে। কালিকাপুরাণের ঘটনা সাজিয়ে কৃত্তিবাসের রামচন্দ্রকে দিয়ে চণ্ডীপাঠ থেকে আরম্ভ করে বন্য ফলের নৈবেদ্য—সব সাজাতে হয়েছে। এর ওপরে আছে একশ আটটি নীলপদ্ম সংগ্রহের যন্ত্রণা। তা এসব যন্ত্রণা যথারীতি হনুমানই পোহান, কিন্তু শেষে একখানি নীলপদ্ম হারিয়ে যে চরম করুণ রসের সঞ্চার হয়েছিল বাঙালির মনে,

সে খবর বাল্মীকি একটুও রাখতেন না। আর একটা কথা, কৃত্তিবাসে হনুমানের কাজ এবং দায়িত্বও বড়ো বেশি যেন। বাল্মীকি তাঁকে দিয়ে সাগর লঙ্ঘন কিংবা পর্বত উৎপাটন পর্যন্ত করিয়েছেন, কিন্তু কৃত্তিবাস ! হেন অসম্ভব কাজ নেই যা তিনি হনুমানকে দিয়ে করাননি। রাবণবধের জন্যও তাকে একবার মাছির রূপ ধরে রাবণের ঘরে গিয়ে চণ্ডী-মাহাত্ম্যের শ্লোক চেটে মুছে দিতে হয়, আবার জ্যোতিষীর রূপ ধরে মন্দোদরীকে ভুলিয়ে তাঁরই সাহায্যে রাবণের গোপন মৃত্যুবাণ জোগাড় করে আনতে হয়। কিন্তু বাল্মীকি হনুমানকে এত ক্ষমতা দেননি।

বাল্মীকিতে রাবণ রামের শত্রু এবং সে মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সঙ্গে রামের শত্রুতা শেষ হয়ে গেছে—মরণান্তানি বৈরাণি নির্বৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্। সঙ্গে সঙ্গেই রাবণের শ্রাদ্ধকৃত্য করার জন্য আদেশ দিয়েছেন রামচন্দ্র। কিন্তু তুলসীদাসে অন্যান্য বিষ্ণুভক্তের সঙ্গে সমতা রক্ষার জন্য রাবণের প্রাণজ্যোতি প্রবেশ করেছে রামচন্দ্রের মুখে—'তাসু তেজ সমান প্রভু আনন', আর কৃত্তিবাসে তো রামচন্দ্র প্রিয়শিষ্যের মত রাবণের কাছে বসে রাজনীতির উপদেশ শুনেছেন। বাল্মীকি রামায়ণে এসব কিছুই নেই।

বাল্মীকি রামায়ণে রাবণের মৃত্যুর পর সমস্ত মুখ্য চরিত্রগুলির মধ্যে অদ্ভুত এক পরিবর্তন এসেছে। এঁদের মধ্যে প্রথম হলেন বিভীষণ। রাবণের মৃত্যুর পর তাঁর অসাধারণ গুণগুলি স্মরণ করে বিভীষণ বেশ খানিকটা ভেউ-ভেউ করে কেঁদে নিলেন—শোকবেগপরীতাত্মা বিললাপ বিভীষণঃ। খুব খানিকটা কেঁদে-কেটে তিনি রামকে বললেন—এখন আপনি আদেশ দিলেই আমি এই মহাত্মার প্রেতকার্য করতে পারি। এরপর যখন রাবণের পুরনারীরা এবং মন্দোদরী রাবণের জন্য হৃদয়ের অবরুদ্ধ আবেগ মুক্ত করে দিলেন, তখন রাম যেন আর সে বিলাপ সহ্যই করতে পারছিলেন না। তিনি বিভীষণকে বললেন—রাবণের স্ত্রীদের আপনি সান্ত্বনা দিন, ভাইয়ের সৎকার করুন—সংকারঃ ক্রিয়তাং ভ্রাতুঃ স্ত্রীগণঃ পরিসান্ত্ব্যতাম্। কিন্তু বিভীষণ যত শোকগ্রস্তই হোন, যত ধার্মিকই হোন, শক্তিমন্তের পক্ষকে কিঞ্চিৎ লেহন করার অভ্যাস তাঁর ছিল এবং সে জিনিস বাল্মীকির চোখ এড়ায়নি। যিনি নিজেই রাবণের প্রেতকার্য করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তিনি হঠাৎই বলে উঠলেন—আমি এই ধর্মহীন, পরস্ত্রীহারী রাবণের সৎকার করতে চাই না—নাহমর্হামি সংস্কর্তুং পরদারাভিমর্শিনম্। এমন কথা, এমনি করে বলে ফেলাটাই বড় কথা নয়, এই কথার পেছনে উদ্দেশ্যটাই বড় কথা। বিভীষণ

ভাবলেন—এই কথাটা বললে বোধহয় রামের খুব ভাল লাগবে, তিনি তাতে বিভীষণের ওপর খুশি হবেন—বিমৃশ্য বুদ্ধ্যা প্রশ্রিতং—তাই বিভীষণ এই কথাটা বললেন। রাম আবার তাঁর উদাত্তকণ্ঠে বললেন—শত্রুর মরণ পর্যন্তই তার সঙ্গে শত্রুতা। তাছাড়া রাবণ অধার্মিক হতে পারেন, কিন্তু তেজস্বিতা এবং বলবত্তায় তাঁর সমতুল্য ব্যক্তি কোথায় আছে—মহাত্মা বলসম্পন্নো রাবণো লোকরাবণঃ। আর এখন তো রাবণ মারা গেছে ; এই সময়ে তোমারই মত আমারও সে বন্ধুই বটে—মমাপ্যেষ যথা তব। তবে বিভীষণের তোষণেচ্ছা বুঝতে রামের দেরি হয়নি, তিনি সীতাকে দেখার আগেই বিভীষণের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করেছেন।

অবশেষে সীতা। যার জন্য রামায়ণ সাতকাণ্ড হল, সেই সীতা। বালিবধ, সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সমুদ্র লঙ্ঘন এবং বন্ধন সব এই সীতার জন্য। এত যুদ্ধের কারণও সীতা—অন্তত লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত বাল্মীকি আমাদের সেই ধারণাই দিয়েছেন। কিন্তু ওই যে বললাম বাল্মীকি রামায়ণে রাবণবধের পর সবারই মনোলোকে কেমন যেন এক পরিবর্তন এসেছে। সীতাকে চতুর্দোলায় চড়িয়ে অশোকবনের গাছতলা থেকে রামের কাছে নিয়ে আসা হচ্ছিল। কিন্তু এই খবর শুনেই রামের মনে কেমন রাগও হল, আনন্দও হল আবার শোকও হল—রোষং হর্ষঞ্চ দৈন্যঞ্চ রাঘব প্রাপ শত্রুহা। চোদ্দ বছর পরে প্রিয়ার চাঁদ-চুয়ানো মুখ দেখতে পেলে এই ধরনের সাত্ত্বিক বিকার হয় কিনা, তার একটা রসশাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারতাম, কিন্তু তার আগেই দেখছি রাম উত্তরোত্তর রেগেই যাচ্ছেন, রেগেই যাচ্ছেন। সীতা আসছেন, তাঁকে দেখার জন্য প্রচণ্ড ভিড়-ভাট্টা হচ্ছে কিন্তু রাম তাঁর এতকালের বিনীত স্বভাব লঙ্ঘন করে আগুন-চোখে বিভীষণকেই খানিকটা বকে নিলেন—সংরম্ভাচ্চাব্রবীদ্ রামশ্চক্ষুধা প্রদহন্নিব। বিভীষণং মহাপ্রাজ্ঞাং সোপালম্ভমিদং বচঃ ॥ তিনি বললেন—আমাকে অবজ্ঞা করে কেন লোকগুলোকে কষ্ট দিচ্ছ, এরা সবাই সীতাকে দেখতে চায়। বিপদে পড়লে সেই স্ত্রীলোককে দেখায় কোন দোষও নেই। বাড়ির পর্দা, লজ্জাবস্ত্র এগুলো স্ত্রীলোকের আবরণ নয়। তুমি সীতাকে নামাও চতুর্দোলা থেকে, সে আসুক আমার কাছে পায়ে হেঁটে—বিসৃজ্য শিবিকাং তস্মাৎ পদ্ভ্যামেবাত্র গচ্ছতু।

নিশ্চয়ই রামের ব্যবহার এখানে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করেছিল, কেননা, তাঁর কথা শুনে বিভীষণ, সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, হনুমান—সবাই কষ্ট পেয়েছেন। তুলসীদাস কৃত্তিবাস এসব জায়গায় 'প্রভুর লীলা' বলে অন্য সবার বিষম প্রতিক্রিয়াগুলি একেবারেই চেপে গেছেন। কিন্তু বাল্মীকি মহাকাব্যের কবি, তিনি জানেন যে, তিনি ধর্মশাস্ত্র লিখতে বসেননি, কিংবা লিখতে বসেননি দুজনে দুদিক থেকে এসে

জড়িয়ে-ধরা কোন মিলনান্তক চলচ্চিত্রের মহড়া। বাল্মীকি রামের কথার স্ববিরোধগুলি অদ্ভুতভাবে পরিবেশন করে নিজের অন্তরদাহ মিশিয়ে দিয়েছেন লক্ষ্মণ, সুগ্রীব কিংবা হনুমানের প্রতিক্রিয়ায়। একটু আগেই মৃত রাবণের বুকের ওপর আছড়ে-পড়া মন্দাদরীর মুখ দিয়ে বাল্মীকি বলিয়েছেন—আমি অবগুণ্ঠন মোচন করে নগরের দ্বার দিয়ে প্রশস্ত রাজপথে পায়ে হেঁটে এসেছি তোমার কাছে; তবু যে তুমি রাগ করছ না—দৃষ্ট্বা ন খল্বসি সংক্রুদ্ধো মাম্ ইহানবগুণ্ঠিতাম্। নির্গতাং নগরদ্বারাৎ পদ্ভ্যামেবাগতাং প্রভো ॥ তোমার অন্য রমণীরাও তো লজ্জাবস্ত্রের ঘোমটা খুলে সবার সামনে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে—ভ্রষ্টলজ্জাবগুণ্ঠনান্, তবু যে তুমি রাগ করছ না?

তার মানে, বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে লজ্জাবস্ত্রের অবগুণ্ঠন ত্যাগ করে পায়ে হেঁটে সবার সামনে আসাটা যেখানে অনার্য রাক্ষসদের মধ্যেও শিষ্টাচার বলে গণ্য হত না, সেখানে রামের ব্যবহার বিসদৃশ। সীতাকে সোজাসুজি অপমান করার জন্যই তিনি এই অভদ্র ভাষাগুলি ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া সীতা তো কোন বিপদে পড়েননি, বরঞ্চ তিনি বিপদ্-মুক্ত, কাজেই রামের যুক্তি এখানে খাটেই না। শুধু এটুকু হলেও হত, এরপর রামচন্দ্র বললেন—সমুদ্র-বন্ধন, রাবণবধ, এত যে সব দুষ্কর কর্ম করেছি, তা তোমার জন্য নয়, সীতা! সে শুধু আপন কুলের মর্যাদা রক্ষার জন্য। তোমাকে উদ্ধার করেছি। তুমি এখন যেখানে খুশি যেতে পার—যথেষ্টং গম্যতামিতি, যাকে মনে ধরে তাকেই বিয়ে করতে পার—বিভীষণ সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন যাকে মনে ধরে— নিবেশয় মনঃ সীতে যথা বা সুখমাত্মনঃ। বাস্তবিক তোমার চরিত্রেই আমার সন্দেহ হয়। চোখ-খারাপ লোকের সামনে আলো রাখলে যেমন তার কষ্ট হয়, তেমনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তুমি আমায় কষ্টই দিচ্ছ—দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়ম্। এই একটিমাত্র উপমা দিয়েই বাল্মীকি বুঝিয়ে দিয়েছেন বাল্মীকি রামের দলে নন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন, আসলে রামের চোখেই সন্দেহের রোগ ধরেছে, সীতা আলোকবর্তিকার মত পবিত্র।

যাঁরা আজকের দিনের আর্থ-সামাজিক ভাবনায় বাল্মীকির প্রেমচেতনা নিয়ে আলোচনা করে রামচন্দ্রকে অপ্রেমের যূপকাষ্ঠে বলি দেন, তাঁরা বোঝবার চেষ্টা করবেন যে বাল্মীকির বক্তব্যে এবং রামের বক্তব্যে একটা বিরাট তফাত আছে। আমরা বলি, ব্যাপারটা রামের দিক থেকেও দেখা দরকার। নিজের স্ত্রী, সে যদি আবার পরমা সুন্দরী হয় এবং তাকে যদি রাবণের মত কামুক পুরুষ হরণ করে নিয়ে গিয়ে এক বছর নিজের কাছে রাখে, তাহলে যত উদারই হোন না কেন, তবু

মনের মধ্যে খচখচানি থাকে বৈকি ! রামের কেবলই মনে হতে লাগল যে, এই রূপ দেখে রাবণ সীতাকে শঙ্খ-ঘন্টা নেড়ে আরতি করে পূজার বেদীতে বসিয়ে রাখেননি নিশ্চয়ই। রাম বললেন—তোমার এই রূপ দেখে রাবণ তোমায় ছেড়ে দিয়েছে বলে মনে হয় না—ন হি ত্বাং রাবণো দৃষ্ট্বা দিব্যরূপাং মনোরমাম্। মর্ষয়ত্যচিরং সীতে স্বগৃহে পর্যবস্থিতাম্।

রামচন্দ্র অনেক কটুকথা বললেন বটে, তবে বাল্মীকিও তাঁকে ছেড়ে দেননি। সীতার মুখ দিয়ে তাঁকে চাবুক কষিয়ে বলেছেন—অসভ্য ছোটলোকেরা অসভ্য মেয়েদের সঙ্গে যেমন করে কথা বলে, তুমি সেই রকম বলছ—প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব। অসভ্য মেয়েরা যা করে সেই কথা ভেবেই তুমি সমস্ত স্ত্রী-জাতিকে এই রকম করে সন্দেহ করছ—পৃথক্‌স্ত্রীণাং প্রচারেণ জাতিং ত্বং পরিশঙ্কসে। এতকাল একসঙ্গে থেকে আমাদের মধ্যে যে প্রেমের মধু জমা হয়েছিল, সেই তুমিও যদি আমাকে না বোঝ, তাহলে আমার মরণ ছাড়া আর কি গতি আছে—যদি তে'হং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি শাশ্বতম্। লজ্জায় ঘৃণায় নিজের গায়ের মধ্যেই যেন সিঁটিয়ে যাচ্ছিলেন সীতা, লক্ষ্মণকে তিনি সেই মুহূর্তে চিতা প্রস্তুত করতে বললেন।

রাবণ মরিয়াও প্রমাণ করিল যে সে মরে নাই। এই রাবণের জন্যই সীতাকে দুঃখ সইতে হয়েছে অজস্র। শুধু রাম কেন, সীতাকে সন্দেহ করেন অনেকেই। একমাত্র ব্যতিক্রম বাল্মীকি। বহ্নিবিশুদ্ধা সীতাকে আবার অপবাদ সইতে হয়েছে অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে। দু-একজনে তাঁর কোলের ছেলেকেও রাবণের ছেলে বলে সন্দেহ করেন, যদিও এসব সন্দেহের কোন পোষণা সপ্তকাণ্ড রামায়ণের কোথাও করেননি বাল্মীকি। পণ্ডিত সুখময় ভট্টাচার্য মশাই রাশি নক্ষত্র ধরে রাবণের ঘরে সীতার বন্দিনী দশার কাল নির্ণয় করেছেন এবং তাতে পরিষ্কার হয়ে গেছে, সীতার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে অযোধ্যায় ফিরে আসার অনেক পরে। আমরা বলি, রামকে তো লোকে 'একপত্নী ব্রত' বলে জানে, কিন্তু হেমচন্দ্র আচার্যের জৈন রামায়ণ মতে তো তাঁর আরও তিনটে বৌ ছিল এবং তারাই নাকি সীতার নামে কুৎসা করেছিল রামের কাছে। বাংলাদেশে যাঁরা রামায়ণ লিখেছেন কৃত্তিবাস, চন্দ্রাবতী দেবী, তাঁরা কেউই এই জৈন রামায়ণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তবে রামের অন্য বৌদের সরাসরি কাব্যে স্থান দিতে তাঁদের ভয় ছিল, তাই সে কাজটা তাঁরা করেছেন অন্যভাবে। বাল্মীকি কিন্তু এসব কিছুই দেখাননি।

আসলে পাঠক যদি সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সমস্ত ঘটনাগুলি যথাযথ খেয়াল

করেন, তাহলে দেখবেন রামচন্দ্র কম প্রেমিক ছিলেন না। আধুনিক গবেষকেরা বলেন, রামচন্দ্র প্রেমের মর্যাদা বুঝতেন না। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় সোনার সীতা বানিয়েই তাঁর কাজ চলেছে, আসল সীতার কোন প্রয়োজনই তাঁর নেই। আমরা বলি, সীতাকে ছেড়ে অন্য রাজা-রাজড়াদের মত তিনি আরও একটা বিয়ে করেননি, সোনার সীতা গড়ে তিনি বুঝিয়েছেন, সীতা ছাড়া আর কাউকে দিয়েই তাঁর পত্নীব্রত চলে না। আর ভালবাসা! পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে কষ্ট করতে এসে রাম-সীতার প্রেম যেন আরও বেড়ে গেল। সংসারের সমস্ত জটিলতার বাইরে উন্মুক্ত অরণ্যরাজ্য তাঁদের প্রেমকে আরও বিপুল প্রশ্রয়ে বাড়িয়ে তুলছিল যেন। হিতকারী লক্ষ্মণ সঙ্গে থাকায় ক্ষুধার অন্ন কিংবা বাসস্থান নিয়েও তাঁদের চিন্তা করতে হয়নি। প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্যে মোহিত রাম বারবার সীতাকে বলেছেন—রাজ্যনাশ কিংবা অযোধ্যার স্বজন হারানোর কষ্ট কিছুই তাঁর মনে লাগে না—ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ। রাম সীতাকে কখনও পর্বতের শোভা দেখান, কখনও নদীর শোভা। সীতার ভাল লাগলে, সেই বনেই তিনি বেশিদিন থাকেন—বৈদেহ্যাঃ প্রিয়মাকাঙ্ক্ষন্ স্বঞ্চ চিত্তং বিলোভয়ন্। যে সীতার একটুখানি হরিণের বায়না রাখার জন্য তিনি অসম্ভবের পেছনে দৌড়েছিলেন, সেই সীতার প্রতি তাঁর প্রেম ছিল না, একথা অবাস্তব। যে সীতা হরণের পরে সমস্ত কাল ধরে তিনি শুধু কেঁদেছেন, যে-সীতার জন্যে বানরেরা পর্যন্ত রামচন্দ্রের উপর বিরক্ত হয়ে গেছিল, সে সীতার ওপরে রামের ভালবাসা ছিল না? অথচ অনেক দিনের পর যখন পরানবধূর সঙ্গে নবীন মিলনের কুঞ্জ প্রস্তুত, তখন সন্দেহ, ভয়, লোকলাজ সবই একসঙ্গে তাঁর হৃদয়ের আবেগ রুদ্ধ করে দিল।

আসলে ওই যে বলেছি রাবণবধের পর থেকেই রাম যেন এক অন্য মানুষ। সুগ্রীব, লক্ষ্মণ কাউকে তিনি তোয়াক্কাই করছেন না। সদ্য রাজা হওয়া বিভীষণকে তিনি স্বভাববিরুদ্ধভাবে গালাগালি দিচ্ছেন। তাঁর এইসব ব্যবহার যে তাঁর একান্ত স্বভাব-বিরুদ্ধ তা বুঝিয়ে দিতেও বাল্মীকি কসুর করেননি। সীতার অগ্নিশুদ্ধির প্রস্তাবে লক্ষ্মণ রাগে কটমট করে রামের দিকে তাকাচ্ছিলেন—এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা। অমর্ষবশমাপন্ন রাঘবং সমুদৈক্ষত ॥ দীর্ঘ সময় ধরে রাক্ষস এবং বানরেরা যে রামচন্দ্রকে জানত একমাত্র 'সীয়াবর রামচন্দ্র' বলে, সেই রামচন্দ্রের মনেই কেমন 'রাজা-রাজা' ভাব হল একটা। তিনি এখন 'রঘুপতিরাঘব রাজা রাম'—আর কিছু নন।

আমাদের দুঃখ হল রামকে সবাই, এমনকি আমরাও এইভাবেই বুঝলাম, তাঁর

সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের কথা কেউ বুঝলাম না। তুলসীদাস, কৃত্তিবাস তো প্রথম থেকেই রামকে 'যজ্ঞেশ-নারায়ণ-কৃষ্ণ-বিষ্ণু' বলেই জানেন এবং তাঁদের দোষ দেব কি, খোদ বাল্মীকির মধ্যেই আরেক কোন বাল্মীকি সম্পূর্ণ উত্তরকাণ্ড ধরে রামকে ভগবান বানিয়ে ছাড়লেন। পণ্ডিতেরা প্রক্ষেপবাদের ওজর এখানে তুলবেনই এবং আমরাও তাতে আপত্তি দেখি না। তুলসীদাসের রাম তো আবার অরণ্যকাণ্ড থেকেই নিজেকে বিষ্ণুর প্রতিরূপ বলে জানেন, কাজেই এক সীতাকে অগ্নির কাছে রেখে মায়া সীতাকে রাবণের হাতে ছেড়ে দিতে তাঁর বাধেনি এবং সীতা রাবণের ঘর থেকে এলে তাঁর মনে কোন দ্বন্দ্ব সন্দেহ কিছুই হয় না। কিন্তু বাল্মীকির রামচন্দ্র অগ্নিশুদ্ধির পর অগ্নিকেই বললেন—জানকী পবিত্র, সে ধারণা আমার ছিল, কিন্তু বহুদিন তিনি রাক্ষসের ঘরে ছিলেন, একটু পরীক্ষা করে না নিলে লোকে বলত—দশরথের ছেলে রাম ! সে তো একটা বোকা পাঁঠা; অত্যন্ত কামুক লোক—বালিশো বত কামাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ।

ঠিক এই পংক্তির মধ্যেই রাজা রামচন্দ্রের মনস্তত্ত্ব লুকিয়ে আছে। ঠিক একই রকম কোন কথা, পূর্বে উচ্চারিত অনুরূপ কোন উক্তি পাঠক কি স্মরণ করতে পারেন ? মনে পড়ে কি, ছোটরানী কৈকেয়ীকে দশরথ একবার বলেছিলেন—আজকে রামকে তোমার কথায় বনবাস দিলে, লোকে বলবে—বোকা রাজা, কামুক রাজা, স্ত্রীর কথায় সে প্রিয় পুত্রকে বনবাস দিয়েছে—বালিশো বত কামাত্মা রাজা দশরথো ভৃশম্। দশরথের এই কথাটি উপলব্ধি করলেই পাঠক রামের মনোজগতে প্রবেশ করতে পারবেন সহজে। রাবণবধের পর রাম বিভীষণকে রাজা করেছেন এবং তিনি বুঝেছেন তাঁরও রাজা হবার সময় আসছে। স্ত্রীর বশবর্তী হয়ে যে দশরথ নিজের পুত্র বিসর্জন দিয়েছিলেন, অরণ্যযাত্রার সময় ভাই বন্ধু, রাস্তাঘাটের লোকেরা পর্যন্ত যার সম্বন্ধে বলেছে 'কামাত্মা', 'কামবেগবশানুগ', সেই দশরথের কাছ থেকে রাম যেন এক শিক্ষা নিয়েছিলেন। রাজা হওয়ার সময় আসতেই এবং সম্পূর্ণ রামরাজ্যের সময়েও তাঁর মনে কেবল এই চেষ্টা ছিল যে, কেউ যেন তাঁকে 'কামাত্মা' না বলে। রাবণের ঘর থেকে আসা ভালবাসার স্ত্রীকেও তাই তিনি বিনা বাক্যে গ্রহণ করতে পারেননি। এই একই লোকাপবাদের কারণে 'কামাত্মা' না হওয়ার বিষম চেষ্টায় রাম আবার সীতাকে বিসর্জন দিয়েছেন উত্তরকাণ্ডে। সেখানেও এই একই ভাব, লোকে তাঁকে স্ত্রীর বশবর্তী বলে জানে না তো ?

আসলে রামায়ণে দুটি বিসর্জন নাটক আছে। এক জায়গায় তরুণী রমণীর প্রেমে পাগল দশরথ রমণীর জন্য পুত্রকে বিসর্জন দিচ্ছেন, আরেকজন ভাল

রাজা হবার জন্য, প্রজানুরঞ্জনের জন্য, দ্বিতীয় দশরথ না হবার জন্য তরুণী রমণীকে বিসর্জন দিচ্ছেন। রামের প্রেম নিয়ে হাজারো কাব্য লেখা হয়েছে, কিন্তু দশরথ-কৈকেয়ীর প্রেম নিয়ে কেউ তো কাব্য লিখলেন না। কেন ? প্রেমিক হিসেবে তিনিই তো আদর্শ ! কাজেই কামাত্মা দশরথের ব্যক্তিজীবনের ভূত রামের মনে এক বিপরীত প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। সারা জীবন তিনি এই ভূতই বহন করে শুধু পিতৃসত্য পালন করেছেন, প্রেম থাকলেও তিনি প্রেমের কথা আর বলতে সাহস পাননি। অযোধ্যাকাণ্ডে এক রাজাকে যেমন রমণীই অধিকার করেছিল, উত্তরকাণ্ডের অযোধ্যাপর্বে আরেক রাজা রমণীকে একবার বিশুদ্ধ করেও আবার বিসর্জন দিয়ে পিতার কলঙ্কের প্রায়শ্চিত্ত করল। রাবণবধের পর প্রেমিক রামচন্দ্রকে গ্রাস করল রাজা রামচন্দ্র। ক্রৌঞ্চবিরহী কবি তাই অলংকারশাস্ত্রসম্মত কোন মিলনান্তক মহাকাব্য লিখতে পারলেন না, যা লিখলেন তা হল, মানুষের একান্তভাবেই মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বময় মনোলোকের ইতিহাস, বিরহ-ব্যথায় বিধুর এক 'ট্র্যাজিডি'।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাম বলতে বাল্মীকি যে কোন অতিদেব, লোকোত্তর মানুষের স্বপ্ন দেখেননি তা আমি অল্প হলেও দেখানোর চেষ্টা করেছি। দেখিয়েছি শুধু ঝুঁটিবাঁধা তাপস বালক নন, তাঁর ক্রোধ, কাম, স্বার্থবোধ—সবই ছিল। আপনারা বলতে পারেন বাল্মীকি রামায়ণের মোক্ষম অংশগুলি খামচা খামচা করে তুলে এনে আমি রামচরিত্রকে একেবারে সাধারণ করে ফেলেছি। তাহলে বলতে হবে, অন্যেরা এতদিন যে রামচরিত্র বর্ণনা করছিলেন, তাও কিন্তু রামচরিত্রের মহীয়ান অংশগুলি খামচা খামচা তুলে এনেই। সত্যটা আছে মাঝখানে দাঁড়িয়ে, রামচরিত্রের ভাল এবং মন্দ একসঙ্গে আত্মসাৎ করে। রামচন্দ্র আদর্শ পুত্র কিংবা আদর্শ ভ্রাতা। এমনকি রামরাজ্যের প্রবাদে তিনি যে আদর্শ রাজাও—সে কথাও সব সময়ই শুনি। কিন্তু তাঁর আদর্শ পতিত্ব অথবা আদর্শ পিতৃত্বের ছন্দে যে কিছু ভুল ছিল, সে কথা কালিদাস এবং ভবভূতির আমল থেকেই নানাভাবে প্রচারিত। অস্বীকার করি না, আদর্শবান মানুষের ভাগটিই রামচন্দ্রের মধ্যে বেশি ছিল, কিন্তু তাঁর রাগ-দুঃখ, কাম-ক্রোধ অথবা কোন দোষই ছিল না—এমন কথা তো কই বাল্মীকি বলেননি। রাম লিখতে বসে আমি যে রামায়ণ লিখেছি তাও এই কারণেই। আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি, রামায়ণের কোন চরিত্রই বাল্মীকি অবাস্তব কিংবা উদ্ভট আদর্শে বর্ণনা করেননি। রামায়ণের প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যেই যেখানে গুণগুলি দোষের সঙ্গে মিশে আছে, যেখানে আপাতশুদ্ধ আদর্শের গর্ভে আছে অশুদ্ধতার ভ্রূণ কিংবা ন্যায়নীতির প্রকোষ্ঠে অন্যায় এবং নীতিভ্রষ্টতা, সেখানে আলাদা করে শুধু রামচরিত্রটি যে একেবারে অলৌকিক হয়ে উঠবে, এ ধারণা ভুল। রামায়ণের অনেক চরিত্রই আমি এখানে এইজন্যে হাজির করেছি যে তাতে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে রামচরিত্রও সর্বৈব প্রকাশ হয়ে পড়বে। কেননা অযোধ্যায় যেমন দশরথ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, ভরত সবাইকে নিয়েই

রামের সংসার তেমনি তাঁর বনবাসের সংসারে আছেন বালি, সুগ্রীব, হনুমান, তারা, অঙ্গদ—সবাই। আবার অযোধ্যা, কিষ্কিন্ধ্যা ছেড়ে লংকাপুরীতে গেলে দেখব রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎ—এরাও সবাই রামের জীবনধারার অনেকখানি অংশ অধিকার করে নিয়েছেন। এঁদের সবাইকে নিয়েই রামের বিরাট সংসার। কাজেই এঁদের সবার কথা বললে রামচরিত্রই যে, মূলতঃ পরিষ্কার হবে—তাতে সন্দেহ কি।

এর ওপরেও একটা কথা মনে রাখা দরকার। যিনি মহাকাব্য লেখেন এবং যে বিশাল প্যানোরমায় তাঁকে মহাকাব্য লিখতে হয়, তাতে ফাঁক-ফোকর, সমালোচনার রসদ কিছু থেকেই যায়। কিন্তু পাঠক! সে ফাঁক বাল্মীকি স্বয়ং রেখেছিলেন বলেই তো আপনি সমালোচনা করতে পারছেন। তিনি তো কিছুই লুকোননি। প্রজারঞ্জনের জন্য গর্ভবতী সীতাকে বনবাস দিয়ে বসলেন রামচন্দ্র। আমরা বললাম—একটুও কি প্রেম ছিল না রামচন্দ্রের হৃদয়ে! তিনি কি প্রেম বুঝতেনও না! কিন্তু ঠিক এইখানেই বাল্মীকির ক্ষমতা, প্রেমের ব্যাপারে তিনি অন্ততঃ রামচন্দ্রের মত বেরসিক নন। রাবণবধের পরে রামচন্দ্রের যে উন্নাসিক আচরণ কিংবা সীতা-পরিত্যাগ–এ সবপরিস্থিতি তো বাল্মীকিই তৈরি করেছেন। হাজারো আদর্শের চূড়ায় উঠিয়ে মহাকাব্যের এক উদাত্ত নায়ককে এইভাবে যখন কবি স্থানভ্রষ্ট করেন, তখনই বোঝা যায় তিনি তাঁকে লোকোত্তর কোন পুরুষাতীত আদর্শের অলংকারে সাজাতে চান না। মানুষ বলেই এক জায়গায় সব ভাল তাঁর মধ্যে বাসা বাঁধেনি। মহাকবির প্রেম চেতনাও এইখানেই।

পরবর্তী কবিরা রামের এবং একই সঙ্গে ক্রৌঞ্চবিরহী কবির এই বিসদৃশ আচরণ অতি নিপুণভাবে লক্ষ্য করেছেন, আর করেছেন বলেই কালিদাস তাঁর রঘুবংশে বনবাসিনী সীতাকে দিয়ে রাজা রামকে, মনে রাখবেন রাজা রামকে, গালাগালি দিইয়েছিলেন। কিন্তু কালিদাসের কবিত্ব শৈলীর এই ইন্ধনটুকু তো জুগিয়েছেন বাল্মীকিই। মহাকাব্যে কবি নিজে কিছু বলেন না শুধু পরিস্থিতি তৈরী করেন, মুখে ন্যায় অন্যায় বলা তাঁর স্বভাব নয়, তিনি শুধু সাক্ষী থাকেন। আদর্শ মহত্ত্বের মধ্যে মহাকবি স্থানভ্রষ্টতার ফোঁকর তৈরী করে দেন বলেই বজ্র-সমুৎকীর্ণ মণির ভেতর সূচের মত ঢুকে ফাল হয়ে বেরোন পরবর্তী অন্য কবিরা। কালিদাসের সীতা অভিমানে বলেছেন—লক্ষ্মণ! তোমাদের রাজা রামকে বোল, আমাকে অগ্নিশুদ্ধ জেনেও শুধুমাত্র লোকনিন্দার ভয়ে যে আমাকে তিনি ত্যাগ করলেন—এ কি তাঁর কীর্ত্তি কিংবা বংশের অনুরূপ হল! তবু কালিদাস বলেছেন, সীতাকে ছেড়ে রামচন্দ্র অনেক কেঁদেছেন, যেন তুষারবর্ষী পৌষমাসের চাঁদ এবং

তিনি যে সীতাকে ত্যাগ করেছেন সে শুধু বাইরের লোকের জ্বালায়, মন থেকে নয়—কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা, ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ। সীতাকে রামচন্দ্র মন থেকে নির্বাসন দেবেন কি করে, তিনি যে 'বৈদেহিবন্ধু'—বৈদেহীর প্রেমে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। একবার কালদোষে নির্বাসিতা, যার জন্য রামচন্দ্রকে লংকাকাণ্ড পর্যন্ত কাঁদতে হয়েছিল, তাঁকে আবার আপন হাতে নির্বাসন—তাঁর হৃদয় যেন ফেটে গেল—'বৈদেহিবন্ধো র্হৃদয়ং বিদদ্রে'। ঠিক এইখানটাতেই এক মহাকবির লেখনীতে আরেক মহাকবির সমালোচনা ধ্বনিত হয়। কিন্তু এই যে সমালোচনা, তা কালিদাস এই স্পর্ধাতেই করতে পেরেছেন, যে স্বয়ং মহাকবি আছেন তাঁর পক্ষে। বাল্মীকি যে স্বয়ং এইখানে রামচন্দ্রকে প্রেমচেতনার সিংহাসন থেকে নামিয়ে এনে প্রজা পালকের আদর্শ সিংহাসনে বসিয়েছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন—হয় প্রেম, নয় রাজত্ব—দুটো একসঙ্গে হবে না বাপু! রামচন্দ্র যদি সরল সাহসে বলতে পারতেন রাজত্বে সুখ নেই—'নাহি সুখ যশে'—তাহলে সীতাকে পাওয়া তাঁর কঠিন ছিল না। কিন্তু লজ্জা! পিতার কৈকেয়ী প্রেমের দৃষ্টান্তে রঘুকুলের যশ বাড়াতে, তিনি সীতাকেই সব ভাবতে লজ্জা পেয়েছেন। প্রজা পালনের বৃহত্তর স্বার্থই তিনি বেছে নিলেন, প্রিয়া পত্নীকেই দিলেন বিসর্জন।

অন্যদিকে দেখুন, কালিদাসের অতিসংবেদনশীল মনের মাধুরী। তাঁর আদর্শে সীতা কিন্তু রামচন্দ্রের মন থেকে কিছুতেই ছাড়া পান না—ন তেন বৈদেহসুতা মনস্তঃ। বিরাট রঘুবংশের পরিসরে কালিদাস যতটুকু বলতে পেরেছেন, কিংবা শেষ করেছেন যেখানে, ঠিক সেখানেই ভবভূতি আরম্ভ করেছেন তাঁর উত্তররামচরিত। যা নিয়ে রামের সমালোচনা ঠিক সেখানটাতেই ধরলেন ভবভূতি। যে লোকটি সীতার অপবাদ রামচন্দ্রের কাছে বয়ে নিয়ে এল, ভবভূতি তার নাম দিয়েছেন দুর্মুখ। প্রেমের নির্মল জ্যোৎস্নায় যখনই লোকনিন্দার রাহুচ্ছায়া দেখা দেয়, ভবভূতি বোধহয় তখনই সেই লোকগুলির দিকে আঙুল তুলে বলেন—'অয়ি কঃ'। উত্তর আসে—আপনারই একান্ত পরিচারক দুর্মুখ। সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় ভবভূতি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, স্ত্রীলোক আর কবির কাব্য—এই দুয়েরই শুদ্ধতায় বিশ্বাস করে না দুর্জনেরা। ভবভূতির এই কথায় তাঁর সহচর নাটকের মধ্যেই টিপ্পনী কেটেছে—অতি দুর্জন বলুন, এই দেখুন না—অগ্নিশুদ্ধা যে বৈদেহী, তাঁর চরিত্রেও নিন্দা রোপন করে কুপুরুষেরা। সন্দেহ হয়, ভবভূতি দুর্জন বলতে একেবারে রামচন্দ্রের দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করেননি তো? কেননা পরে দেখি সীতার কলঙ্ক শুনে রাম নিজেকেই দুষছেন। বাবা-মা,

শ্বশুর, বিভীষণ, সুগ্রীব—এঁদের সবাইকে তিনি হা হতো'স্মি করে ডাকছিলেন আর বলছিলেন—আমার মত কৃতঘ্নের মুখে এই ভাল-মানুষদের নাম-গ্রহণও পরোক্ষে এঁদেরই দূষিত করছে। ভবভূতি অপবাদভীত রামচন্দ্রকে মানসিক যন্ত্রণার চরমে নিয়ে গেছেন। সীতা শুয়েছিলেন রামচন্দ্রেরই হাতে মাথা রেখে আর সেই অবস্থায় মনে মনে সীতাকে বিসর্জনের সংকল্পে রাম নিজেকে একটুও ক্ষমা করতে পারছেন না। ভাবছেন—আমি কি নৃশংস, অতি বীভৎস এক কাজে হাত দিয়েছি—আশৈশব যে প্রিয়াকে লালন করেছি, সৌহার্দ্যে যার সঙ্গে আমি অভিন্ন-হৃদয়, সেই প্রিয়াকে ছলনা করে সঁপে দিচ্ছি মৃত্যুর হাতে, ঠিক যেন গৃহপালিত পাখিটিকে নিয়ে চলল কসাই—ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে শৌনিকো গৃহশকুন্তিকামিব। সীতার প্রেম রামের মনে এতটাই উজ্জ্বল যে, তিনি মনে করেছেন সীতাকে স্পর্শ করারই যোগ্য নন তিনি—আমি অস্পৃশ্য পাতকী, দেবী সীতাকে স্পর্শ করে দূষিত করছি। আস্তে আস্তে তিনি সীতার মাথার তলা থেকে নিজের দূষিত হাতখানি সরিয়ে নেন, মুখে বলেন— আমি দুষ্কর্মপটু চণ্ডাল হয়ে গেছি সীতা, শুদ্ধ প্রেমে মুগ্ধ বধূটি আমার, ত্যাগ কর আমাকে। মনের ভুলে আমাকে তুমি চন্দনের গাছ বলে ভেবেছ, কিন্তু আসলে আমি বিষবৃক্ষ—শ্রিতাস্মি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্বিপাকং বিষদ্রুমম্।

শুধু রামচন্দ্রকে আত্মদহনে দগ্ধ করেই ক্ষান্ত হননি ভবভূতি, প্রেমের রাজ্যে এই যে চরম অন্যায়টি ঘটে গেছে ক্রৌঞ্চবিরহী কবির হাতে, তার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন সারা নাটকে বিভিন্ন জায়গায় রামচন্দ্রকে ধিক্কার দিয়ে। কিন্তু এই যে ধিক্কার—এ ধিক্কারের পথ তো করে দিয়েছেন স্বয়ং বাল্মীকি। রামচন্দ্রের আত্মদূষণে আর কবির ধিক্কারে যেটি সবচেয়ে প্রকট হয়ে ওঠে সেটি তো বাল্মীকিরই প্রেমচেতনা, যে চেতনা মোটেই হাল আমলের ব্যাপার নয়, কিংবা নয় এমন কিছু যাতে মনে হবে রামচন্দ্র শুধু শয্যামিলনের প্রস্তুতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন। যদি তাই হোত, তাহলে সীতাকে অল্প-স্বল্প খোঁজার চেষ্টা করার পরই রামচন্দ্রকে আরেকবার ছাতনাতলায় বসিয়ে দিতে পারতেন বাল্মীকি, যা সে যুগে অচলও ছিল না। কিন্তু বাল্মীকি তাও করেননি, আবার তিনি রামচন্দ্রকে প্রেমের আদর্শ আসন থেকে ঠেলেও ফেলে দিয়েছেন। এই যে প্রেম থাকতেও আপাত প্রেমহীনতা—এইখানেই মহাকবি রামচন্দ্রকে একেবারে মানুষ করে ফেলেছেন, তাঁর গুণ-দোষ কিছুই কবি লুকোননি, যা তিনি লুকোননি দশরথের বেলায়, কৌশল্যা-কৈকেয়ীর বেলায়, লক্ষ্মণের বেলায় এমনকি সীতার বেলাতেও এবং সে সবই আমি পূর্বে দেখিয়েছি এইজন্যে যে, রামচরিত্রও এঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

বাল্মীকি কিছু লুকোননি বলেই আরও কিছু কথা বলার সাহস পাচ্ছি। যেমন আজকাল কেউ কেউ বলছেন যে, দশরথের ছেলে চারটি তার নিজের ছেলে নয়, ওগুলি সব আসলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পুত্র। (দ্রঃ জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কবি তব মনোভূমি রামের জনম স্থান', দেশ, ৮ অক্টোবর, ১৯৮৮, পৃঃ ১৯-২৫) সৌভাগ্যের বিষয় এই সব বক্তারা প্রাচীন নিয়োগ প্রথার কথা শুনেছেন এবং যেহেতু শুনেছেন অতএব তাঁদের মনে হয়েছে যে রাম-লক্ষ্মণ সবাই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নিয়োগজাত পুত্র, ঠিক যেমনটি মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর ব্যাসদেবের পুত্র।

মজা হল, এই পণ্ডিতেরা একবার বলছেন রামায়ণের আদিকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত, অথচ অন্যদিকে আদিকাণ্ডের ঋষ্যশৃঙ্গকে দিয়েই চারটি ছেলের জন্ম না দেওয়ালে তাঁদের 'লিবিডো' প্রসন্ন হচ্ছে না। এঁদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা—আপনাদের মতে মূল কাণ্ডপঞ্চকের মধ্যে তো কোথাও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির উল্লেখমাত্র নেই এবং সেখানে সব জায়গাতেই তো রাম-লক্ষ্মণেরা 'দশরথাত্মজ' বলেই পরিচিত। কাজেই সেখানে আবার আদিকাণ্ডের ঋষি-মুনির শৃঙ্গ ধরে টানাটানি কেন ? দ্বিতীয়তঃ যদি আদিকাণ্ডকেও কথঞ্চিৎ প্রামাণিক ধরে কথা বলেন, তাহলে আমি বলব সেটা আরও হাসির ব্যাপার হবে। কেননা দশরথের কোন্ অনামা স্ত্রীর গর্ভে শান্তার জন্ম হয়েছিল সেটা জানা না গেলেও, শান্তা যে দশরথের কন্যা সে কথা সর্বজন-স্বীকৃত। ভবভূতির মত কবি, যিনি পণ্ডিত বলেও সমধিক পরিচিত, তিনিও তো সাড়ম্বরে শান্তার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর বিয়ে হয়েছিল ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গেই। কাজেই দশরথের পুত্র উৎপাদন করার ক্ষমতা ছিল না—এ কথাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বরঞ্চ বলতে পারি পুত্র উৎপাদনের আগে পর্যন্ত দশরথের পুত্র নিশ্চয়ই হয়নি কিন্তু তাঁর উৎপাদনী ক্ষমতাই ছিল না—শান্তা কি তাই প্রমাণ করে ? তৃতীয়তঃ সেকালের দিনে নিয়োগ প্রথা যতই চালু থাকুক, তারও কিছু রীতি-নীতি ছিল। গম্যা এবং অগম্যার বোধও ছিল যথেষ্ট। সেক্ষেত্রে দশরথ হেন রাজা আপন জামাইকে দিয়ে নিজের পত্নীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করতে খুব যে উৎসাহ বোধ করবেন, তা মনে হয় না। নিয়োগের এমন অদ্ভুত উদাহরণ ইতিহাস-পুরাণে আর একটা পেলেও হত, তাও পাইনি। চতুর্থতঃ সেই পুরানো কথা। কোন চরিত্রের সামান্যতম ত্রুটিও যেখানে মহাকবি লুকোননি, সেখানে সম্পূর্ণ সমাজ-সচল নিয়োগপ্রথাই বা লুকোতে যাবেন কেন ? রামায়ণ-মহাভারতে বাল্মীকি কিংবা ব্যাস যা বলেছেন, তা সব সময় দাপটেই বলেছেন এবং সাড়ম্বরেই বলেছেন,

কোথাও তো তাঁরা ঢাক-ঢাক, গুড়-গুড় করেননি, এখানেই বা তাঁরা এমন অদ্ভুত আচরণ করবেন কেন ! আমার ধারণা, স্বক্ষেত্র ছাড়া যাঁরা পরক্ষেত্রে প্রবন্ধ লিখতে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁদেরকে যে ভিত্তিহীন নতুন কথা কিছু বলতেই হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে ! পুরানো আলোচনা, সমালোচনাই এত আছে যে তার সুসামঞ্জস্য করাই বেশ কঠিন, সেখানে যদি আবার নবতম সমালোচকের উর্বর ক্ষেত্র থেকে এমন হঠ-কল্পনা নিঃসারিত হতে থাকে তাহলে হতভাগা বাল্মীকি যাবেন কোথা ?

আমি রামায়ণের সাধারণ কিছু ঘটনা এবং চরিত্র নিয়ে দুচার কথা আগে বলেছি কিন্তু এই মহাকাব্যের সামগ্রিক গঠন নিয়ে কিছু বলিনি । এ নিয়ে ঝগড়া আছে অনেক, আছে পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই । সব ঝগড়া এখানে মেটানো সম্ভব নয়, কিন্তু এই সব ঝগড়া সম্বন্ধে কিছুই না বলাটাও বোধহয় সমীচীন হবে না । প্রথম কথা, বরোদা থেকে বাল্মীকি রামায়ণের যে পরিশুদ্ধ সংস্করণ বেরিয়েছে, তার সুবাদে এবং অনেক বাঘা বাঘা ইঙ্গ-ইউরোপীয় পণ্ডিত যেহেতু 'মনে করেছেন', তার সুবাদে অনেক অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে বাল্মীকি রামায়ণের অগ্র এবং পশ্চাৎ অর্থাৎ আদিকাণ্ড এবং উত্তর কাণ্ড ছেঁটে ফেলা হয়েছে । এর সব চেয়ে বড় কারণ হল—রামকে যে একেবারে ভগবান বিষ্ণুর অবতার করে ফেলা হয়েছে তা নাকি প্রধানতঃ এই কাণ্ড দুটিতেই । অযোধ্যা কাণ্ড থেকে লংকা কাণ্ড পর্যন্ত রামের এই ভগবদ্ উপাধি জোটেনি । ব্যাপারটা প্রথম বোধহয় পণ্ডিতদের মাথায় ঢুকিয়েছিলেন হারমান জ্যাকোবি । তাঁর মতে—

> রামের দেবায়ন এবং ক্রমশঃ বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর একাত্মতা—এই পুরো ব্যাপারটাই ছিল সেই কবির হৃদয়ে যিনি রামায়ণের আদি এবং উত্তরকাণ্ডটি লিখেছিলেন । মূল কাণ্ডপঞ্চকেও প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলিকে বাদ দিলে রামচন্দ্রের দেবায়নী ভূমিকা নেই কোন, বরঞ্চ তিনি সেখানে অনেক মানুষোচিত ।

রামের চরিত্র-ধারায় এই পরিবর্তন ঘটেছে অনেক কাল ধরে । সংশয়ী পণ্ডিতেরা প্রশ্ন তুলেছেন যে তথাকথিত মূল কাণ্ডগুলিতেও ধর্মীয় ভাবনা-চিন্তা অনুস্যূত ছিল না । এ কথা কি সর্বতোভাবে প্রমাণ করা যাবে ? আর আমাদের জিজ্ঞাসা হয়—'মূল কাণ্ড-পঞ্চকেও প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি বাদ দিলে'—জ্যাকোবির এই কথাটার মানে কি ? তার মানে কি এই দাঁড়ায় না যে, যেখানে যেখানে, অর্থাৎ মূল কাণ্ড-পঞ্চকের কতগুলি শ্লোকে এবং আদিকাণ্ড তথা উত্তরকাণ্ডে তো বটেই, যেখানেই রামকে ভগবানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে সেই অংশটাই

প্রক্ষিপ্ত। এই নিরিখে এমন কথা অবশ্যই বলা যায় যে, পণ্ডিতেরা যদি তাঁদের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণেই সংকল্পিত থাকেন তাহলে তাঁদের যুক্তিও সেই মতেই চলবে এবং সত্যি কথা বলতে কি, তাই চলেছে। যেখানেই পণ্ডিতদের অসুবিধে হয়েছে সেখানেই শ্লোকের পর শ্লোক বাদ পড়ে গেছে। 'কনটেক্সট' মিলছে না, শ্লোক বাদ দাও ; 'স্টাইল' মিলছে না শ্লোক বাদ দাও ; ছন্দ-অলংকার একটু অন্যরকম, শ্লোক বাদ দাও ; অবতারবাদ আছে—সব বাদ দাও।

আজকের দিনে এ প্রশ্ন অবশ্যই আসবে যে, পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে এমন গ্রন্থ উদ্ধার করে আনতে পারবেন কি যা সেই কালের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ; কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাৎসায়নের কামসূত্র-কিংবা এহেন বিশিষ্ট বিষয়ক গুটি কতক গ্রন্থ ছাড়া এমন গ্রন্থ দেখাতে পারবেন কি যা সেকালের সমাজের রন্ধ্র-পূরিত ধর্মভাব থেকে বিচ্ছিন্ন। আর অবতারবাদ জিনিসটাকে ভারতীয় ধর্মভাবনায় এমন নয়া আমদানী ভাবার কোন কারণ নেই যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আগে তা কেউ জানত না। বেদের ইঙ্গিত না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র কিংবা অতি পুরাতন পঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলিতে অবতারবাদের কথা ভূরি ভূরি আছে। উপনিষদ্-নির্ভর ব্রহ্মবাদীদের পক্ষে অবতারবাদ ব্যাখ্যা করাও অতি সহজ। তাছাড়া যদি লৌকিক দৃষ্টিতেও বিচার করি তাহলেও স্বীকার করতে হবে ভারতবর্ষে অবতার হওয়ার একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে, যাতে বিশিষ্ট মানুষের দেবায়ন ঘটা তাঁর জীবৎকালেই সম্ভব।

আমি সাধারণ একটি উদাহরণ দেব। যাঁরা বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত অথবা কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত পড়েছেন, তাঁরা জানেন চৈতন্যদেব একটি মানুষই ছিলেন। চৈতন্য জীবনীকারেরা সকলেই যেমন চৈতন্যের মানবিক আচার-ব্যবহারগুলি বর্ণনা করেছেন, তেমনি সে বর্ণনায় মাঝে মাঝেই তাঁর জীবনধারায় এসেছে অতিপ্রাকৃত ঈশ্বরের আবেশ। আপনি পাঠক হিসেবে চৈতন্যের ঈশ্বরলীলা অবিশ্বাস করতে পারেন কিন্তু আপনি কি চৈতন্যভাগবত কিংবা চৈতন্যচরিতামৃত থেকে এই অংশগুলি ছেঁটে ফেলে, যেখানে যেখানে শুধু চৈতন্যকে মানুষের মত বর্ণিত হতে দেখা যাচ্ছে, সেই অংশগুলিকে বৃন্দাবন দাস কিংবা কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা—এমন বলতে পারবেন ! পারবেন না। আমরা জানি গৌতম বুদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্তু যে সমস্ত গ্রন্থকার বুদ্ধকে শেষ পর্যন্ত ভগবান বানিয়ে ফেললেন, তাঁদের বিশ্বাসে আপনি অবিশ্বাস করতে পারেন কিন্তু তাঁদের লেখা থেকে দৈব উচ্ছ্বাসটুকু ছেঁটে দেবার অধিকার কি আমার আপনার আছে ?

যিনি রামায়ণ রচনা করেছিলেন, তিনি সাধারণ সমাজ-বিশ্বাসের বাইরের কোন ব্যক্তি নন। মূল কাণ্ডপঞ্চকে তিনি মূল রাম-কাহিনী ধরে রাখলেও, সময়ে সময়ে তাই তাঁকে সমাজ-বিশ্বাসের কথা, রামচন্দ্র সম্বন্ধে সাধারণের অনুভূতির কথা মাঝেই মাঝেই ঢুকিয়ে দিতে হয়েছে, তা আপাততঃ শুনতে 'অ্যাব্রাপ্ট' লাগে, প্রসঙ্গের বাইরে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। এই সাধারণ্যের কথা মনে রেখেই তাঁকে আদিকাণ্ডে রামকথার প্রস্তাবনা করতে হয়েছে এবং উত্তরকাণ্ডে তাঁর দেবায়ন সম্পূর্ণ করতে হয়েছে—এও তো হতে পারে। বিশেষতঃ তথাকথিত মূল কাণ্ড পঞ্চকের মধ্যেও আদর্শ পুরুষ হিসেবে রামের কল্পনা, ধর্মের তত্ত্ব এবং তথ্য, দৈব সংবাদ এমন কিছু কম নয়, যা অন্ততঃ একজন অবতার পুরুষের থেকে কম বলে মনে হয়। ভারতবর্ষের ধর্মীয় এবং দার্শনিক বিবর্তনের ইতিহাস ঘাঁটলে পরে এমন দু-চারজন পুরুষকে আমরা অবশ্যই দেখতে পাব যাঁদের মনুষ্যজীবন মহত্ত্ব এবং অতিপ্রাকৃত মাহাত্ম্যে আকীর্ণ। কিন্তু যাঁরা এই সব ঐশ জীবনের রূপকার তাঁদের কি এই বলে দূষতে পারি যে, তাঁদের লেখার মধ্যে যখনই এই সব মানুষের দেবায়ন ঘটেছে সেই অংশগুলি তাঁদের লেখা নয়, অন্য কোন পরবর্তী কবির লেখা। আমাদের ধারণা রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাংশ ছেঁটে ফেলে তাদের একটা 'কম্প্যাক্ট' রূপ দেওয়ার তাগিদ যদি থাকে, তাহলে আরও বড় কোন মাপকাঠি দরকার। পণ্ডিতেরা অবশ্য আরও অনেক রকম যুক্তিজাল বিস্তার করে রামায়ণের দুটি কাণ্ড ছেঁটে ফেলেছেন এবং দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, মহাভারতের মধ্যে যে রামোপাখ্যান আছে তার একটা বড় অবদান আছে বর্তমান রামায়ণের পরিকল্পনায়। মহাভারতের মধ্যে রামকে প্রথমেই বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকার করা হয়েছে—বিষ্ণু মানুষরূপেণ—এবং আরও কতক জায়গায় রামচন্দ্রকে বিষ্ণুই বলা হয়েছে। পণ্ডিতদের ধারণা অতএব রামায়ণের অবতারবাদ মহাভারত থেকে ধার করা। কিন্তু তাঁরা এটা বলবেন না যে, রামায়ণের আদি কাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ডেই যেহেতু রামের বিষ্ণু বলে প্রতিষ্ঠা, তাই মহাভারতকারও তো সেই তথ্যে প্ররোচিত হতে পারেন যার জন্যে রামকে বিষ্ণু বলেই তিনি কথারম্ভ করেছেন এবং রামচরিত্রের অবশিষ্ট বর্ণনা করেছেন মানুষের মতই, যা রামায়ণেরও বৈশিষ্ট্য। আমি পণ্ডিতদের সঙ্গে বেশি তর্কাতর্কি করব না, কেননা তার শেষ নেই। কিন্তু কি কি ভিত্তিতে তাঁরা বাল্মীকি রামায়ণকে ছেঁটেছুঁটে মনের মত করে তৈরী করেছেন তার একটু দিক্ নির্দেশ করব। এই অংশে আমরা প্রধানতঃ মহাপণ্ডিত কালীকুমার দত্তের আপত্তিগুলি নথিভুক্ত করব, কেননা তিনি দেশীবিদেশী সমস্ত পণ্ডিতদের মতই একত্র সংকলিত

করেছেন।

প্রথম কথা, রামায়ণ মহাকাব্যে সূচীপত্র গোছের দুটি জিনিস আছে। একটি আছে সেই যখন নারদ মুনি বাল্মীকির কাছে রামের জীবনী সংক্ষেপে বলেছিলেন, যাকে 'সংক্ষেপ রামায়ণ' বলা হয়। আরেকটি সূচীপত্র আছে আদিকাণ্ডেরই তৃতীয় সর্গে। নারদের বলা সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বালকাণ্ডের কোন ঘটনার উল্লেখ নেই এবং দোষ কাটাবার জন্যই দ্বিতীয় সূচীপত্র জোড়া হয়েছে বলে পণ্ডিতদের ধারণা।

দ্বিতীয়তঃ বালকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ডের বাচনশৈলীতে অনেক মিল আছে যা রামায়ণের অন্য কাণ্ডগুলির সঙ্গে মেলে না। অতএব এই কাণ্ডদুটিকে পরবর্তী বলতে হবে।

তৃতীয়তঃ বালকাণ্ডে বর্ণিত অনেক ঘটনার সঙ্গেই মূল কাণ্ডপঞ্চকের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। অতএব বালকাণ্ড পরে লেখা। সগর রাজার কাহিনী, সমুদ্র-মন্থন, বিশ্বামিত্রের জীবনকথা এসব রামায়ণে থাকা চলবে না, কারণ এগুলি পৌরাণিক কায়দায় রামায়ণের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এটা নাকি মহাভারতের প্রভাবও হতে পারে। কিন্তু উল্টোটা নৈব নৈব।

চতুর্থতঃ কবি বাল্মীকির কবি হওয়ার অনর্থও আছে। তিনি বালকাণ্ডে লক্ষ্মণের সঙ্গে উর্মিলা সুন্দরীর বিয়ে দিয়েছেন, অথচ অরণ্যকাণ্ডে তিনি সামান্য রসিক হয়ে ওঠার ফলে রামের মুখ দিয়ে কামার্ত শূর্পনখাকে শুনিয়েছেন—দেখ বাপু আমি বিয়ে করে ফেলেছি, সামনেই এই ভার্যাও উপস্থিত। কিন্তু আমার অনুজ লক্ষ্মণ ইনি বিয়ে করেননি—শ্রীমান্ অকৃতদারশ্চ লক্ষ্মণো নাম বীর্যবান্। আমার ভাই বিয়েও করতে চান অতএব—এনং ভজ বিশালাক্ষি—তোমাদের দুজনে মানাবেও ভাল।

বাল্মীকির অন্যায় হল, তিনি কবি। যত ইচ্ছে কবিত্ব করুন, আবার রসিকতা কেন ? তাঁর বোঝা উচিত ছিল, তিনি যে এই সর্গের আরম্ভেই রামকে খানিকটা হাসিয়ে নিয়ে কথা বলাতে আরম্ভ করেছেন—স্মিতপূর্বম্ অথাব্রবীৎ—এই স্মিতহাস্যের তাৎপর্য গবেষকের কঠিন মনোভূমিতে রসিকতা হিসেবে ধরা দেয় না, ভুল হিসেবে ধরা দেয়।

বাল্মীকির উত্তরকাণ্ড নিয়েও কতগুলি মোটা দাগের প্রশ্ন গবেষক মহলে আলোড়ন তোলে। ভারতবর্ষে রামায়ণ সম্বন্ধে তিন ধরনের বিশিষ্ট পাঠ পাওয়া যায়—বঙ্গীয়, দক্ষিণী এবং উত্তুরে। পণ্ডিতেরা পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, তথাকথিত মূল কাণ্ডগুলির মধ্যে যে শ্লোকগুলি পাওয়া যায়, রামায়ণের

উত্তুরে এবং দক্ষিণী সংস্করণে তা নিয়ে বিস্তর পার্থক্য আছে—পাঠভেদ, ক্রমভেদ সব ব্যাপারেই। কিন্তু উত্তরকাণ্ড নিয়ে উত্তর এবং দক্ষিণে প্রায় বিবাদ নেই। অতএব পণ্ডিতদের ধারণা, উত্তরকাণ্ড লেখা হয়েছিল অনেক পরে এবং তা প্রায় অবিকৃতভাবেই উত্তর এবং দক্ষিণের পাণ্ডুলিপিগুলিতে সংযোজিত হয়ে গিয়েছিল। মজা হল, লিপিতে লিপিতে গরমিল যেমন সিদ্ধান্তের প্রতিকূলতা তৈরী করে, তেমনি লিপিতে লিপিতে মিলও অনেক সময় অনর্থ ঘটায় এবং এক্ষেত্রে সেই অনর্থই ঘটেছে।

দ্বিতীয়তঃ মহাভারতকার তাঁর রামোপাখ্যানে উত্তরকাণ্ডের ঘটনাগুলি নাকি প্রায় একটুও উল্লেখ করেননি। অতএব উত্তরকাণ্ড মহাভারতের রামোপাখ্যানের থেকেও অবচিন। আমরা বলি মহাভারতে উল্লিখিত হলেই কি প্রাচীনতা স্বীকার করি আমরা—অন্ততঃ মহাভারতের থেকে প্রাচীনতা? তাহলে বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র—এ কথাটি রামায়ণের অন্য কাণ্ডগুলির মত প্রাচীনতার দাবী করতে পারবে? নাকি সেখানে যুক্তি নিশ্চয়ই হবে অন্যকিছু? কিন্তু মহাভারতের রামোপাখ্যানের মধ্যে তো রাবণের বংশ পরিচয়, তাঁর পুষ্পক রথ অধিগ্রহণ—এসব তো আছে, যা একান্তভাবেই রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পরিসর। আর উত্তরকাণ্ডের সব ঘটনা তো আর ওইটুকু রামোপাখ্যানের মধ্যে আমূলান্ত বলা সম্ভব নয়, কেননা আখ্যানটি মূল রামায়ণের সংক্ষিপ্তসার। তাছাড়া তথাকথিত মূল পাঁচ কাণ্ডের কাছে যে বিষয় অত্যন্ত অপেক্ষিত ছিল, সেই রাবণ কুম্ভকর্ণ ইত্যাদির বংশ পরিচয়, তাঁদের তপস্যা, বরলাভ—এই সব কিছুই কিন্তু মহাভারতের রামোপাখ্যানে একেবারে প্রথমেই অবতারণা করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত হলেও এর তাৎপর্য পণ্ডিতদের চোখ এড়িয়ে যাবার কথা নয় এবং সেই সুবাদে এমন কথাও চলে না যে উত্তরকাণ্ডের কোন কথাই মহাভারতকারের জানা ছিল না। হ্যাঁ, রামোপাখ্যানে অযোধ্যায় সীতার চরিত্রে কলঙ্ক নেই, তাঁর বিসর্জনও নেই, পাতাল প্রবেশও নেই। কিন্তু মহাভারতকারের বিপদটাও চিন্তা করুন। একে তাঁকে গল্পের মধ্যে গল্প বলতে হয়, তাতে প্রসঙ্গ কেবলই যায় হারিয়ে; তার মধ্যেও 'টু দ্য পয়েন্ট অ্যানসার' ব্যাপারটা তাঁর জানা ছিল, যার জন্যে রাম-সীতার মিলন দেখিয়েই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন। মহাভারতে রামের উপাখ্যান বলেছেন মার্কণ্ডেয় মুনি এবং যে প্রসঙ্গে এই গল্প এসেছে তা হল—বনের মধ্যে যখন দুর্যোধনের জামাইবাবু জয়দ্রথ মহাশয় দ্রৌপদীকে হরণ করেছিল; পাণ্ডবেরা জয়দ্রথকে রাস্তার মধ্যে প্রায় ধরে ফেলেন এবং ভয়ে দুষ্কৃতকারী পালিয়ে যায়। এই অবস্থায় যুধিষ্ঠির ভূত-ভবিষ্যৎ-জানা মার্কণ্ডেয় মুনিকে প্রশ্ন করেন যে, তাঁর

মত হতভাগ্য আর দ্বিতীয় কে আছে, বনবাসকালে যার স্ত্রীকেও অবিতর্কিতভাবে শত্রুপক্ষ হরণ করে ! এই প্রশ্নের পেছনে তাঁর একটা সংশয়ও ছিল । মার্কণ্ডেয়কে প্রশ্ন করার সময় যুধিষ্ঠির সোজাসুজি বলেন—কৃষ্ণা দ্রুপদ রাজার মেয়ে, যজ্ঞের বেদি থেকে তার জন্ম । সে অযোনি সম্ভবা এবং পাণ্ডবদের সহধর্মিণী । ধর্ম কাকে বলে দ্রৌপদী তা জানেন এবং ধর্মের আচরণও করেন । এইরকম যে আমাদের পত্নী, তাকেও অন্যলোকে চুরি করতে গিয়ে স্পর্শ করল ! দ্রৌপদী কোন পাপ তো করেনি কোন গর্হিত কাজও তো করেনি, ব্রাহ্মণদের প্রতিও সে চিরকাল ধর্ম ব্যবহার করেছে । তবু কেন এমন হল ?

> দ্রুপদস্য সুতা হ্যেষা বেদিমধ্যাৎ সমুত্থিতা ।
> অযোনিজা মহাভাগা স্নুষা পাণ্ডো র্মহাত্মনঃ ॥
> ইমাং হি পত্নীমস্মাকং ধর্মজ্ঞাং ধর্মচারিণীম্ ।
> সংস্পৃশেদীদৃশো ভাবঃ শুচিং স্তৈন্যমিবানৃতম্ ॥
> ন হি পাপং কৃতং কিঞ্চিৎ কর্ম বা নিন্দিতং কচিৎ ।
> দ্রৌপদ্যা ব্রাহ্মণেষ্বেব ধর্মঃ সুচরিতো মহান্ ॥
> তা জহার বলাদ্ রাজা···

প্রশ্ন যতটুকু তার জবাবও ততটুকু । যুধিষ্ঠিরের মনে দ্রৌপদীর সম্বন্ধে পাপ এবং নিন্দার সংশয় জেগেছে, মার্কণ্ডেয় তাঁর জবাবে রামের সংশয় উল্লেখ করেছেন । পরগৃহবাসিনী সীতাকে রামের মনে হয়েছে কুকুরে-চাটা ঘিয়ের মত । তিনি তাঁকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারছিলেন না । তারপর বায়ু, অগ্নি, বরুণ, ব্রহ্মা, সবাই মিলে সীতার স্বপক্ষে সাক্ষী দিলেন । রাম সন্দেহ মুক্ত হলেন । দুজনের মিলন হল । এর বেশি তো এই প্রসঙ্গে বলার দরকার নেই । অযোধ্যায় গিয়ে কি হল না হল, সেই ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নও নেই, তার জবাবও নেই । কিন্তু যারা বলেন মহাভারতকার বালকাণ্ড, উত্তরকাণ্ডের কথা কিছুই জানতেন না তাঁরা আরও কথা মনে রাখতে পারেন । যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে 'অযোনিজা', 'বেদিমধ্যাৎ সমুত্থিতা'—এত সব বিশেষণ লাগিয়েই কথারম্ভ করেছিলেন । উত্তরে এইটাই অপেক্ষিত যে, মার্কণ্ডেয় এমন বধূ হরণের কথাই বলবেন যে বধূ অযোনিজা কিংবা অলৌকিক উপায়ে যার জন্ম হয়েছে । হ্যাঁ সীতা যোনিজা, না অযোনিজা সেই নিয়ে আমার ব্যক্তিগত কোন মাথাব্যথা নেই । কিন্তু মহাভারতকার সব কিছু অতি সংক্ষেপে বললেও রামায়ণের বালকাণ্ডে সীতার অলৌকিক উৎপত্তি-কথা যে মাথায় রেখেছিলেন তার প্রমাণ তো আছে । একে

তো যুধিষ্ঠিরের স্বগত সংবাদেই এই বিষয়ের পরোক্ষ সমর্থন আছে, তার ওপরে সীতার সঙ্গে রামের বিবাহ সংবাদে মার্কণ্ডেয় বললেন—সীতা বিদেহরাজ জনকের মেয়ে কিন্তু স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁকে রামের প্রিয়া মহিষী করে দেন—বিদেহরাজো জনকঃ সীতা তস্যাত্মজা বিভো। যং চকার স্বয়ং ত্বষ্টা রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্ ॥

ত্বষ্টা ব্রহ্মা। কেন, তিনি কেন ? বললেই হত রামের সঙ্গে সীতার বিয়ে হয়েছিল। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখলেন—ত্বষ্টা প্রজাপতি স্বয়ং এই বিবাহের সংকল্প করেছিলেন, সীতা তাই মৈথুনজাতা কোন কন্যা নন, তিনি অযোনিজা—ত্বষ্টা প্রজাপতিঃ স্বয়মেব সঙ্কল্পেন চকার, ন তু মৈথুনদ্বারা, অযোনিজাম্ ইত্যর্থ।

ধরে নিলাম নীলকণ্ঠ অনেক পরের লোক, তিনি বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন, তাই সীতাকে 'অযোনিজা' বলেছেন। কিন্তু মহাভারতকার স্পষ্টতঃই যুধিষ্ঠিরের দ্রৌপদী ভাবনার অনুরূপ উদাহরণ দিতে গিয়েই যে সীতাকে ত্বষ্টা প্রজাপতির সঙ্কল্পিতা বধূটি বানিয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যাঁরা বলেন মহাভারতকার বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যার রাজধানীতে রামের হাতে সীতা-বিসর্জন কিংবা পাতাল প্রবেশের কথা জানতেন না, তাঁরা যেন রামোপাখ্যানের শেষ অধ্যায়টিই খেয়াল করেন। না, মহাভারতকার এ সব বর্ণনা করেননি, তার প্রসঙ্গও ছিল না, শুধুমাত্র লঙ্কাযুদ্ধের পর বাল্মীকি রামায়ণে যেমনটি সীতা-প্রত্যাখ্যান আছে, মহাভারতেও তাই আছে। রামচন্দ্র এতকাল রাবণের গৃহে-থাকা সীতাকে সহজে স্বীকার করলেন না কিন্তু এই অস্বীকার, অসম্মানের পর সীতা যে ভাষায় কথা বলে উঠলেন, সেই ভাষা, সেই শৈলী কিন্তু মহাভারতের কবির বড় চেনা, এই বিলাপ তিনি আগেও যেন শুনেছেন। বাল্মীকি রামায়ণে প্রত্যাখ্যাতা সীতা ক্রুদ্ধা হয়েছিলেন কিন্তু মহাভারতে তিনি তা নন। ভাষা-শৈলীকে আমি সাহিত্যবিচারের সবচেয়ে বড় মাপকাঠি মনে করি না, কেন করি না তা পরে বলব, কিন্তু মহাভারতে অতি সংক্ষিপ্ত রামোপাখ্যানের মধ্যে অন্ততঃ এই জায়গাটায় ভাষা-শৈলীকে একবারের মত প্রণিধান করতেই হবে। রামায়ণ মহাকাব্যে সীতার পাতাল-প্রবেশের সময় সীতারই জবানীতে কতগুলি মর্মস্পর্শী বিলাপোক্তি আছে। এই শ্লোকগুলির মধ্যে রামের প্রতি সীতা কতখানি একনিষ্ঠ তার দৃঢ় প্রত্যয় যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি সীতার কথা যদি রাম মৃষা বিশ্বাস না করেন, তাহলে 'ধরণী দ্বিধা হও'—এই ধ্রুপদে বাঁধা পড়েছে চরম করুণ

এই শ্লোকগুলি। সীতা একবার তাঁর পতি-নিষ্ঠতার কথা বলেন, আর দ্বিতীয় চরণে নিজেকে অভিশাপ দেন—তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি—যদি এই নিষ্ঠা সত্যি না হয় তাহলে সর্বংসহা ধরিত্রীও যেন বিদীর্ণ হয়। তাই হয়েছে, অবিশ্বাসীর প্রত্যয় হওয়ার আগেই ধরিত্রী তাঁকে শান্ত আশ্রয় দিয়েছেন।

সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ এই শ্লোকগুলি যে অবশ্যই ব্যাসের অন্তর্হৃদয়ে ক্রিয়া করেছে সে বিষয়ে একটা ছোট্ট প্রমাণ উপস্থিত করা যেতে পারে। ব্যাস জানতেন—তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ প্রসঙ্গহীনভাবে সীতার পাতাল প্রবেশের কথা উল্লেখ করা সম্ভব হবে না। অথচ এইখানে বাল্মীকির সীতার বিলাপোক্তিগুলির মর্মভাব যদি অপ্রকাশিতই থেকে যায় তাহলে স্বয়ং ব্যাসের পাঠককুল হবেন বঞ্চিত। ব্যাসদেব তাই বাল্মীকির পরের লেখার ভাবটুকু আগে নিয়ে এসেছেন। মহাভারতের রামোপাখ্যানে সীতার পক্ষে তাঁর রাম-নিষ্ঠা জানানোর সময় এসেছে—রাবণবধের পর। তিনি যখন প্রত্যাখ্যাতা হয়েছেন সেই তখন। মহাভারতকার কিন্তু এই সুযোগ ছাড়েননি। বাল্মীকির ধ্রুবপদ তিনি ব্যবহার করেননি, কিন্তু একই ভাবে দ্বিতীয় চরণে একবার পবন-দেবতা, একবার অগ্নি, একবার ভূলোক-দ্যুলোককে সাক্ষী মেনে তিনিও সীতা-বিলাপের নতুন ধ্রুবপদ বেঁধে দিয়েছেন—স মে বিমুঞ্চতু প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্—যদি আমি কোন পাপ করে থাকি তবে অগ্নি, বায়ু, আকাশ, জল অথবা পৃথিবীই আমার প্রাণ-বিয়োগ করুন। এই ধ্রুবপদের থেকেও যে পংক্তিটা ব্যাসের হৃদয়ে বাল্মীকির ছায়া ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে, তা হল সীতার সেই প্রতিজ্ঞা। রামায়ণে সীতা বলেছিলেন—'রাম ছাড়া যদি অন্য কারও কথা মনে মনেও না ভেবে থাকি—যথাহং রাঘবাদ্ অন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে—তাহলে দ্বিধা হোক ধরণী। মহাভারতকার বাল্মীকির শব্দ একটু আধটু ওলট পালট করে লিখেছেন—বীর! তোমার ছাড়া যদি অন্য কারও কথা স্বপ্নেও না ভেবে থাকি—যথাহং তদ্ঋতে বীর নান্যং স্বপ্নেঽপ্যচিন্তয়ম্—তাহলে তুমিই আমার চিরনিরূপিত পতি হও। বাল্মীকির পংক্তি আর ব্যাসের পংক্তিতে ভাবগত পার্থক্য তো নেইই, এমনকি শব্দ-ব্যবহারেও আশ্চর্য মিল আছে। তবুও কি আমরা বলব রামায়ণের উত্তরকাণ্ড থেকে কিছুই গ্রহণ করেননি ব্যাস, নাকি উত্তরকাণ্ডের খবরও তাঁর জানা ছিল না।

যাঁরা উত্তরকাণ্ডের ভাষার আঁটোসাঁটো বাঁধুনি দেখে 'অরনেট্ স্টাইল'-এর যুক্তিতে বাল্মীকির রচনার এই সব অংশে পরবর্তিতার আভাস দেখতে পান, তাঁদেরকে জানাই এইরকম পুনরাবৃত্ত পংক্তি-ব্যবহার, এইরকম 'অরনেট স্টাইল'

বাল্মীকি রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড, সুন্দর-কাণ্ড এবং লঙ্কা-কাণ্ডেও যথেষ্ট আছে। ভাষা-শৈলীর যুক্তিতে সেগুলির মধ্যেও যদি আবার স্থূল-হস্তাবলেপ দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে বাল্মীকি রামায়ণ শূন্যে পর্যবসিত হবে। কাজেই ভাষা-যুক্তির কথা আমার আপাততঃ পরিহার্য বলেই মনে হয়।

পণ্ডিতেরা বলেছেন—উত্তরকাণ্ডের বর্ণনভঙ্গী নাকি পৌরাণিক। তার ওপরে উত্তরকাণ্ডে আছে সেই সব কথা-কাহিনী যার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগই নেই মূল কাণ্ড-পঞ্চকের সঙ্গে। নিমি, শ্বেত কিংবা যযাতির কাহিনীগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। উত্তরকাণ্ডে আছে বেদবতীর কাহিনী এবং সীতার জন্ম প্রসঙ্গেও সে কাহিনীর উল্লেখ নেই বলে পণ্ডিতেরা সম্পূর্ণ উত্তর-কাণ্ডকেই অভিযুক্ত করেছেন পরবর্তিতার দায়ে। এসব খুচরো অভিযোগ আমরা না হয় স্বীকার করেই নিলাম, কিন্তু তাই বলে সম্পূর্ণ উত্তরকাণ্ডই যে ভিন্ন মস্তিষ্কের স্থূল কল্পনা, সে কথা মানতে আমাদের আপত্তি আছে। এর ওপরেও কিছু উটকো বিপদ আছে। হেবার আর প্রিনজ্ সাহেব বলেছেন সীতার অগ্নি-পরীক্ষা ব্যাপারটা যদিও লঙ্কা-কাণ্ডেই আছে, তবুও ওটি নাকি রামায়ণ-রচনার প্রথম কিংবা মূল স্তরে ছিল না।

এ কথার যুক্তি কি ? না, উত্তরকাণ্ডে সীতার পাতাল-প্রবেশের পূর্বে বাল্মীকি যখন লব-কুশের হাত ধরে সীতাকে নিয়ে রামের সভায় উপস্থিত হলেন, তখন রাম তাঁকে বলেছিলেন—মুনিবর ! ইনি পূর্বেও দেবতাদের সামনে শপথ করে আমার প্রত্যয় উৎপাদন করেছিলেন বলেই, আমি এঁকে ঘরে তুলেছি—শপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা। রাম তো এই সময়ে মুনির কাছে সীতার অগ্নি পরীক্ষার কথা তোলেননি, অতএব অগ্নি-পরীক্ষার ব্যাপার মূল রামায়ণে ছিল না।

আমি মাঝে মাঝে ভাবি যে, এই সব পণ্ডিতেরা বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের যুক্তিবাদী মানুষের ওপর এই খেজো যুক্তিগুলি চাপিয়ে দিলেন কি উপায়ে ! এই সব পঞ্চানন পণ্ডিতেরা একমুখে উত্তরকাণ্ডকে বলবেন প্রক্ষিপ্ত, আবার আর এক মুখে তাঁদেরই বলা মূল কাণ্ডের একটি ঘটনা নস্যাৎ করার জন্য উত্তরকাণ্ডেরও একেবারে শেষ পর্যায়ের একটি অধ্যায়কে সাক্ষী মানবেন। নিজেদের প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য যেরকম সুবিধে, সেইরকম যুক্তি প্রয়োগ করেও যে পার পাওয়া যায়, তার কারণ তাঁরা এদেশী নন। এ সেই হেবার, যিনি বলেছিলেন রামায়ণের শম্বুক-কাহিনীর মূলে আছে করোমণ্ডল অঞ্চলে ক্রীশ্চান মিশনারীদের অভিবাসনের ঘটনা। এতটা বাড়াবাড়ি তাঁর জাতভাই প্রিনজ্

সাহেবই সহ্য করতে পারেননি। তিনি মহাভারত, পদ্মপুরাণ, রঘুবংশ, উত্তররামচরিত এবং অধ্যাত্ম-রামায়ণের প্রমাণে হ্বেবারের কথাগুলি উড়িয়ে দিয়েছেন।

বাদ-প্রতিবাদ, উদ্ভট মত উদ্ভাবন এবং আরও অনেক কিছুই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে হয়েছে, কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে দাঁড়িয়ে স্বাধীন দেশে বড় হয়েও যাঁরা এইসব উদ্ভট কথা বলেন এবং তথা 'হ্বেবার-হ্বেবার' বলে ধন্যধ্বনি দেন, তাঁদের শোধরানোর উপায় কি ?

বিশেষতঃ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যখন অভিজ্ঞের মত করে কথা বলেন, তখন বিপদ আরও বাড়ে। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি জার্মানি পণ্ডিতের মত উদ্ধার করে সাধারণ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—দেখ বাপু ডঃ হ্বেবার সাহেবের মত পণ্ডিত বলেছেন—যে, আমাদের রামায়ণ কাহিনীর সঙ্গে হোমারের ইলিয়াডের বড় মিল আছে। দুই মহাকাব্যেই এক দেশের রাজার স্ত্রীকে আরেক দেশের রাজা হরণ করেছে। যদিও হোমারের হেলেন হৃত হয়েছেন স্বেচ্ছায় আর সীতা বলযোগে। মিলল না। সমুদ্র পার হয়ে শত্রু রাজার রাজধানী অবরোধেও আছে মিল, যদিও একজন গেছেন জাহাজে, অন্যজন সেতুবন্ধন করে। লঙ্কার প্রাকারের বাইরে এবং ট্রয়ের প্রাকারের বাইরের যুদ্ধ আছে দুই মহাকাব্যেই। অতএব "রামায়ণ প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় পরিবেশে ইলিয়াডের ছায়া অবলম্বনে রচিত, হয়ত-বা কিছুটা ওডিসির ছায়াও পড়ে থাকতে পারে।" এবং ভুলিও না, "জামনীর বিশিষ্ট রামায়ণ-বিশেষজ্ঞ ডঃ অ্যালব্রেক্ট ওয়েবার এই মত পোষণ করতেন।" (দ্রঃ জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধ)

হ্বেবারের এই মত পণ্ডিত মহলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, এবং যিনি তাঁদের অন্যতম সেই কে. টি. তেলাং নাকি 'স্বদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ' হয়ে এই কাজ করেছেন। আমাদের বক্তব্য—'স্বদেশিকতা' কোন পাপ নয়, সভাগৃহে সমাজতান্ত্রিকতাও পাপ নয়, পাপ হল বিষয়ানভিজ্ঞতা, সাহেব বললেই ঠিক মনে হয় এবং সাহেবের মত প্রত্যাখ্যাত হলেই 'স্বদেশিকতা' মনে হয়। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে প্রামাণ্য হল মাল্লাদী ভেঙ্কটরত্নম, যাঁর দুখণ্ড বই পড়লে মনে হয় 'রাম ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মিশরের সবচেয়ে বিখ্যাত ফ্যারাও দ্বিতীয় র‍্যামেসিস, সীতা ছিলেন ইখনাতোনের ভগ্নী সীতামন, আর রাবণ ছিলেন একজন হিটাইট রাজা।" অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে প্রামাণ্য হন নীরদ চৌধুরী, যিনি কয়-লাইনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আদিতে পশ্চিম এশিয়ার কোন যুদ্ধকাহিনী পরবর্তীকালে আর্যদের রামায়ণী কথার রূপ ধারণ করেছে। আর নীরদ চৌধুরীমশাই বললে

অনভিজ্ঞের সংকল্প জন্মায়—'এরকম কোন কারণ থাকা অসম্ভব নয়।'

পাঠকমশাই! আমাকে যদি মিল দেখাতে বলেন, তাহলে ওদেশের কাব্য-মহাকাব্যের সঙ্গে এদেশের কাব্য-মহাকাব্যের-এমন মিল দেখাতে পারি, যাতে মনে হবে কালিদাস সেকস্‌পীয়র থেকে টুকেছেন, কীটস্-ব্রাউনিং রবীন্দ্রনাথ থেকে টুকেছেন, পাণিনি-ভর্তৃহরি চমস্কির তত্ত্ব মেরে দিয়েছেন আর অভিনবগুপ্ত আই এ রিচার্ডসের যোগ্য উত্তরাধিকারী। বলা বাহুল্য আমি আপাততঃ এই উল্টোরথে টান দেব না, তার থেকে রামায়ণ-গবেষণার কিছু মূল্যবান তথ্য এ প্রসঙ্গে অবতারণা করার চেষ্টা করব।

অধিকাংশ পণ্ডিতের মত মানতে গেলে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে রামায়ণের আদিকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড দুটিই প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু প্রক্ষিপ্ত হলে হবে কি, পরবর্তী কালের ধর্ম-ধারণায় এবং সাহিত্য-কৃষ্টিতে—এই দুই কাণ্ডেরই এক উত্তরাধিকার আছে, যে উত্তরাধিকার একেবারেই ফেলনা নয়। ফেলনা না হওয়ার আরও একটি বড় কারণ আছে। এন. জে. শেণ্ডে লিখেছিলেন যে, রামায়ণ কাহিনীতে ভৃগু-অঙ্গিরস নামক ব্রাহ্মণ পরিবারের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে এবং এই ভৃগু-অঙ্গিরস-গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা, যাঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পোষক ছিলেন, এঁরাই মূল পঞ্চ-কাণ্ড রামায়ণকে সপ্তকাণ্ডে ব্রাহ্মণায়িত করেন। অবতারবাদ, চাতুর্বর্ণ্য-বিধানের কড়াকড়ি—যা নাকি রামায়ণের মূল কাণ্ড-পঞ্চকের মধ্যে খুব বেশি লক্ষ্যণীয় নয়, এ সব কিছুই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে রামায়ণের বালকাণ্ডে এবং উত্তরকাণ্ডে। আর্যসমাজের প্রাথমিক অবস্থায় যজ্ঞ, হোম, তপশ্চর্যা—এগুলিই ছিল ব্রাহ্মণ্যের অভিব্যক্তি। সে সমাজে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়েই পশুমাংসের রসাস্বাদ ভাল করেই জানত। বানররাজ বালিকে মারার পর তিনি রামকে বলেছিলেন—আমাকে মেরে তোমার কি লাভ হল বল। আমার মাংসও তোমার খাওয়া চলবে না। কারণ, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়েরা একযোগে যে পাঁচনখওয়ালা প্রাণীর মাংসগুলো খায়, তা হল শজারু, গণ্ডার, গোসাপ, খরগোশ আর কচ্ছপের মাংস—পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘব। শল্যকঃ শ্বাবিধো গোধা শশঃ কূর্মশ্চ পঞ্চমঃ ॥

পরবর্তীকালে ভীষ্মের কাছে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে আমিষ মেনুতে অনেক মাংসই বাদ পড়ে গেছে, আর পুরাণে ইতিহাসে ব্রাহ্মণেরা, ঋষিরা প্রায়ই পরিচিত হয়েছেন ফলমূলাহারী বলে। কিন্তু রামায়ণসমাজের প্রথম বিকাশে এমন ব্যাপার আদৌ ছিল না। ভরদ্বাজ মুনির তো শুচি-বাই বলতে কিছু ছিল না। বনের পথে ভরত এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীর জন্য মদ-মাংসের এমন বিপুল সম্ভার তিনি রচনা

করেছিলেন যে একমাত্র ভরত ছাড়া তাঁর সমস্ত সৈন্যই বলতে থাকল—সুখে থাকুন ভরত, কিন্তু অযোধ্যায় আর ফিরে যাচ্ছি না, সুখে থাকুন আমাদের রামচন্দ্র, কিন্তু তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা দণ্ডক বনেও যাব না—নৈবাযোধ্যাং গমিষ্যামো ন গমিষ্যামো দণ্ডকান্। ভাবুন তো কি পরিবেশ—মুনির আশ্রম। আর স্বয়ং মুনিই পরিবেশন করছেন—সুরাদীনি চ পেয়ানি মাংসানি বিবিধানি চ। আপনি ভাবতে পারেন—এই খরগোশ, গোসাপ—এ সব কি খাওয়া যায়! মুনির মেনুতে কি আজকের দিনের মত কিছুই নেই! ঋষি ভরদ্বাজকে ভুল বুঝবেন না। ব্রাহ্মণের পক্ষে খরগোশ, কচ্ছপ—এ সবের বাইরে হয়তো মাংস খাওয়া চালু ছিল না, কিন্তু পাবলিক ক্ষত্রিয়ের জন্যে ভরদ্বাজের যথেষ্ট চিন্তা ছিল। পাঁঠা তো ছিলই। ছিল মাটন এবং হ্যাম, এবং তা আবার গন্ধরস সমন্বিত—আজৈশ্চাবিকবারাহৈঃ/সূপৈ গন্ধরসান্বিতৈঃ। আবার পিঠর-পাকে উত্তপ্ত হরিণ, ময়ূর আর মুর্গীর রোষ্ট—এমন উপাদেয় ব্যবস্থা ভরদ্বাজ করেছিলেন তপোবলে—প্রতপ্তপৈঠরৈশ্চাপি মার্গমায়ূরকৌক্কুটৈঃ। নিজে না খেলে কি হয়, জনগণের 'টেস্ট' তিনি জানতেন এবং এই সব মদ্য-মাংস্যের ব্যবস্থা করার জন্য তপোবল খাটালেও সেটা তাঁর কাছে অপব্যবহার বলে মনে হয়নি। আসল কথা জনগণের 'টেস্ট' তিনি জানবেন না কেন? মুনি হলেও রাজবাড়িতে কি হচ্ছে, সে খবর তাঁরা সবসময়ই রাখতেন। রামচন্দ্র যখন যে মুনির আশ্রমে গেছেন, সেইখানেই শুনেছেন যে, মুনি তাঁর বনবাসের খবর পূর্বাহ্ণেই জানেন। এর কারণ যতখানি তপোবল, তার থেকেও বেশি জনসংযোগ। রাজাদের সঙ্গে মেশামিশিও তাঁদের কম ছিল না। অনেক ব্রাহ্মণ-মুনিই তপস্যা এবং চতুর্বেদের সঙ্গে ধনুর্বেদের চর্চাও ভালই রপ্ত করতেন। মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে রাক্ষসেরা উৎপাত করার কোন সাহস পেত না। কারণ এ মুনি মাংস-খাওয়া শক্তিধর মুনি। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণেও যে মাংস খাওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল, সে প্রমাণও তো আছে। কিন্তু মাংস-খাওয়ার থেকেও আরও বড় পরিচয়ই অনেক মুনির ছিল এবং তা হল দরকারে অস্ত্রধারণ। আমি মহাভারতের দ্রোণাচার্যের মত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বীরের কথা বলছি না। কিংবা বলছি না রামায়ণের পরশুরামের কথা, কেননা পরশুরামের কথা উঠলেই পণ্ডিতেরা বলবেন—এ হল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের স্বাধিকার-দ্বন্দ্বের প্রতিফলন, যাতে ব্রাহ্মণ পরশুরামকে ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একেবারে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এও তো বালকাণ্ডের কথা—এবং তার মানেই প্রক্ষিপ্ত, পরবর্তী। ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-লাভও একই

বিশ্লেষণের পরিসর, এবং তাও বালকাণ্ডেই। মূল কাণ্ড-পঞ্চকের মধ্যে কিন্তু ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের ব্যবহারে আপাত কোন বিরোধ নেই। বরঞ্চ যা আছে, তা হল শাস্ত্র এবং অস্ত্রের তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মহাভারতের ব্রাহ্মণ গুরু দ্রোণাচার্যের প্রতিরূপ রামায়ণেও আছে। অস্ত্র-শাস্ত্রের পারদর্শিতা তাঁর এমনই যে, সেই ব্রাহ্মণগুরুর নামই ছিল সুধন্বা। বনবাসের মাঝখানে হঠাৎ যখন রাম ভরতকে দেখলেন, তখন প্রায় চমকে উঠে অযোধ্যা রাজ্যের নানা বিষয়ে অমঙ্গলাশঙ্কী হয়ে ভরতকে নানা প্রশ্নে উদ্বেল করে তুললেন। দশরথ, গুরু বশিষ্ঠ, জননী কৌশল্যা—এঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করেই, ভরতকে কোন উত্তর দেবার অবসর না দিয়েই রামচন্দ্র ভেবে বসলেন—ভরত কোন পূজ্য স্থানে অন্যায় করে ফেলেছেন হয়তো। কাজেই পুরোহিতের কথা জিজ্ঞাসা করলেন রাম, জিজ্ঞাসা করলেন যিনি অগ্নিহোত্র নিষ্পাদন করেন তাঁর কথাও। কিন্তু এর পরেই যাঁর প্রসঙ্গ এল, তিনি সেই সুধন্বা। রাম বললেন—ভরত ! যিনি মন্ত্র সহযোগে এবং মন্ত্র না পড়ে—দুভাবেই বাণপ্রয়োগে নিপুণ, যিনি রাজনীতিজ্ঞ এবং আমাদের ধনুর্বেদের আচার্য, সেই সুধন্বাকে তুমি মান্য-গণ্য কর তো ?—ইষ্বস্ত্রবরসম্পন্নম্ অর্থশাস্ত্রবিশারদম্। সুধন্বানমুপাধ্যায়ং কচ্চিৎ ত্বং তাত মন্যসে ॥

রামায়ণে অবশ্য ভাল করে বলা নেই ইনি ব্রাহ্মণই কিনা, কিন্তু ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয় প্রশ্নভাগেই সুধন্বার নাম পড়ায় পণ্ডিতেরা তাঁকে ক্ষত্রিয়বৃত্তি ব্রাহ্মণ বলেই মনে করেন। তাছাড়া আরও একটি কথা আছে। ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে সরাসরি অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় ব্রাহ্মণেরা হয়তো সামিল ছিলেন না, কিন্তু আজকের দিনের মত তাঁদের আরণ্য পর্ণ কুটিরে পুলিশী তল্লাসী চললে তাজা কার্তুজের বদলে তাজা বাণ অবশ্যই পাওয়া যেত। নইলে মুনির আশ্রমে গেছেন রামচন্দ্র, ঋষিরা কোথায় আতিথেয়তা করবেন ফল-মূল দিয়ে, নইলে নিদেন পক্ষে শাস্ত্রবাণীর সুনৃত উপদেশে—সেখানে মহামুনি সুতীক্ষ্ণ রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে দিলেন দুখানি উত্তম তূণ, দুটি ধনুক এবং দুটি খড়্গ, যাতে মরচে দাগ পর্যন্ত নেই, নির্মল। অস্ত্রগুলি তিনি দিলেন সীতার হাত দিয়ে—ততঃ শুভতরে তূণী ধনুষী চায়তেক্ষণা। দদৌ সীতা তয়োর্ভ্রাত্রোঃ খড়্গৌ চ বিমলৌ ততঃ ॥ মুনির আজ্ঞায়—অনুজ্ঞাতৌ মহর্ষিণা—রাম লক্ষ্মণ দুজনেই ধনুক-বাণ আর খড়্গে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন দণ্ডকারণ্যের পথে। আমাদের জিজ্ঞাসা, মুনির আশ্রমে এ সব অস্ত্র-শস্ত্র কেন ? সুতীক্ষ্ণ মুনি নিজেই কবুল করেছেন যে, তাঁর আশ্রমে রাক্ষসেরা হামলা করে না। শুধুমাত্র শত শত নির্ভয় হরিণের উপদ্রব ছাড়া তাঁর আশ্রম চত্বরে আর কোন উপদ্রবই নেই। তবু এসব অস্ত্র তাঁর ঘর

থেকে বেরোল কেন ? নিশ্চয় তিনি এর ব্যবহার ভালই জানতেন, অথবা পূর্বে এসব ব্যবহার করেওছেন, এবং সেই কারণেই হয়তো তাঁর আশ্রমে রাক্ষসেরা পা রাখার সাহস করত না। অথচ অন্যান্য মুনিরা, এই সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে আসার একটুখানি আগেই তো রামের কাছে আর্জি পেশ করছিলেন যাতে তিনি রাক্ষসদের উৎপীড়ন থেকে মুনিদের রক্ষা করেন—পরিপালয় নঃ সর্বান্ রাক্ষসেভ্যো নৃপাত্মজ। অগস্ত্য ঋষি অরণ্যজাত দ্রব্যগুলি রামকে নিবেদন করার পর যে অমূল্য উপহার রামকে দিয়েছিলেন তা হল বিশ্বকর্মার তৈরী সোনায় মোড়া আর বজ্রমণি খোদাই করা একখানি ধনুক, একটি সোনার হাতলওয়ালা তলোয়ার আর আগুন-পানা বাণে ভর্ত্তি দুখানি অক্ষয় তূণ, যে তূণ সেই রাবণবধ পর্যন্ত কাজে লেগেছে। ঋষি বলেছেন এগুলি নাকি দেবরাজ ইন্দ্রের দেওয়া, এগুলি বিষ্ণু পূর্বে অসুর মারবার জন্যেই ব্যবহার করে সফল হয়েছেন। আমরা প্রশ্ন করতে পারি, চিরকাল রাবণের ভয়-ভীত ইন্দ্র নিজে কেন এগুলি রাবণবধের জন্যে ব্যবহার করেননি, এবং কেনই বা তিনি এগুলি মুনিবর অগস্ত্যের কাছে জমা রেখেছেন ? অনাদিকাল থেকে বিশ্বকর্মা-মার্কা যেসব অস্ত্র-শস্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে বুঝি বিশ্বকর্মারা এক বিশেষ কামার গোষ্ঠী—যাদের শিল্পের কদর মুনিরাও বুঝতেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র আবার রামচন্দ্রকে যে সব অস্ত্র-শস্ত্র দিয়েছিলেন তাড়কাবধের পর, সেগুলি সবই এসেছিল বিশ্বামিত্রের তপোবলে। রামায়ণের আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্রর দেওয়া অস্ত্রগুলির বিচিত্র সব নাম আছে আর সেগুলি সংখ্যায়ও অনেক। বিশ্বামিত্র নিজে ক্ষত্রিয় ছিলেন কাজেই তাঁর পূর্বাশ্রমের অস্ত্র-শস্ত্র যে সংখ্যায় অনেক হবে তাতে আর আশ্চর্য কি। বিশ্বামিত্রের অস্ত্রপ্রসঙ্গ রামায়ণের আদিকাণ্ডের পরিসর, কিন্তু সুতীক্ষ্ণ-অগস্ত্যের অস্ত্রগুলি তো সব অরণ্যকাণ্ডের দান—সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলারও কোন উপায় নেই।

একদিকে যেমন মুনিদের ঘরে নানারকম অমোঘ অস্ত্রের সন্ধান পাচ্ছি, অন্যদিকে ক্ষত্রিয়দের দেখতে পাচ্ছি ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠানে ব্যস্ত। ঘরে কিংবা বনে রামচন্দ্রের মন্ত্রোচ্চারণ কিংবা সন্ধ্যা বন্দনার কথা ছেড়েই দিলাম, কেননা ক্ষত্রিয়কুমারদের ব্রাহ্মসংস্কার অনেকগুলোই পালন করতে হত। কিন্তু রামায়ণের মেয়েদের লক্ষ্য করেছেন কি ? রামচন্দ্রের ওপর যখন বনবাসের খাঁড়া নেমে এল, তখন তিনি সেই দুঃসহ সংবাদ দেবার জন্য উপস্থিত হলেন জননী কৌশল্যার কাছে। দেখলেন তিনি পূজোর কাপড় পরে বিষ্ণুপূজা করছেন। কিন্তু এই বিষ্ণুপূজার পদ্ধতি এতটাই বৈদিক যে পরবর্তী কালের রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা তা

মেনে নিতে পারেননি। কৌশল্যা মন্ত্র উচ্চারণ সহযোগে অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছিলেন—অগ্নিং জুহোতি স্ম তদা মন্ত্রবৎ কৃতমঙ্গলা। রামও সেই অবস্থাতেই জননীকে দেখলেন—হাবয়ন্তীং হুতাশনম্। টীকাকার বলেছেন কৌশল্যা দশরথের জ্যেষ্ঠা পত্নী, তাই তাঁকে দিয়ে অগ্নিহোত্র করাচ্ছিলেন ঋত্বিক্। সত্যি কথা বলতে কি, বাল্মীকির কথাগুলি এতই স্পষ্ট যে টীকাকারেরা আর অন্যরকম বোঝাতে পারেননি। নইলে তাঁরা বলতেন, কৌশল্যা যজ্ঞ করছিলেন, ঋত্বিক তাঁকে যজ্ঞ করাচ্ছিলেন এবং মহারাজা দশরথ আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছিলেন— কেননা, স্বামী ছাড়া স্ত্রীলোক একা একা যজ্ঞ করতে পারেন না—এই তাঁদের কালের নিয়ম। কিন্তু বাল্মীকির কৌশল্যা অগ্নিহোত্র করতেন, এমনকি পরবাসে রাবণের ঘরে সীতার কাছেও প্রায় একই জিনিস আশা করা হয়েছে। হনুমান লংকাপুরীতে সীতাকে খুঁজে খুঁজে যখন একেবারে অধৈর্য হয়ে পড়লেন তখন তিনি রাত কাটাতে উঠে পড়লেন অশোকবনের মধ্যস্থিত এক শিংশপা গাছে। তখনও তিনি সীতাকে দেখেননি। অশোকবনের মধ্যেই ছিল এক স্বচ্ছ-সলিল সরোবর। নানা জল্পনা-কল্পনার অবসরে হনুমান এবার যা ভাবলেন তার মধ্যেই পাব ক্ষত্রিয় ললনার ব্রাহ্মণ্য আচার। হনুমান ভাবলেন—সেই সুন্দরী সীতা যদি জানতে পারেন যে প্রাতঃসন্ধ্যার সময় হয়ে এসেছে, তাহলে এই নির্মল জলে সন্ধ্যা করার জন্য সীতা নিশ্চয়ই এই সরোবরে আসবেন—সন্ধ্যাকালমনাঃ শ্যামা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী। নদীঞ্চেমাং শুভজলাং সন্ধ্যার্থে বরবর্ণিনী ॥ স্ত্রীলোকের পক্ষে এই সন্ধ্যা-বন্দনার ব্যাপারটা কিন্তু অদ্ভুত শোনাচ্ছে, এবং এই সন্ধ্যা শুধু ব্রত-নিয়ম নয়, একেবারেই সন্ধ্যাই। টীকাকার ভয় পেয়ে লিখেছেন, জানকীর সন্ধ্যা মানে ভগবানের ধ্যান, কারণ সেইটাই মাত্র স্ত্রীলোকের অধিকার। এই সন্ধ্যা বলতে ব্রাহ্মণদের গায়ত্রীমন্ত্র স্মরণ বোঝায় না—কিঞ্চ সম্যগ্ ভগবদ্ধ্যানস্যৈব সন্ধ্যাপদার্থত্বেন অস্ত্যেব তত্র স্ত্রিয়া অধিকারঃ। গায়ত্রীমন্ত্রেণ তদর্থস্মরণপূর্বকধ্যানে তু দ্বিজস্যৈবাধিকার ইত্যন্যৎ।

আসলে সংরক্ষণশীল টীকাকারের যা ভয়, তাই ঘটেছে। পাছে আমরা 'সন্ধ্যা' শব্দের চিরপ্রচলিত অর্থটিই বুঝে ফেলি, তাই টীকাকার 'সং' মানে 'সম্যক', 'ধ্যা' মানে 'ধ্যান'—এইভাবে শব্দের স্বাভাবিক অর্থ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু যিনি হাজার হাজার শ্লোক লিখে রামায়ণী কথা গ্রন্থনা করেছেন, যাঁর হাজার হাজার শব্দ-ব্যবহার অমোঘ বলে কবি-পণ্ডিতের বিস্ময় উৎপাদন করে তিনি কি না ব্রাহ্মণোচিত একটি শব্দ ব্যবহার করলেন স্ত্রীলোকের ব্রত-নিয়ম বোঝানোর জন্য ! কেন, তাঁর শব্দকোষে কি শব্দের অভাব ছিল ?

অতএব বাল্মীকি যা বোঝাতে চেয়েছেন তাই বলেছেন শব্দমন্ত্রে। স্বাভাবিক অর্থের বদলে যেখানে দুরূহ অর্থ কল্পনা করতে হয়, সেখানে যিনি সেই অর্থ কল্পনা করেন তাঁরই সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনার অবসর থেকে যায়। পুরাকল্পে স্ত্রীলোকের বেদপাঠ, 'মৌঞ্জীবন্ধন' যে প্রচলিত ছিল, সে সম্বন্ধে প্রমাণ আছেই। কিন্তু টীকাকারের মত আমরাও জানি—স্ত্রী-শূদ্রেরা কেউই বেদ-কিংবা গায়ত্রীতে অধিকারী নয়। যে রামায়ণে কৌশল্যার অগ্নিহোত্র, সীতার সন্ধ্যা বন্দনার কথা বলা হয়েছে, সেই রামায়ণেই শূদ্র শম্বুকের তপশ্চর্যায় কোন অন্যায় হত না। আর যে রাম জায়া এবং জননীর বৈদিক আচারে অভ্যস্ত, সেই রামই শূদ্র শম্বুকের ব্রাহ্মণোচিত ব্যবহারে তাঁকে মেরেই বসলেন, এই বা কেমন কথা! কাজেই রামায়ণের উত্তরকাণ্ড এবং বালকাণ্ডের পরিবেশের সঙ্গে অন্য কাণ্ড-পঞ্চকের পরিবেশে যে মৌলিক পার্থক্য আছে সে কথা অস্বীকার করার মানে হয় না। অস্বীকার করছিও না। কিন্তু তাই বলে হ্বেবার সাহেব আর গুটিকতক বাঙালি সাহেব যা বলবেন, তাই ধ্রুব সত্যি—একথা মানতেও আমাদের আপত্তি আছে, এবং তার কারণটাও খুব পরিষ্কার।

হ্বেবার সাহেবের বড় যুক্তি হল, বাল্মীকি রামায়ণের আগে লেখা হয়েছিল সেই বৌদ্ধ গ্রন্থটি, যার নাম দশরথ জাতক। দশরথ জাতকে সীতা হরণের বৃত্তান্ত নেই; অতএব হ্বেবার সাহেবের ধারণা—রামায়ণের এই পর্ব সংযোজিত হয়েছে অনেক পরে, মানে সেই যখন আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করলেন এবং সেই সুবাদে ভারতের অধিবাসীরা ইলিয়াডের বৃত্তান্ত জানতে পারল, তারপর।

এ সেই রোগ, যাতে প্রতিপদে মনে হয়—সব ব্যাপারেই উত্তমর্ণের ভূমিকাটি আছে ইউরোপের। সাহেব একবার ভাবলেন না যে, তাঁর যে সব জাতভায়েরা রামায়ণ-মহাভারতকে এক একটা বড় ধরনের ঢাকাই পরোটা কিংবা নিমকি গোছের মনে করেন, তাঁরা পর্যন্ত রামায়ণের বিভিন্ন পরতের কথা বলতে গিয়ে রামায়ণের আদিস্তর থেকে সীতাহরণের বৃত্তান্ত মুছে দিতে পারেননি। খুব বেশি হলে এইটুকু স্বীকার করা যায় যে, সীতাদেবীর বায়না-ধরা সেই সোনার হরিণের গপ্পোটা পরবর্তী কোন বাল্মীকির রচনা। মূল রামায়ণের এই অংশটি যদি একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখেন, তাহলে দেখবেন ব্যাপারটা নিতান্তই সোজাসুজি ঘটেছে। একটা কথা প্রথমে লক্ষ্য করুন।

আগেই জানিয়েছি, দণ্ডকারণ্যে রামের হাতে খর-দূষণের লাঞ্ছনার কথা প্রথমে রাবণের গোচরে আনে অকম্পন, এবং সে-ই প্রথম সীতার অলৌকিক রূপ বর্ণনা করে তাঁকে হরণের প্রস্তাব দেয়। রাবণ সিদ্ধান্ত করেন যে, তিনি সীতাকে

হরণ করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মারীচের ঘরে আসেন। এ ঘটনা অরণ্যকাণ্ডের একত্রিশ সর্গে। আবার দেখা যাচ্ছে শূর্পনখার কাছে খবর পাওয়ার পর রাবণ পুনশ্চ মারীচের আশ্রমে এসেছেন এবং সেটি পঁয়ত্রিশ সর্গে। দুই জায়গাতেই রাবণকে দেখার পর মারীচ যে কথাগুলি বলেছে, তাকে দ্বিরুক্তি বললেও কোন অসুবিধে হয় না—

> মারীচেনার্চ্চিতো রাজা ভক্ষ্য-ভোজ্যৈরমানুষৈঃ ॥
> তং স্বয়ং পূজয়িত্বা তু আসনেনোদকেন চ।
> অর্থোপহিতয়া বাচা মারীচো বাক্যমব্রবীৎ ॥
> কচ্চিৎ সুকুশলং রাজন্ লোকানাং রাক্ষসাধিপ।
> আশঙ্কে নাধিজানে ত্বং যতস্তূর্ণমিহাগতঃ ॥
> এবমুক্তো মহাতেজা মারীচেন স রাবণঃ।
> ততঃ পশ্চাদিদং বাক্যমব্রবীদ্ বাক্যকোবিদঃ॥

এই শ্লোকগুলির মধ্যে কতগুলি শ্লোক পঁয়ত্রিশ অধ্যায়েও একেবারে অবিকৃত। অন্য শ্লোকগুলির মধ্যে শব্দের কিছু তরতম আছে বটে, কিন্তু অর্থ একেবারে একই। তার মানে হল এই অন্তর্বর্তী সর্গগুলির মধ্যেই পরবর্তী সময়ের কবি মায়ামৃগের পরিকল্পনা ছকে নিয়েছেন এবং সেটি তিনি বিস্তার করেছেন পঁয়ত্রিশ সর্গের পর থেকে। কেননা উল্লিখিত শ্লোকগুলির মধ্যে শেষ শ্লোকটি, যার মানে হল—মারীচের প্রশ্ন শুনে মহাতেজস্বী, বক্তৃতাকুশল রাবণ বলতে আরম্ভ করলেন—এই শ্লোকটি অরণ্যকাণ্ডের একত্রিশ সর্গের মাঝামাঝি আছে, কিন্তু অরণ্যকাণ্ডের পঁয়ত্রিশ সর্গে এইটিই শেষ শ্লোক। পরবর্তী ছত্রিশ সর্গ থেকেই রাবণ মারীচকে মায়ামৃগের রূপ ধারণ করার জন্য চাপ দিতে থাকেন এবং মারীচ এবং রাবণের উতোর-চাপান চলতে থাকে সেই একচল্লিশ সর্গ পর্যন্ত। অতঃপর রাবণের পরামর্শমত কাজ চলতে থাকে। মৃগরূপী মারীচ প্রলুব্ধ রামকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে লক্ষ্মণের নাম ধরে চেঁচাতে থাকল। রাবণও ঢুকে পড়লেন ভিখারী বেশে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল—রাবণের বেশ তপস্বীর মত, অথচ তিনি সামনা-সামনি সীতার স্তন-জঘনের প্রশংসা করতে থাকলেন—তবু সীতার কোন সন্দেহ হল না। মারীচের ডাক শুনে যাবার আগে লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতার বচসা হয়। রাম মায়ামৃগের সন্ধানে যাবার পূর্ববর্তী কালে লক্ষ্মণ মৃগের ছলনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন এবং মারীচের ডাক শুনে সীতাকেও তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, বনের মধ্যে রাক্ষসেরা এরকমধারা শব্দ করেই থাকে—রাক্ষসা

বিবিধা বাচো ব্যাহরন্তি মহাবনে । লক্ষ্মণের এত সন্দেহ, এত বচসা সত্ত্বেও, তপস্বীর মুখে কুলবতীর অঙ্গ-সংস্থানের বর্ণনা শুনেও সীতার কোন সন্দেহ হল না কেন ? তাতেই বুঝি এই স্বর্ণমৃগের অংশ মূল রামায়ণে ছিল না । যা ছিল, তা সরলা কুলবতীর আত্মকথা—সীতা নিশ্চিন্ত মনে রাবণকে দশরথের কথা, তাঁর কৈকেয়ী-কামিতার কথা সবিস্তারে শুনিয়েছেন । রামের বনবাস, পিতৃসত্য রক্ষায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা সবই তাঁকে বলেছেন । সবার শেষে রাবণকে যে কথাটা বলে তিনি একটু সবুর করতে বললেন সেই কথাটাই আমাদের সবচেয়ে বিস্মিত করে । যেখানে এত বলশালী রাম মহাবিপদে পড়েছেন বলে দেওরের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া করে তাঁকে সাহায্যের জন্য পাঠাতে হল, সেখানে কোন দুশ্চিন্তার ছায়ামাত্র সীতার ভাষায় ফুটে উঠল না ! বরঞ্চ তিনি বললেন—এই আর একটুখানি বসুন—সমাশ্বস মুহূর্ত্তং তু, এই আমার স্বামী এলেন বলে । আমার স্বামী এখনই অনেক বনজাত খাদ্যদ্রব্য, অনেক রুরু-মৃগ, গোসাপ, শুয়োর—সব মেরে প্রচুর মাংস নিয়ে আসবেন, আপনি এই একটুখানি বসুন—আগমিষ্যতি মে ভর্ত্তা বন্যমাদায় পুষ্কলম্ । রুরূন্ গোধান্ বরাহাংশ্চ হত্বাদায়ামিষং বহু ॥ এর পরেই রাবণ নিজের পরিচয় দিলেন ।

রামায়ণের সামগ্রিক সীতা-চরিত্রে কোথাও কোন কূটবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না । সেক্ষেত্রে আপন দুশ্চিন্তা চেপে রেখে তিনি যে রাবণের সঙ্গে খোশগল্প করে যাবেন তা মনে হয় না । আর্ত্ত রামের মুখে 'হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ' শব্দ শুনেও তার প্রসঙ্গ একটুও উল্লেখ না করে—এই আমার স্বামী বন্য পশুর মাংস নিয়ে এলেন বলে—এমনতর নিশ্চিন্ততা দেখাবেন—এই কি সরলা কুলবতীর স্বভাব হতে পারে ! বেশ বোঝা যায়, রাম-লক্ষ্মণ দুজনেই বন্য পশু শিকার করার জন্য এমনিই বেরিয়েছিলেন । সীতার খবর শুনেও তাই বোঝা যায় । আবার মায়ামৃগ বধ করার পর রাক্ষসরূপী মারীচের মুখ দিয়ে মায়াস্বরে 'হা সীতা হা লক্ষ্মণ' ডাক শুনে রাম যেখানে সীতার কথা চিন্তা করে ভীষণ শংকিত হয়ে উঠলেন, সেখানে তিনি অন্য একটা মৃগ বধ করে, তার মাংস কাঁধে করে ঘরের দিকে ছুটতে থাকলেন—এও কি কোন স্বাভাবিক কথা—নিহত্য পৃষতঞ্চান্যং মাংসমাদায় রাঘবঃ । ত্বরমাণো জনস্থানং সসারাভিমুখং তদা ॥ এই ঘটনা থেকেও মনে হয় শিকারে বেরিয়ে একটা হরিণ মেরে এবং তারপরে আরও একটা হরিণ মেরে রাম ছুটলেন ঘরের পানে, কারণ সীতা একা আছেন । এইরকম একটা অসংরক্ষিত অবস্থাতেই সীতা-হরণ সম্পন্ন হয়েছে—এর মধ্যে মায়ামৃগ-কল্পনার অবসর নেই । অবশ্য প্রক্ষিপ্ত হলেও মায়ামৃগের কল্পনা অভিনব এবং মূল

রামায়ণে সেটি সংযোজিত হতে বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু তাই বলে সীতা-হরণের ব্যাপারটাই মূল রামায়ণে ছিল না—একথা শুধু সাহেবী নয়, বেহিসেবি কথা। হ্বেবার সাহেব ভুলে গেছেন যে, ছোট ছোট লোকায়ত কথা-কাহিনী যেমন কবিদের হাতে বৃহদাকার ধারণ করে, তেমনি অনেক বৃহৎকথাও পরবর্ত্তী কবি সাহিত্যিকদের হাতে সংক্ষিপ্ত হয়। আবার অনেক কাহিনীই ধর্মীয় সংগঠকেরা আপন স্বার্থে নিজেদের মত করে ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধদের মধ্যে এই ব্যাপারটাই ঘটেছিল।

সেইকালে রামকথা এবং কৃষ্ণকথা এত প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, যে বৌদ্ধরা সে কাহিনী ব্যবহার না করে পারেননি। নেপথ্যে ছিল অবতারবাদের হাতছানি, কারণ বুদ্ধও ততদিনে প্রায় অবতার হিসেবেই গণ্য হতে চলেছেন আর সেইজন্যেই দশরথ জাতকের শেষে ভগবান বুদ্ধকে বলতে হচ্ছে—'সেই সময়ে মহারাজ শুদ্ধোদন ছিলেন দশরথ', কৌশল্যা ছিলেন মহামায়া, রাহুলজননী ছিলেন সীতা, ভরত ছিলেন আনন্দ, সারিপুত্ত ছিলেন লক্ষ্মণ আর স্বয়ং রাম-পণ্ডিত ছিলাম আমি'। কৃষ্ণ-কাহিনীর বেলাতেও বুদ্ধের কৃষ্ণে পর্যবসান। কিন্তু কোন অবস্থাতেই কি এই সব বৌদ্ধ জাতক রাম কিংবা কৃষ্ণ কাহিনীর পূর্ববর্ত্তী হতে পারে ? তাছাড়া দশরথ জাতকের কাহিনী শুনলেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে সে কাহিনী রামায়ণী কথারই বিকৃত সংস্করণ।

দশরথ জাতকের পটভূমি অযোধ্যা নয়, বারাণসী ; যে বারাণসী অন্যান্য বৌদ্ধ কাহিনীতেও পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত। সেখানে দশরথ রাজার পাটরানীর গর্ভে দুটি ছেলে, রাম আর লক্ষ্মণ আর এক মেয়ে, তাঁর নাম সীতা। পাটরাণী হঠাৎ মারা যান এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন অন্য রানী, যে ক্রমশঃই রাজার প্রিয়তমা হয়ে ওঠে। এই রানীর ছেলের নাম ভরত। (বাল্মীকিতে তরুণী কৈকেয়ীর প্রতি রাজার অত্যধিক আসক্তিই কৌশল্যার ভালবাসার মৃত্যু ঘটিয়েছে। সেই ভালবাসার মৃত্যুই কিন্তু বৌদ্ধ জাতকে কৌশল্যার দৈহিক মৃত্যুতে পরিণত।) ভরতের প্রতি মমতার জন্য দশরথ একসময় তাঁর মাকে বর দিতে চান এবং মূল রামায়ণ কাহিনীর মতই বর সেখানে তোলা রইল। ভরতের আট বছর বয়স হতেই ভরতমাতা দশরথের কাছে বর চাইলেন এবং ভরতকে রাজ্য দিতে বললেন। দশরথ রেগে দিশাহারা হয়ে বললেন, দুষ্টবুদ্ধি স্ত্রীলোক কোথাকার, আমার দুই আগুনপানা ছেলে চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। আর সেই দুটিকে মেরে তোমার ছেলেকে রাজ্য দিতে বলছ তুমি ! রানী সাময়িকভাবে একটু ভয় পেলেন বটে কিন্তু মাঝে মাঝেই তিনি তাঁর পুরানো আর্জি জানাতে থাকলেন।

রাজা ভাবলেন—মেয়েরা এমনিতেই বিশ্বাসঘাতিনী। রানী নিশ্চয়ই উল্টোপাল্টা চিঠি লিখে নয়তো বা অন্য কাউকে ঘুষ-ঘাষ দিয়ে তাঁর ছেলে দুটিকে মেরে ফেলতে পারে। এমনি সাত-পাঁচ ভেবে দশরথ রাম-লক্ষ্মণকে ডেকে বললেন—বাপু হে, এখানে থাকলে তোমাদের বিপদ হতে পারে। তাই হয় তোমরা কিছুদিন পাশের কোন রাজ্যে গিয়ে থাক নয়তো বা বনের দিকে চলে যাও। কিন্তু আমি মারা গেলে তোমরা ফিরে আসবে এবং পিতৃরাজ্য দখল করবে। এরপরেই তিনি ডেকে পাঠালেন দৈবজ্ঞ জ্যোতিষীদের এবং তাঁর নিজের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। জ্যোতিষীরা গুণে-গেঁথে বললেন যে, দশরথ আর বার বছর বাঁচবেন। দশরথ আবার ডাকলেন দুই ছেলেকে এবং বললেন—বার বছর পরে ফিরে এস তোমরা। রাম পণ্ডিত এবং লক্ষ্মণ পিতৃবাক্য স্বীকার করলেন এবং সীতা বললেন— 'আমিও যাব ভাইদের সঙ্গে'। শেষ পর্যন্ত তিন জনেই রাজ্যের জনসাধারণকে বিদায় জানিয়ে হিমালয়ে গিয়ে কুটির বানিয়ে থাকতে আরম্ভ করলেন (পাঠক মনে রাখবেন হিমালয় কিন্তু বৌদ্ধদের বড় প্রিয় এবং বৌদ্ধ কাহিনীতে বড় পরিচিত জায়গা)। লক্ষ্মণ আর সীতা রাম পণ্ডিতকে প্রায় পিতার যত্নে সেবা করতে থাকলেন। এর মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতার বনবাসের মেয়াদ না ফুরাতেই নয় বছরের মাথায় দশরথ মারা গেলেন। শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটতেই রাজরানী বললেন—এবার আমার ছেলের মাথার ওপর রাজছত্র শোভা পাক। কিন্তু মন্ত্রীরা এতে রাজি হলেন না এবং ভরতও বললেন—আমি রাম-পণ্ডিতকে ফিরিয়ে আনব বন থেকে। চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী নিয়ে ভরত রামের বাসস্থলে পৌঁছোলেন এবং সৈন্য-সামন্ত দূরে রেখে রামের আশ্রমে প্রবেশ করলেন এমন সময়, যখন লক্ষ্মণ এবং সীতা ফল-মূলের সন্ধানে অন্যত্র গেছেন। ভারত দেখলেন রাম পণ্ডিতকে, প্রশান্তি এবং নির্বিঘ্নতার প্রতিমূর্ত্তি যেন। ভরত প্রণাম করে রামকে পিতার মৃত্যু-সংবাদ দিলেন। রাম-পণ্ডিত দুঃখও পেলেন না, কোন কান্নাকাটিও করলেন না। মনের মধ্যে তাঁর বিকারও হল না একটু ; যেমন স্থির ছিলেন, তেমনি স্থির। পাঠক, এইখানেই বাল্মীকির মানুষ রাম একেবারে বুদ্ধ বনে গেছেন। দুঃখে দুঃখিত সুখে সুখিত কবিকল্পনার বিষয়কে এখানে বৌদ্ধ স্থবির করে ফেলা হয়েছে। পাঠক নিজেই বুঝুন, যেখানে বাল্মীকিতে একাধিক ক্ষেত্রে মৃত্যু-বিরহের করুণ রস উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, সেখানে এক উদ্বেল রসনিষ্পত্তি এখানে স্তব্ধ করে দেওয়া হল, নাকি স্তব্ধ স্থবির মূক রামপণ্ডিতকে বাল্মীকিই শোক-মুখর করে তুলেছেন ? কার কাছে কে ঋণী ? এ প্রশ্নের সমাধান খুব সহজ। বৌদ্ধ জাতকের গল্পকার আপন

সুবিধার্থে রামায়ণের এই জায়গাটি বেছে নিয়েছেন মাত্র। লক্ষ্মণ এবং সীতা পিতার মৃত্যুসংবাদে অধৈর্যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছেন। প্রতিতুলনায় রাম পণ্ডিত, যিনি বুদ্ধেরই জন্মান্তর-প্রতিকল্প, তিনি কত স্থির, এইটা দেখানোই তো জাতকের উদ্দেশ্য। দশরথ জাতকের আরম্ভকালীন প্রতিজ্ঞাও তো তাই। এক গৃহস্থের পিতৃবিয়োগ হলে, তিনি যখন শোকে আপ্লুত হয়ে জেতবনে বুদ্ধের কাছে এলেন, তখন বুদ্ধ এই গল্প বললেন।

পিতার সংবাদ দিতে গিয়ে ভরতও কাঁদছেন এবং এই সময়েই লক্ষ্মণ এবং সীতাও ফল-মূল কুড়িয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। রাম পণ্ডিত ভাবলেন—"এদের বয়স কম এবং আমার মত বিবেক-বুদ্ধিও এদের নেই। পিতার বিয়োগ ব্যাথায় এরা একেবারেই ভেঙে পড়বে। তাই এদের জলের মধ্যে দাঁড় করিয়ে এই খবর দেব।" যে কথা সেই কাজ। রাম পণ্ডিত যেন লক্ষ্মণ এবং সীতাকে একটা শাস্তি দিচ্ছেন এমন একটা ভাব দেখিয়ে তাঁদের জলে নামালেন এবং ভরতের কাছ থেকে পাওয়া দশরথের মৃত্যুসংবাদও জানালেন। লক্ষ্মণ, সীতা সংজ্ঞা হারালেন। সংজ্ঞা লাভ করলে আবার তিনি একই কথা বললেন। তাঁরা আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এইরকম করে তৃতীয়বার সংজ্ঞা হারানোর পর অন্য লোকেরা তাঁদের জল থেকে ডাঙায় নিয়ে এল। ভরত বললেন—রাম! এমন স্থৈর্য তোমার কি করে হল, যাতে আমরা নিজেদের সংবরণ করতে পারছি না, অথচ তুমি অটল, স্থিতধী। রাম বললেন, যা মানুষ হাজার দুঃখ-শোকের বদলেও শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারবে না, তার জন্য দুঃখ পেয়ে লাভ কি? পাকা ফলকে যেমন মাটির টান সহ্য করতেই হয়, মানুষকে তেমনি মৃত্যুর যন্ত্রণা সহ্য করতেই হবে।

এ সবই জ্ঞানের কথা, এবং এ জ্ঞানের কথা বাল্মীকির রামও জানতেন। তবু বাল্মীকির রাম সুখে-দুঃখে যতখানি স্থিতধী ততখানিই সলীল। নির্বিকার থেকে কি বিকারের কল্পনা জন্ম নিতে পারে? রসঘন মনুষ্যসত্তাকে নিজধর্ম প্রচার করার জন্য নীরস করে ব্যবহার করা যত সহজ, নীরস থেকে রসের জন্ম দেওয়া ততখানিই কঠিন। অতএব কে কার কাছে ঋণী তা সহজেই বোধগম্য। অবশ্য দশরথ জাতকের রামকে যখন ভরত ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন তখন তিনি কিন্তু বাল্মীকির রামের মতই পিতৃসত্যের দোহাই দিলেন। বললেন—ন' বছর কেটেছে, আর তিন বছর পরে দেশে ফিরব। অর্থাৎ সেই বার বচ্ছর পর। কিন্তু মজা হল দশরথ জাতকে তো পিতৃ-সত্য পালনের কোন ব্যাপার ছিল না। রাজা বলেছিলেন—আমি মারা গেলেই তোমরা এসে সিংহাসন দখল করবে। দশরথ

জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর বেশি নির্ভর করে ছেলেদের বার বচ্ছর পরে ফিরতে বলেছিলেন এবং মনে রাখতে হবে সেটাও ছিল মৃত্যু সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ বাণী। 'মারা গেলে ফিরে আসবে'— এইটাই ছিল পিতৃবচন। কিন্তু এই যে রাম পিতৃসত্য পালনের গোঁ ধরলেন, এটি কিসের অনুসরণে। অবশ্যই বাল্মীকির রামের অনুকরণে ; কারণ বাল্মীকিতে পিতৃসত্য পালনের জন্য তিনি যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছেন, অতএব এই মহনীয় কাজটি বুদ্ধের রামকল্পে মিলিয়ে দিতে জাতককারের ভাল লেগেছে। দশরথ জাতকের ভরত রামের সত্যপ্রতিজ্ঞতার সীমা জানতেন না। বাল্মীকির ভরত তা জানতেন এবং জানতেন বলেই দুখানি সোনার পাদুকা রাজধানী থেকেই গড়ে নিয়ে এসেছিলেন। সময়মত সেটি ঝুলি থেকে বার করে রামকে তিনি বলেছেন—এই সোনার পাদুকা দুটিতে একবার পাদার্পণ করুন আর্য। এই খড়ম-জোড়াই জনগণের হিতসাধন করবে—অধিরোহ আর্য পাদাভ্যাং পাদুকে হেমভূষিতে। রাম সেই খড়ম-জোড়ায় একবার পা গলিয়ে ভরতকে দিয়ে দিলেন। দশরথ জাতকে ভরত পাদুকা চাননি। রাম আপনা থেকেই খড়-কুটোয় তৈরী পাদুকা দুখানি ভরতকে দিয়েছেন এবং সে পাদুকা 'ম্যাজিক' জানে। রাজ্যের মধ্যে কোন রকম অন্যায় হলেই জুতো-জোড়া পরস্পর আটকে যেত। তিন বছর আরও গেল এবং তারপর রাম পণ্ডিত সাঙ্গোপাঙ্গে ফিরে এলেন বারাণসীতে।

মোটামুটি এই হল সংক্ষেপে দশরথ জাতক। গল্পটা আমি দ্বিতীয়বার উল্লেখ করলাম এইজন্যে যে আজকাল অনেক পণ্ডিতমানী ব্যক্তি এই জাতকের উল্লেখমাত্র কাজে লাগিয়ে কিছু হঠ-সিদ্ধান্ত করে বসেন। কিন্তু জাতকের কাহিনীটিই হয়তো তাঁদের জানা নেই। তারও ওপরের কথা হল, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হ্বেবার যে মত প্রচার করেছেন, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দেই আর এক জাঁদরেল জার্মানি পণ্ডিত হারমান জ্যাকোবি তার প্রতিবাদ করেছেন। শুধু দশরথ জাতক নয়, হ্বেবারের বক্তব্য ছিল যে, মহাভারতের 'রামোপাখ্যান' নামক অংশটিও নাকি মূল রামায়ণের পূর্ববর্তী। অর্থাৎ কিনা বাল্মীকি দশরথ জাতক আর মহাভারতের 'রামোপাখ্যান'কে উপজীব্য করেই তাঁর রামায়ণী কথা তৈরী করেছেন। আবার এমন ইঙ্গিতও আছে যে, এই মূল রামায়ণ ছাড়াও এমন কোন রাম-কথা অতি প্রাচীন কালে চালু ছিল, তার সারাৎসার হল মহাভারতের 'রামোপাখ্যান'। জ্যাকোবি এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, মহাভারতের রামোপাখ্যানে যেটুকু পরিবর্তন দেখা যায়, তা করেছেন স্বয়ং মহাভারতের কবিই, সে তিনি ব্যাসই হোন কিংবা অন্য কেউ। রামায়ণী কথা যে

রামায়ণ লেখার আগেই লোকস্তরে চালু ছিল সে কথা কেউ অস্বীকার করে না। এমনকি বাল্মীকির আগে চ্যবন মুনি যে একবার রামায়ণ লিখতে আরম্ভ করেছেন, সে কথা তো অশ্বঘোষই প্রথম খ্রীষ্টাব্দে জানিয়েছেন। আধুনিক গবেষকেরা তো একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন যে, মূল রামায়ণ, যেমনটি উত্তর ভারতে চালু ছিল, সেইটাই ছিল রামোপাখ্যানের প্রধান উপজীব্য। তাছাড়া অবতার-বাদের মত বৈষ্ণব সংযোজন, যা নাকি রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশের বৈশিষ্ট্য, সেটি তো মহাভারতের রামোপাখ্যানের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। কাজেই এটি মূল রামায়ণের পূর্ববর্ত্তী হতেই পারে না। দশরথ জাতক সম্বন্ধে আজকের গবেষকরা আরও বেশি নিষ্ঠুর মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে দশরথ জাতকের গদ্যাংশগুলি পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের সিংহলী রামকথার পালি অনুবাদমাত্র। লুডার্সের মত উল্লেখ করে ব্রকিংটন দেখিয়েছেন, রামায়ণের যে গাথাটিতে রাম মৃত দশরথের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিয়েছেন, দশরথ জাতকের লেখক সেটিকে এতই ভুল বুঝেছেন যে, লক্ষ্মণ এবং সীতাকে মৃত্যু সংবাদ দেবার আগেই তাঁদের জলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। রামায়ণে আছে রাম ভাইদের সঙ্গে নিয়ে মন্দাকিনীর জলে নেমে 'জলপূরিত' অঞ্জলি—'বিমলং তোয়ম্ অক্ষয়ম্'—দশরথের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন। এই পুরো ব্যাপারটাকেই জাতককার ভুল বুঝে ভাইবোনকে জলে নামিয়ে দশরথের মৃত্যু-সংবাদ পরিবেশন করেছেন। বিকৃতি আছে আরও। দশরথ জাতকে সীতা রামের বোন। রাম তাকে বিয়ে করেছেন বনবাস থেকে ফেরার পর। গবেষকেরা দেখিয়েছেন, এইটাই প্রাচীন বৌদ্ধ ঘরানার কথা। বৌদ্ধ ঘরানায় ভাই-বোনের বিয়ে অন্যত্রও দেখানো হয়েছে এবং তার প্রাচীনতাও কম নয়। বৌদ্ধগ্রন্থ দীঘ নিকায়ে ওক্কাক (হয়তো ইনি ইক্ষ্বাকু) নামের নৃপতিটি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং কন্যাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। নির্বাসনে গিয়ে তারা ভাবল যে, তারা যদি অন্য কোথাও বিবাহাদি করে তাহলে বুঝি তাদের রক্তের শুদ্ধতা নষ্ট হবে। এই ভয়ে তারা ভাই-বোনেই বিয়ে করে বসল এবং তাদের থেকেই শাক্য-বংশের উৎপত্তি। এই ইক্ষ্বাকু বলতে যে দশরথকেই বোঝানো হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, এমনকি ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থগুলিতেও দশরথ কিংবা রামকে ইক্ষ্বাকু বলেও ডাকা হয়েছে অনেক সময়। বৌদ্ধ ঘরানায় ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহের উল্লেখ অন্যান্য কিছু গ্রন্থেও আছে; কাজেই রাম-সীতার কাহিনী সেইভাবেই বিকৃত হয়েছে। বৌদ্ধ জাতক কিংবা রামোপাখ্যানের উত্তমর্ণ-ভূমিকা নিয়ে পণ্ডিত গবেষকেরা অনেক প্রত্যাখ্যান সূত্র রচনা করেছেন এবং সেসব সূত্র প্রায় গৃহীত। বরঞ্চ একাধিক প্রশ্ন আসে

রামায়ণের বাল এবং উত্তরকাণ্ড নিয়ে, যেগুলিকে আমরা প্রক্ষিপ্ত বলেই জানি।

একালে ব্রকিংটন সাহেব রামায়ণ কাহিনীর প্রায় সমস্ত জটিলতা নিয়েই আলোচনা করেছেন, এবং তাঁর আলোচনাগুলি ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিকসুলভ হওয়ায় সেগুলি আপাততঃ অনবদ্য, তথা প্রত্যাখ্যানের অযোগ্য বলেই মনে হয়। তবু প্রশ্ন কিছু থেকেই যায়। প্রশ্ন আরও এইজন্য যে, ভাষার বিশ্লেষণ, সে বিশ্লেষণ যত সূক্ষ্ম এবং বুদ্ধিদীপ্তই হোক না কেন, তারও সীমাবদ্ধতা আছে। বিশেষতঃ ভাষার এবং কাব্যশৈলীর ভিত্তিতে ব্রকিংটন সাহেব রামায়ণ মহাকাব্যের এতরকম স্তরবিভাগ করেছেন যে তাতে পাণ্ডিত্যের মহিমা যতই বেড়ে উঠতে থাকে, ততই মনে হয় ব্রকিংটন সাহেবকে তো আর মহাকাব্যের কবির হৃদয়খানি উপহার দেওয়া যায় না! অবশ্য তাঁরই বা দোষ কি? এই স্তর বিভাগের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে সেই হ্বেবার, জ্যাকোবি, বঙ্কিমচন্দ্রের আমল থেকে। ব্রকিংটন পর্যন্ত নামলে পরে দেখা যাবে যে নানা মুনির মত বিন্যাসে রামায়ণের স্তর-ভেদ ঘটেছে প্রায় পাঁচ-সাতটি। অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা এবং প্রতি-তুলনা করে ব্রকিংটন যেভাবে রামায়ণের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক স্তর-ভেদ নির্ণয় করেছেন এবং সেই স্তর-ভেদ যেভাবে রামায়ণের কাহিনী-গঠনের স্তর-ভেদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছেন, তাতে অনেকের মতই আমাদেরও সন্দেহ হতে থাকে যে, রামায়ণ বুঝি কোন বাল্মীকির একক কবিতা নয়। অন্যদিকে তেমনি গর্বও হতে থাকে যে, বাল্মীকি-প্রতিভার মত সমমানের প্রতিভা আমাদের দেশে তাহলে আরও অনেক ছিল।

ব্রকিংটন বলেছেন, ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য—সেই হল রামায়ণ বিশ্লেষণের 'best starting point' এবং তাঁর এই শুভারম্ভের পরিসরে সংস্কৃত ব্যাকরণের পদশ্রেণীর চুলচেরা বিচার আছে। তাতে ক্রিয়া থেকে আরম্ভ করে কাল, সমাস থেকে আরম্ভ করে আত্মনেপদ পরস্মৈপদ—সবকিছুরই পূর্বকালিক এবং উত্তরকালিক ব্যবহার বিশ্লেষণ করে রামায়ণ মহাকাব্যের স্তর বিভাগ করা হয়েছে। কিন্তু সেই ভিত্তিতে—বড় বড় সমাসবদ্ধ পদ অযোধ্যা-কাণ্ডে যতখানি ব্যবহৃত, সুন্দর-কাণ্ডে তার চেয়ে বেশি এবং যুদ্ধকাণ্ডে আরও বেশি ; অতএব এটি এই স্তরের মধ্যে পড়ে, আর ওটি অন্য স্তরে—এই যুক্তি কি মহাকাব্যের কবির হৃদয় ব্যাখ্যানে একটুও সাহায্য করে! কিংবা যদি রামায়ণে ব্যবহৃত ফল-ফুল, নদী-পর্বত, মানুষ-জন, মুনি-রাক্ষস—এ সবারই নানা নাম থেকে, অন্য সাহিত্যে তাদের ব্যবহার থেকে রামায়ণের স্তর-বিভাগ করতে চাই তাহলে সে

যুক্তি যতই কূট এবং মনোহারী হোক, তা সব সময়ই ধোপে টিকবে কি ? অথচ ব্রকিংটন তাই করেছেন। সমস্ত বই জুড়ে শুধু অমুক শব্দটি প্রথম স্তরে বেশি দেখা যায়, অমুকটি পঞ্চম স্তরে। দেবতার মধ্যে ইন্দ্রের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে বেশি, পশুর মধ্যে হাতীর সঙ্গে, অবশ্য তার পরেই সিংহের উপমা... লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষ্মণঃ—এখানে লাটানুপ্রাসের ঝোঁক যতখানি, তার থেকে বেশি কাজ করছে oral tradition, কারণ, পাদপূরণের সমস্যা সেখানে কম... 'পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে', 'রাক্ষসাঃ কামরূপিনঃ', 'রাক্ষসা পিশিতাশনাঃ'—এগুলি যেহেতু common stock usage অতএব Proverbial stock material বেশ কিছু ছিলই, যা বাল্মীকি বারবার ব্যবহার করেছেন—

হায় ! মহাকাব্যের কবির কাব্য বিচারের এই মাপকাঠিতে আমরা তৎকালীন এবং রামায়ণের বিভিন্ন স্তর-কালীন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, প্রকৃতি, খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার সব কিছু কত নিখুঁত এবং বৈজ্ঞানিকভাবে জানতে পেরেছি, কিন্তু মহাকাব্যের কবির যে বিশাল, ব্যাপ্ত মনোভূমি থাকে, সেটির বিচিত্র গঠন সম্বন্ধে তো কিছুই শুনলাম না। লেখকের মনোভূমির বিচিত্র আলোচনা বাদ দিয়ে যদি শুধুই স্তর-ভেদে মন দিই তাহলে যে কিরকম বিপদ ঘটে, তার একটা অপূর্ব বিশ্লেষণ করেছেন মহামতি এইচ. জে. পেটন, যদিও এ বিশ্লেষণ এক জগদ্‌বিখ্যাত দার্শনিককে নিয়ে, এবং তাঁর নাম ইমানুয়েল কান্ট। তবে পেটনের প্রতিক্রিয়ারও কিছু পূর্ব ইতিহাস আছে এবং সেজন্যে আমাকে আপাততঃ প্রসঙ্গ থেকে একটু দূরে সরে যেতে হচ্ছে। পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন এইজন্যে যে, পেটনের যুক্তিগুলি মাথায় থাকলে রামায়ণ বিশ্লেষণেও বাড়তি সুবিধে আসবে, তাই।

প্রথম কথা হল, কান্টের অনেক সুচিন্তিত গ্রন্থের মধ্যে তাঁর 'ক্রিটিক্ অব পিওর রিজন' একটি, এবং এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, কান্টের জীবদ্-দশাতেই তাঁর এই গ্রন্থটির দুটি সংস্করণ বেরিয়ে যায়। ধরে নেওয়া যায় তিনি যা লিখেছেন এবং দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত যা বেরিয়েছে, তা তাঁর মত মতই হয়েছে।

এবারে ১৯০২ সালে এক খ্যাতকীর্ত্তি জার্মান পণ্ডিত, হানস্ ফাইহিন্‌গার কান্টের গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ নিয়ে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলেন এবং তা প্রধানতঃ 'ট্রান্‌সেন্‌ডেন্টাল্ ডিডাক্‌সন্' নামক গ্রন্থাংশ সম্বন্ধে। উল্লেখ্য, কাণ্ট গ্রন্থ লেখার আগে প্রায় সব কিছুই 'ড্রাফ্‌ট' বা 'নোট' করে নিতেন, তাই ফাইহিন্‌গারের ধারণা, এবং সে ধারণা আপাততঃ অমূলক নয়, যে কাণ্টের

'ট্রানসেনডেন্টাল্ ডিডাক্সন্'-এর সবটাই হল জোড়াতালি দিয়ে লেখা—'ফ্রাগমেন্টস্' এবং তা এক সময়ে লিখিত নয়, বিভিন্ন সময়ে লেখা। জোড়াতালির এই অংশগুলি কখন কিভাবে লেখা হয়েছে সেইটি সঠিকভাবে নির্ধারিণ করাই ছিল ফাইহিন্গারের কাজ। এই কাজের জন্য তিনি কাণ্টের লেখা গ্রন্থটির গোটা চারেক স্তর খুঁজে বার করেন। কাণ্টের সারা জীবনের ছোট্ট ছোট্ট 'ড্রাফ্ট', 'নোট' কিংবা বি. আর্ডমান এবং রিকের সম্পাদিত কাণ্টের সংস্করণগুলির পৃষ্ঠাগুলিতে পার্শ্ব-মন্তব্য দেখে দেখে এই স্তর খুঁজে বার করার কাজ ছিল অত্যন্ত পরিশ্রম সাধ্য, যা ফাইহিন্গারের মত সুযোগ্য পণ্ডিতের পক্ষেই একমাত্র সম্ভব। এই স্তর বিভাজনের ব্যাপারে তিনি কতগুলি মাপকাঠিও (criterion) ঠিক করে দেন, যা কাণ্টের দার্শনিক বিবর্ত্তনের নিরিখে আপাত-অমূলক ছিল না ; কেননা কান্টের 'ট্রান্সেন্ডেন্টাল্ ডিডাক্সনের' মধ্যে 'কাঠিন্য, অবোধ্যতা, আপাত-বিরোধ এমনকি ভুলও আছে।'

১৯২৯-৩০ সালে এইচ. জে. পেটন, ফাইহিন্গারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটির কথা মনে রেখেও প্রধানতঃ তাঁর মতের বিরোধিতা করে একটি কালজয়ী প্রবন্ধ লেখেন, যার নাম—ইজ দ্য ট্রানসেনডেন্টাল ডিডাক্সন্ আ প্যাচ্ওয়র্ক। পেটন লিখেছেন কান্টের বিষয়ে যাঁরা পণ্ডিত তাঁদের মধ্যে ফাইহিন্গারই বোধহয় সবচেয়ে বড়—perhaps the most distinguished of all Kantian Scholars. পেটন স্বীকার করেছেন যে, কান্টের ওপর লেখা হাজারো টীকা-টিপ্পনী এবং প্রবন্ধ পড়ে তিনি যতটুকু কাণ্ট বুঝেছেন, তার থেকে অনেক বেশি বুঝেছেন ফাইহিন্গারের ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি পড়ে। এত সম্মান দিয়েও পেটন কিন্তু ফাইহিন্গারের প্রবন্ধটির অনেকগুলি ত্রুটি বার করেছেন, তার মধ্যে প্রধান হল—সেই স্তর খুঁজে বার করার পদ্ধতি। পেটনের মতে কাণ্ট যেহেতু বোকাও ছিলেন না এবং অসৎও ছিলেন না— neither unintelligent nor dishonest—তাই ফাইহিন্গারের অনুসৃত পদ্ধতি তাঁর লেখার পরিসরে খাটে না। কেন খাটে না—তা পেটন বহু যুক্তি জাল বিস্তার করে দেখিয়েছেন এবং প্রায় সফলও হয়েছেন। এক্ষেত্রে পেটনের বিরোধিতার মূল বিষয় ছিল কিন্তু সেই মাপকাঠিগুলি (criterion), যেগুলির দ্বারা ফাইহিন্গার কাণ্টের গ্রন্থটিকে বলে বসেন— cast out, thrown together; and in part they cross one another. ফাইহিন্গার মনে করেন—কাণ্ট হঠাৎ এবং তাড়াতাড়ি করেই তাঁর এই কঠিন অধ্যায়খানি (ট্রান্সেন্ডেন্টাল্ ডিডাক্সন্) শেষ করে দেন এবং তা করেন এই আশায় যে দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি সংশোধনের সুযোগ পাবেন।

ফলে কি হল ? পূর্বাহ্নে লেখা প্রথম স্তরের ভাবনা-চিন্তাকে কাণ্ট জুড়ে দিলেন তাঁর পরবর্ত্তী এবং পরিণত ভাবনার সঙ্গে—the earliest and the latest levels are brought together here....ফাইহিন্‌গার বলেছেন, এই অবস্থায় কেউ যদি ভূতাত্ত্বিকের মত কাণ্টের মিশ্রশৈলীর স্তরগুলি খুঁজে বার করে তাঁর লেখাগুলিকে সঠিক ভাবে সাজানোর চেষ্টা করেন, সে চেষ্টাকে তো স্বাগত জানাতেই হবে।

হ্যাঁ স্বাগত। পেটন বলেছেন—একশবার স্বাগত। কিন্তু স্তর (যাকে ফাইহিন্‌গার বলেছেন level আর পেটন বলেছেন Layer) বিভাজন শৈলীতে কেউ যদি ভুল প্রণালী অবলম্বন করেন, তাহলে সে প্রণালী ভুল ফল দিতে আরম্ভ করবে। কাণ্টের অনেক টীকা-টিপ্পনীরই দিনক্ষণ জানা যায় না, আবার অনেকগুলির দিনক্ষণ জানাও যায়। যেগুলির দিনক্ষণ জানা গেছে, সেগুলির ব্যাপারে ফাইহিন্‌গারের স্তরবিভাজন নীতি প্রয়োগ করলে অনেক ক্ষেত্রেই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে বলে পেটন প্রমাণ করেছেন। সেক্ষেত্রে কাণ্টের যে সব লেখার দিনক্ষণ মেলে না, সেখানে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা কতখানি— if the criterion gives us such false results when applied to arguments whose date we know, how can we have any confidence in its application to arguments whose date we do not know?

পেটন লক্ষ্য করেছেন, যে, শুধুমাত্র কাণ্টের অমূল্য গ্রন্থখানির ক্ষেত্রেই নয়, এই 'লেভেল' বা 'লেয়ার' খুঁজে বার করবার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রচেষ্টা আরও অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে। এই চেষ্টা হয়েছে বাইবেলের 'ওল্ড' এবং 'নিউ টেস্টামেন্টে'-এর বিশ্লেষণে, হোমারের মহাকাব্যে, রোলাণ্ডের কবিতায় এবং প্লেটোর ডায়ালোগে। বোধ করি রামায়ণ-মহাভারতের কথা তাঁর জানা থাকলেও—এই দুই মহাকাব্যের স্তর-নির্ণয়ের বিচিত্র পদ্ধতির কথা তাঁর জানা ছিল না। ফাইহিন্‌গার যে পদ্ধতিতে কাণ্টের ছেঁড়া-পাতার (lose Blatter) বিচার করেছেন, সে পদ্ধতি আপাত অমূলক মনে না হলেও, পেটন বলেছেন, কাণ্টের সামগ্রিক তত্ত্ব-বিচারে সে পদ্ধতি অপ্রতুল এবং লঘু— Seldom indeed can so slight an instrument have been applied to so heavy a task.

আমরাও একই কথা বলি। রামায়ণ মহাকাব্যের ভাষা বিশ্লেষণ হয়তো ব্রকিংটনের best starting point কিন্তু সেইটাই সব নয়। কোন পণ্ডিত

আবার 'প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক' নানারকম ব্যাখ্যা করে—এই প্রসঙ্গ এখানে খাটে না, অতএব এটি প্রক্ষিপ্ত... এটি মূল কাহিনীর সঙ্গে বেখাপ্পা, অতএব এটি প্রক্ষিপ্ত—এমনি হাজারো বিচার-কণ্টকে রামায়ণকে ছেঁটে-ছুঁটে একেবারে পাতি পেপার-ব্যাকে হাজির করে দেবেন। পেটন যে রকম ফাইহিন্‌গারকে কাণ্টের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তেমনি আমরা কিন্তু এই মহাপণ্ডিতদের মহাকাব্যের পরিসরের কথাই স্মরণ করিয়ে দেব। কাণ্ট বলেছিলেন,

> In every writing, above all when it proceeds as a free discussion, it is possible to ferret out apparent contradictions by comparing together isolated passages torn from their context. Such apparent contradictions cast a prejudicial light upon it in the eyes of those who depend upon critism at second hand, but they can be easily solved by any one who has mastered the idea as a whole.

বাল্মীকির রামায়ণ বিচারের ক্ষেত্রে কাণ্টের এই বক্তব্যকে আমি সবচেয়ে দামী বলে মনে করি, কেননা রামায়ণ-মহাভারতকে দেশী বিদেশী পণ্ডিতেরা ব্যবহার করেছেন ঠিক গণিকার মত। পুরাতনেরা কেউ এগুলিকে দেখেছেন ধর্মগ্রন্থ বলে, কেউ বা কাব্য বলে। আর আজকাল যে প্রবৃত্তি বড় বেড়েছে, তা হল প্রসঙ্গ থেকে ছিড়ে এনে তৎকালীন সাধারণ মানুষের প্রতিকূল এক বিশেষ ধরনের আর্থ-সামাজিক 'প্যাটার্ন' খুঁজে বার করা। এবং তাতে এই স্তর-বিভাজনের প্রক্রিয়াটি বড় বেশি কাজে লাগে বলে, অনেক পণ্ডিতেরাই এখন বিস্ময়-মুকুলিত নেত্রে এই স্তর-বিভাজনের সাফাই গান। আমরা হ্বেবার সাহেবকে বেশি আমল দিতে চাই না, তার কারণ এই নয় যে, রামায়ণের স্তর-নির্ণয়ে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি অমূলক এবং সমূলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে ; কারণ এই যে, এ দেশের অনেক কিছুই তাঁর ভিনদেশী নীলচোখে বিকৃত এবং নেতিবাচক লেগেছে। তার ওপরে হ্বেবার সাহেবের টোকাটুকির অভ্যাস ছিল এতই বেশি যে তাতে এক বস্তু আরেক বলে প্রমাণিত হয়েছে, বিশ্বাস না হয় দীনেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা' (পৃ· ১৮) দেখুন।

ব্রকিংটনকে নিয়ে আবার অন্য জ্বালা। রামায়ণের ভাষার ওপর তিনি এতই বেশি নির্ভরশীল এবং তাঁর সমস্ত বিশ্লেষণই, সে রামায়ণের সমাজই হোক কিংবা রাজনীতি, এত বেশি ভাষামুখীন যে, যে কোন সময়ই অন্যতর যুক্তিতর্কের কাছে তা ভেঙে পড়তে বাধ্য। ব্রকিংটনের আদর্শে রামায়ণ মহাকাব্যের প্রতিস্তরের

ভাষা শুধুমাত্র সমান্তরাল শব্দ-ব্যবহারের নিকষে পরীক্ষিত হওয়া মাত্রই স্তর ভেদ সূচনা করে। আমাদের ধারনায় সেখানে যুক্তি বড়ই একপেশে হয়ে পড়ে। পেটিনের মত আবার তখন সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে হয়—দেখ বাপু! One criterion is not enough—তুমি মহাকাব্যের বিচার করছ, যে মহাকাব্য ভারতবর্ষীয় ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি এবং স্বয়ং নীতিশাস্ত্রের সঙ্গেও জড়িত। যে মহাকাব্য ইলিয়াড-ওডিসির পাঁচগুণ বড় এবং যে মহাকাব্যের কবির হৃদয় ক্রৌঞ্চ-পক্ষীর ক্রন্দন সুরে বাঁধা। কবির মমতা যেমন তাঁর মুখ্য নায়ক রামচন্দ্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তেমনি তাঁর প্রতিনায়ক রাবণের ওপরেও কবির মমতা কম নয়। এমন মহাকাব্যের আনাচে-কানাচে শুধুমাত্র গবেষকের শ্যেন ভাষাদৃষ্টি পৌঁছানোই যথেষ্ট নয়, দরকার সেই সমান-হৃদয় যা স্বয়ং সেই মহাকবির ছিল। কারয়িত্রী প্রতিভার বিচারের জন্য ভাবয়িত্রী প্রতিভার প্রয়োজন, যা কালিদাসের ছিল, রাজশেখরের ছিল, ভাসের ছিল অথবা ছিল মাইকেলের, রবীন্দ্রনাথের। উৎসাহের আতিশয্যে আমি এ কথা বলছি না যে, আমারও সেই সমান হৃদয়তা আছে, কিন্তু এ কথা একশবার বলছি যে মহাকাব্যের বিচারে মহাকবির সামগ্রিক শৈলীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা দরকার, যা অনেক দুর্বোধ্যতা, বিরোধিতা বা 'inconsistency' কাটিয়ে দেবে।

হ্যাঁ, পণ্ডিতদের তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে এমন কথা আমার বলার সাধ্য নেই যে, রামায়ণকে যেমনটি আজকের দিনে পাই, বাল্মীকির আমলেও তেমনটি ছিল। অর্থাৎ কিনা রামায়ণ একেবারে প্রক্ষেপের অবলেপ মুক্ত, এ কথা আমি বলছি না। কিন্তু আপনি যদি বলেন, রামায়ণের বালকাণ্ড এবং উত্তর কাণ্ড—দুটোই সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত তাতে আমাদের আপত্তি আছে। গবেষককুল ব্রকিংটনের মত প্রমাণ দেখিয়ে বলবেন—দেখ বাপু! এই ধর না কবির কথার সাধারণ মাত্রাগুলি। কবি বালকাণ্ডে পাঁচবার বলেছেন—এতস্মিন্ এব কালেতু—মানে বাংলায় গল্প করতে গেলে যেমন বলি—এমন সময় হল কি...। তা দুঃখের মধ্যে কবি পাঁচবার এই বাক্যধারা বালকাণ্ডে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু অযোধ্যাকাণ্ড থেকে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত একবারও ব্যবহার করেননি। কিন্তু এই গল্প বলার ধরনটি যেহেতু মহাভারতের রামোপাখ্যানে একান্ন বার ব্যবহার হয়েছে অতএব বালকাণ্ড লেখা হয়েছে মহাভারতের পরে। আবার বাংলা তর্জমায় ঠিক একই কথা—এতস্মিন্ অন্তরে—অর্থাৎ 'এর মধ্যে হল কি... এই কথাটি বালকাণ্ডে এসেছে একবার, অযোধ্যা থেকে যুদ্ধ কাণ্ড পর্যন্ত ষোল বার, এবং এক উত্তর কাণ্ডেই ব্যবহার হয়েছে সতের বার। তফাৎ শুধু—উত্তর কাণ্ডে আছে

এতস্মিন্নন্তরে সুরাঃ'... 'এই সময়ে দেবতা করলেন কি...' এই করলেন, সেই করলেন। আর ব্রকিংটনের মতে মূল কাণ্ড-পঞ্চকের মধ্যে আছে 'এতস্মিন্নন্তরে বীরা'... 'এই সময়ে বীরপুরুষেরা করলেন কি...' এই করলেন, সেই করলেন। মহাভারতে এই বাগধারা আছে ছাব্বিশ বার। অতএব ব্রকিংটনের ধারণা, যদিও স্পষ্ট করে তিনি এখানে আর কিছু বলেননি, তবে তফাৎটা দেখিয়ে বলতে চাইলেন—উত্তরকাণ্ডের কবির এই বাগ্‌ধারাটি বেশ পছন্দ হয়েছে, তাই মূল কাণ্ড-পঞ্চকে যেটি ষোল বার মাত্র ব্যবহার হয়েছে, সেটির একটি পদ পরিবর্তন করে এক উত্তরকাণ্ডেই ব্যবহার করেছেন সতেরবার। অতএব উত্তরকাণ্ড পরে লেখা হয়েছে।

হায়! রামায়ণ মহাকাব্যের কবি যদি জানতেন যে, কলিকালের এক সাহেব তাঁকে সংস্কৃত বাগ্‌ধারার দাওয়াই দিয়ে তাঁর মহাকাব্যখানি একেবারে ওলট-পালট করে দেবেন, তাহলে তিনি একটু ভাবনা-চিন্তা করতেন বই কি? তবু শত ভাবনা করলেও তাঁর এই বদভ্যাস যেত বলে মনে হয় না। কেননা তিনি যে মহাকাব্যের কবি, তিনি তো আজকের ধারণা অনুযায়ী ছোটগল্প লিখতে বসেননি যে মেপে মেপে শব্দ ব্যবহার করবেন। তাছাড়া এইগুলো কোন যুক্তি হল! বাল্মীকির মত মহাকবি, যিনি দু-আড়াই হাজার বছর ধরে শুধুমাত্র শব্দমন্ত্রেই সংসার জয় করে এসেছেন, তাঁকে যদি সরল ভাষাশিক্ষা দিয়ে বলি—অমুক শব্দ অমুক কাণ্ডে এতবার আর অমুক কাণ্ডে অতবার, ব্যবহার করলে বা না করলে আমরা মনে করব এইটা আগে লেখা, আর ওইটা পরে লেখা, তাহলে সেটা কতখানি হাস্যকর হয়, সেটা শৈলসার গবেষকের হৃদয়ে মালুম হবার জো নেই। আরও হাস্যকর, এরকম ছেঁদো ভাষাযুক্তি ব্রকিংটন আরও দিয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর ভাষাযুক্তি যথেষ্ট জোরালো সন্দেহ নেই, কিন্তু এইরকম যুক্তির ভিত্তিতে তিনি যদি বলেন—অযোধ্যাকাণ্ডে রামায়ণ আরম্ভ হলে কোনই ক্ষতি নেই, তাহলে আমরা বলব—ক্ষতি আছে। কি ক্ষতি, তা সাহেবকে বোঝানো মুস্কিল। তবে এটুকু তো বলতেই পারি যে, অযোধ্যাকাণ্ডে রামায়ণ আরম্ভ হতে পারে না। সাহেব বলবেন—অযোধ্যাকাণ্ডে রামায়ণ আরম্ভ হলেও there is ample dramatic justification, কিন্তু আমরা বলব—বাল্মীকি তো নাটক লিখতে বসেননি যে তাঁকে 'সাসপেন্স' দিয়ে লেখা আরম্ভ করতে হবে এবং ভারতবর্ষীয় সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা বলে যে, 'সাসপেন্স' কিংবা নাটুকে কায়দায় মহাকাব্য আরম্ভ হয় না। অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথমেই ভরত মাতুলালয়ে যাচ্ছেন, রামের প্রশংসা শোনা যাচ্ছে এবং দশরথ সভা ডেকে রামকে যুবরাজ করার প্রস্তাব

দিচ্ছেন। পরিষ্কার জানাই, রামায়ণ মহাকাব্যের মহানায়ক রামকে দিয়ে কথা আরম্ভ না করে, ভরত-শত্রুঘ্নকে দিয়ে রামকথা আরম্ভ করা বাল্মীকির পক্ষে সম্ভবই নয়—মহাকাব্যে এ জিনিস হয় না। স্বয়ং যে কালিদাস যিনি বাল্মীকিকে অবলম্বন করেই রঘুবংশ লিখেছেন তাঁকে পর্যন্ত রামকথা আরম্ভ করতে হয়েছে রামের চার পুরুষ আগে থেকে। আগে দিলীপ, তারপর রঘু, অজ, দশরথ, সবার কথা তাঁকে সবিস্তারে বলতে হয়েছে। কালিদাস তাঁর মত করেই রাম কথা লিখেছেন। কিন্তু রামের কোন পূর্ব প্রসঙ্গ নেই, তাঁর বাপ-ঠাকুর্দার পরিচয় নেই, তাঁর জন্ম নেই, অস্ত্রশিক্ষা নেই, ভাইদের পরিচয় নেই, বিবাহ নেই ; হুট করে বললাম— ভরত শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়ে মামাবাড়ি চললেন— আর মহাকাব্য আরম্ভ হয়ে গেল, এই কি হয় নাকি ? বরঞ্চ জ্যাকোবি অনেক ভাল কথা বলেছিলেন। তিনি অন্ততঃ স্বীকার করেছিলেন যে অযোধ্যাকাণ্ডের প্রস্তাবনা হিসেবে বর্তমান বালকাণ্ডের কিছু অংশকে স্বীকার করে নিতেই হবে, যদিও সে অংশটুকু অযোধ্যাকাণ্ডের সঙ্গেই নাকি পূর্বকালে সংযুক্ত ছিল। এসব খবর পণ্ডিতদের কানে কানে বাল্মীকির ভূত এসে বলে যায়নি, তাঁরা আপন আপন পাণ্ডিত্যের ভূয়োদর্শন ক্ষমতায় এসব কথা প্রমাণ করেছেন মাত্র।

স্বীকার করে নিলাম—রামের জন্মকথায় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির গপ্পোটা বাড়াবাড়ি ; কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞটিকে বাদ দেবেন কি করে ? মহাকাব্যের গল্পাংশে—এক রাজা ছিল। তাঁর নাম দশরথ। তাঁর সব সুখ ছিল, কিন্তু বংশকর পুত্র ছিল না—এ কি কোন বাড়তি কথা ? তার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করা—এই তো সেকালের রীতি। বিশেষতঃ পুত্র প্রাপ্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা তো দশরথই প্রথম ভেবেছিলেন—সুতার্থং বাজিমেধেন কিমর্থং ন যজাম্যহম্। অশ্বমেধ যজ্ঞ করার এই ইচ্ছা দশরথ প্রকাশ করলেন কুল-পুরোহিত বশিষ্ঠের কাছে, অন্যান্য ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরাও তখন সভায় উপস্থিত। তাঁরা সবাই একবাক্যে বললেন, আপনি অবশ্যই পুত্র লাভ করবেন—যজ্ঞের আয়োজন করুন, যজ্ঞের ঘোড়া ছেড়ে দিন এবং সরযু নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি বানিয়ে ফেলুন—সম্ভারাঃ সংভ্রিয়ন্তাস্তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্। সরযবাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমি র্বিধীয়তাম্ ॥

এই শ্লোকটি খেয়াল করুন। বশিষ্ঠ্যের এই অনুমতির পরেই রাজা রানীদের সঙ্গে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছেন। কিন্তু তার পরের সর্গেই দেখা যাবে সুমন্ত্র দশরথকে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাহিনী শোনাচ্ছেন এবং দুই-তিন সর্গে সে কাহিনী শুনিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে আসাও হল। তারপর সে কাহিনী খাপ খাওয়ানো হল ঠিক যেমন মুনিরা বলেছিলেন—যজ্ঞের আয়োজন করুন, যজ্ঞের ঘোড়া ছেড়ে

দিন... সন্তারা সংভ্রিয়ন্তাস্তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্—এই শ্লোকের সঙ্গে। শ্লোকটিও আরও দু-তিনটি পূর্বকথিত শ্লোকের সঙ্গে পুনরুচ্চারিত হল। মুনিরা এখানে আরও পরিস্কার আশ্বাস দিয়েছেন—আপনার চারটি পুত্র হবে। বেশ বোঝা যায় ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনীটি অবশ্যই পরে সংযোজিত হয়েছে। তা ছাড়া অশ্বমেধ যজ্ঞের পরেও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মুখ দিয়ে বেরিয়েছে—মহারাজ! আপনার চারটি পুত্র হবে। কাজেই এর পরেও ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ বৃথা, কারণ পুত্রকাম দশরথের পুত্র জন্মের সম্ভাবনা করে দিয়েছে অশ্বমেধ যজ্ঞই, ঘোড়া তিনবার খড়্গাঘাতে স্বয়ং কৌশল্যাই ছেদন করেছেন। কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞে একজন স্ত্রী, মনে রাখবেন স্ত্রীলোক, কোন পুরোহিত নয় কিংবা তাঁর যজমান পুরুষও নয়, একজন স্ত্রীলোক বৈদিক কর্মে এমন সক্রিয় অংশ নিচ্ছেন—এ ঘটনাও তো স্ত্রীলোকের সন্ধ্যা-বন্দনার মতই প্রাচীন। কাজেই অশ্বমেধ যজ্ঞটিকে বোধ হয় মূল রামায়ণ থেকে বাদ দেওয়া চলবে না, এবং বাদ না দিলে রাম-লক্ষ্মণ, ভরত-শত্রুঘ্নের জন্ম-সম্ভবও ভাগ্যক্রমে হয়ে যাবে।

রাম বিষ্ণুর অবতার, সুগ্রীব সূর্যের অবতার—এ সব বৈষ্ণবীয় ভাবনা নিঃসন্দেহে বালকাণ্ডের ভার বাড়িয়ে তুলেছে। কিন্তু বালকাণ্ডে তাড়কা রাক্ষসীকে না মেরে, রাম-সীতার বিয়ে না দিয়ে আমরা অযোধ্যা কাণ্ডে যাই কি করে ? আর দুটি কাজই যদি রামকেই করে থাকতে হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই বিশ্বামিত্র মুনির হাত ধরে তাড়কা রাক্ষসীকে মারবার জন্য বনে পাঠাতেই হবে। সাহেব ভাষা-ছন্দ মিলিয়ে বলে দিলেন—**The whole of Visvamitra episode (1. 31-64) lacks direct relevance to the main story of Rama and could be omitted.** সাহেব জানেন না যে, ভারতবর্ষীয় মহাকাব্যের রাজপুত্রদের অস্ত্রপরীক্ষা দিতে হয়, এবং রামায়ণ মহাকাব্যের যে দুই নায়ক রাম-লক্ষ্মণ পরে এত যুদ্ধ করবেন, তাদের পনের বচ্ছর বয়স হয়ে গেল, অথচ তাদের কোন অস্ত্রপরীক্ষা হবে না—এটা হয় না। বাল্মীকি মূলতঃ কবি, তাই তিনি দুই রাজপুত্রকে অযোধ্যার মাঠে হাজির করেননি, তিনি সুকৌশলে বিশ্বামিত্রকে নিয়ে এসেছেন রাজসভায়। দশরথ যখন কিছুতেই রাম-লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে ছেড়ে দিতে রাজী হচ্ছিলেন না, তখন বশিষ্ঠ বলেছেন—মহারাজ! আপনার ধারণা অনুযায়ী রাম অস্ত্রকুশলই হোন বা অকুশল হোন—কৃতাস্ত্রম্ অকৃতাস্ত্রং বা নৈনং শক্ষ্যন্তি রাক্ষসাঃ—রাক্ষসেরা এর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। তার ওপরে বিশ্বামিত্র এদের সব সময় রক্ষা করবেন, কারণ বিশ্বামিত্র যেমন ধার্মিক তেমনি বীর পুরুষ, ইনি তপশ্চর্যায়

যেরকম, অস্ত্রবিদ্যাতেও সেইরকম—এযো'স্ত্রান্ বিবিধান্ বেত্তি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। নৈনম্ অন্যঃ পুমান্ বেত্তি ন চ বেৎস্যন্তি কেচন ॥ ইনি যেমন অস্ত্রবিদ্যা জানেন তেমনটি কেউ জানে না, কারও পক্ষে জানা সম্ভবও নয়। এর পরে বিশ্বামিত্র কত-শত অস্ত্রচালনা জানেন এবং কত অস্ত্র তাঁর আছে—সেসবের একটা বিবরণ দিয়ে বশিষ্ঠ বললেন—মহারাজ! বিশ্বামিত্র একাই সব রাক্ষস মেরে ফেলতে পারেন, তবু যে তিনি এখানে এসেছেন সে শুধু আপনার পুত্রের ভাল চান বলে, নইলে তাঁর দায় কি! এর পর মহারাজ দুই ছেলেকেই বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যেতে দিলেন।

আমাদের মত বশিষ্ঠও বোধ করি জানতেন যে বিশ্বামিত্র আগে ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজা, পরে ব্রাহ্মণ। মহাভারতের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য জাতে ব্রাহ্মণ, কাজে ক্ষত্রিয়। এই দো-আঁশলা লোকগুলিই অস্ত্রশিক্ষার সবচেয়ে বড় গুরু বলে মহাকাব্যগুলিতে চিহ্নিত। বিশ্বামিত্রের পূর্বজীবনের ক্ষাত্র-শিক্ষা, যা তিনি ব্রাহ্মণ্য-আচারের মধ্যেও ত্যাগ করেছিলেন কিনা সন্দেহ, সেই শিক্ষা যে রাম-লক্ষ্মণের কাজে লাগবে—একথা বশিষ্ঠ বুঝেছিলেন বলেই উপযুক্ত আধারকে আধান কর্তার সঙ্গে যোগ করে দিয়েছিলেন। হলও তাই, পথে যেতে যেতে এই মন্ত্র, সেই মন্ত্র, নানা উপদেশ বিশ্বামিত্রের মুখ থেকে শোনা গেল বটে, কিন্তু ঝুনো বুড়ো ভুলেও তাঁর অস্ত্রশস্ত্রের একখানাও রাম-লক্ষ্মণকে দেননি। যেদিন তাড়কা-বধ হল এবং বিশ্বামিত্র বুঝলেন—হ্যাঁ বাহাদুর ছেলে বটে—পাত্রভূতো' সি রাঘব—তখন একগাদা অস্ত্র-শস্ত্র দিলেন, এবং তার প্রয়োগবিধিও রামের কাছে বাতলে দিলেন। অস্ত্র-পরীক্ষা এবং শিক্ষার এই রীতি বাল্মীকির মত কবির পক্ষেই এমনভাবে কাব্যশরীরে ন্যস্ত করা সম্ভব। কাজেই আমাদের ধারণা—রামায়ণী কথা থেকে বিশ্বামিত্রকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া বেরসিকের মত কাজ হবে। কারণ আমরা জানি—স্নেহান্ধ রাজা দশরথ ক্ষত্রিয় ছেলেদের অস্ত্র-শস্ত্রের পারদর্শিতা না জেনে আগেই তাদের বিয়ের জন্য চিন্তিত ছিলেন। বিশ্বামিত্র আসবার আগেই দশরথকে দেখছি, তিনি গুরু এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে ছেলের বিয়ে নিয়ে চিন্তা করছেন—অথ রাজা দশরথস্তেষাং দারক্রিয়াং প্রতি। চিন্তয়ামাস ধর্মাত্মা সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ ॥ এই সময়েই বিশ্বামিত্র উপস্থিত হন।

বিশ্বামিত্রের হাত ধরেই রাম-লক্ষ্মণ মিথিলায় উপস্থিত হন এবং সেইখানেই চার ভায়ের বিয়ের ব্যবস্থা হয়। এর মধ্যে বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠের ঝগড়ার ব্যক্তিগত কাহিনী, রামের পূর্ব পুরুষ সগর রাজার কাহিনী কিংবা ভগীরথের গঙ্গা আনার

কাহিনী, অহল্যার কাহিনী—এগুলি হয়তো সবই পরবর্ত্তী কালের সংযোজন। কিন্তু বালকাণ্ডেই বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণকে জনকের রাজসভায় হরধনু ভাঙবার জন্য না পাঠালে বাল্মীকির চলবে কি ? অযোধ্যাকাণ্ড থেকে কাহিনী আরম্ভ করে সেই কাণ্ডের মাঝখানে আমরা জানতে পারব রামের বৌয়ের নাম সীতা—এমন প্রস্তাব বাল্মীকির সইবে না। তার চেয়ে পরশুরামের কাহিনী বাদ দিন, অহল্যা বাদ দিন, এটা সেটা যা বলেছি আরও কিছু বাদ দিন, কিন্তু বিশ্বামিত্রকে বাদ দেবেন না, সীতার বিয়ে বাদ দেবেন না, রামের জন্ম বাদ দেবেন না। সাবধানীরা বলেছে—সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। যে অর্ধেক থাকবে তাতেই বাল্মীকি তাঁর পরবর্ত্তী কাণ্ডগুলির পরিকল্পনা করে নিতে পারবেন।

এবারে উত্তর কাণ্ডের কথা বলি। উত্তর কাণ্ডের প্রধান দোষ, এবং যে দোষের জন্য পণ্ডিতেরা একে বাল্মীকির লেখা বলতে রাজী নন, তা হল—এই কাণ্ডের প্রথমেই সমস্ত ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরা অযোধ্যায় এসে রাজা রামচন্দ্রকে রাবণ-বধের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন। শুধু কৃতজ্ঞতা হলেও হত। মুনি-প্রবর অগস্ত্য এইখানে রাবণ এবং অন্যান্য লংকা-নায়কদের পূর্ব জীবনের কাহিনী বলতে আরম্ভ করেন। এই কাহিনীর মধ্যে বালি-সুগ্রীবের জীবন-বৃত্তান্তও আছে। পণ্ডিতদের ধারণা, যে সব ঘটনা বা ঘটনা-পরম্পরা বাল্মীকি মহাকাব্যের বিষয়বস্তু তার সঙ্গে উত্তর কাণ্ডের এই জীবন কাহিনী বলার কায়দাটি মেলে না। রাম প্রশ্ন করছেন আর অগস্ত্যমুনি এক কাহিনী থেকে আরেক কাহিনীতে চলে যাচ্ছেন, এ সব যেন অনেকটা মহাভারতীয় বাচনভঙ্গী, যে ভঙ্গী বালকাণ্ডেও দু/এক জায়গায় আছে। আমার বক্তব্যেও বালকাণ্ডের সে সব জায়গা আমি বাদ দিয়েছি, উত্তর কাণ্ডেও না হয় বাদ দেব। কিন্তু কোন্ অংশ একেবারেই বাদ দেওয়া যাবে না, তারও একটা মীমাংসা হওয়া দরকার বৈ কি !

রাম-রাবণের যুদ্ধকাণ্ড যেভাবে শেষ হল, মহাকাব্য সেভাবে শেষ হয় না। ইলিয়াডের কবিকেও তো ওডিসি লিখতে হয়েছিল। বাল্মীকি রাবণের কথা বলেছেন, বালি-সুগ্রীবের কথাও বলেছেন, বলেছেন হনুমানের কথাও। অরণ্য কাণ্ড থেকে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত এদের সবারই একটা ছবি পাই বটে, তবে তা ছেঁড়া-ছেঁড়া, কাটা-কাটা। মনে রাখা দরকার—আমাদের দেশে যেমন দুর্গা-পূজা হয়, তেমনি মহিষাসুরেরও পূজা হয়। মহাকাব্যের কবির কাছে উদাত্ত নায়কের বল বীর্য বিভূতি বর্ণনা যতখানি অভীষ্ট, তাঁর কাছে প্রতিনায়কের ভূমিকাও ততখানি গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে প্রতিতুলনায় নায়ক রামচন্দ্রের শৌর্য-বীর্য

বর্ণনার অর্থ থাকে না। বস্তুতঃ অরণ্যকাণ্ড থেকে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত যতখানি রাবণের ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য বর্ণনা আছে, তা সামগ্রিক না হলেও বাল্মীকির মমতা সেখানে যথেষ্ট স্পষ্ট চেহারায় ধরা দিয়েছে ; না হলে বাংলার কবি মাইকেলের পক্ষেও রাবণের পক্ষ নেওয়া সম্ভব ছিল না। যে কোন বুদ্ধিমান লোকই রামায়ণ পড়লে বুঝতে পারবেন যে, রাবণের ভাব-ভঙ্গী এবং ঐশ্বর্যের কাছে রাম চরিত্র প্রায় ম্লান, এমনকি লঙ্কাপুরীর কাছে অযোধ্যার ঐশ্বর্যও একেবারে হতশ্রী। রাম রাজত্ব হারিয়ে বনে গেছেন, সৈন্যসামন্তহীন জটাধারী তপস্বীর বেশে বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তার মধ্যেও হাজারটা বিপদ এসেছে, তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত চুরি গেছে—এই করুণ অসহায় অবস্থার মধ্যে দিয়েও সততা এবং নীতিবোধের যে জয় হল, মহাকাব্যের কবি জানেন যে, সততা ও নীতিবোধের সুবাদেই তা করা যায়। কিন্তু তার মধ্যে রাজকীয়তা নেই, ঐশ্বর্য নেই, আড়ম্বরও নেই। এই সমস্ত কিছুর জন্যেই তাঁকে তিলে তিলে রাবণচরিত্র গড়তে হয়েছে। এ হেন যে প্রতিনায়ক, তার কি পূর্ব জীবন বলে কিছুই থাকবে না! কিংবা যে বানরবাহিনীকে সহায় করে রাম ভীষণ যুদ্ধে জিতে গেলেন সেই বানর বীরদের পূর্বজীবন বলে কি কিছুই থাকবে না! মহাকাব্যের পাকা বাঁধুনীর মধ্যে এসব কাহিনী লেখার অসুবিধে ছিল, কাজেই তার অবসর খুঁজতে হয়েছে পরে। হ্যাঁ, স্বীকার করছি—অগস্ত্যের মুখে কাহিনীগুলি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবে বাল্মীকি নাও লিখে থাকতে পারেন। কিন্তু বাল্মীকি যে সেগুলির আভাস মাত্র দেননি, কিংবা সেসব কাহিনীর স্থিরাংশগুলি একটুও রেখাঙ্কিত করেননি—একথা কি জোর দিয়ে বলা যায় ? পণ্ডিতেরা বলেছেন, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড নাকি 'ব্রাহ্মণাইজেশনে'র ব্যাপার, অর্থাৎ কিনা রাম মানুষ ছিলেন, দেবতা হইয়াছেন। রাবণের সঙ্গে দেবতারাও যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারছেন না, অতএব বিষ্ণু বলেছেন, সময় আসুক রাবণকে মারব—তা এই বিষ্ণুর অবতার গ্রহণের সংকল্পটা না হয় রামায়ণ থেকে ছেঁটেই ফেলুন। ছেঁটে ফেলুন সেই সব অংশ যেখানে মুনিরা রামচন্দ্রকে নারায়ণ, কিংবা বিষ্ণু বলে সম্বোধন করেছেন। সবই না হয় গেল, কিন্তু একথা কি করে অস্বীকার করতে পারবেন যে, মূল রামায়ণ অর্থাৎ সেই অযোধ্যাকাণ্ড থেকে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত যাকে পণ্ডিতেরা মূল রামায়ণ বলছেন, সেখানে তো অজস্রবার রাবণকে দেবজয়ী, স্বর্গক্ষয়ী, সুরত্রাস এসব বিশেষণে অনবরত ভূষিত করা হয়েছে। অথচ পণ্ডিতেরা ভাবলেন—মূল কাণ্ডপঞ্চকে রাবণের এই সব বিশেষণ থাকে থাকুক কিন্তু তার স্বর্গজয়ের ইতিহাস না থাকলেই হল। কিন্তু এইভাবে কি ইতিহাসকে স্তব্ধ করা যায় ?

আরও একটা কথা বলি। ভারতবর্ষীয় সামাজিক গঠনের নিরিখে একান্তভাবে দেবত্ববর্জিত নরচন্দ্রমার বর্ণনা বড়ই কঠিন। যে কবি মানুষভাবে মনুষ্যচরিত্র বর্ণনা আরম্ভ করেছেন, সেই মনুষ্য নায়কের চরিত্রের মধ্যেই যদি অতিদেবের কল্পনা থাকে তবে উত্তরপর্বে একই কবির পক্ষে তার মধ্যে দেবত্ব আরোপন একেবারে অসম্ভব নয়। তা পণ্ডিতদের কলমের আঁচড়ে উত্তর রামায়ণে রামের দৈবী কল্পনা না হয় বাদই গেল। কিন্তু তারপর ? তারপর তো আর পণ্ডিতের কথা মানতে পারছি না। মনে রাখা দরকার, যে মহাকবি কাব্য রচনা করেন, সে কবির আপন নায়ক-নায়িকার ওপর যেমন মমতা থাকে, তেমন পাঠকের ওপরেও তাঁর কিছু মমতা থাকে। যেখানে রূপকথার কাহিনীতেও অন্তিম মুহূর্তে শুনতে পাই—অতঃপর তাহারা রাজপুরীতে সুখে কাল কাটাইতে লাগিল—সেখানে মহাকাব্যের পাঠককুলের কোন প্রত্যাশা থাকবে না, তারা জানতে চাইবে না মহাকবির নায়ক-নায়িকার অন্তিম জীবনের পরিণতি কি? রামচন্দ্র রাজা হবার মুখেই বনে নির্বাসিত। নায়িকা রাজরানী হবার মুহূর্তেই অরণ্যচারিণী। শুধু তাই নয়, প্রতিনায়ক তাকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে। এহেন দুর্ভাগ্যপীড়িত নায়ক-নায়িকার কি হল, এ বিষয়ে পাঠকের কোন চাহিদা থাকবে না ? লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত নায়ক আর প্রতিনায়কের যোঝাযুঝি, বোঝাবুঝি ; কিন্তু নায়িকার সঙ্গে মিলন মুহূর্তেই মহাকাব্য শেষ ? হায়, এ কি সমাপন !

ভবভূতি সীতার অপবাদ সইতে না পেরে বলেছিলেন যে, দুর্জনেরা কবিত্বে আর স্ত্রীলোকের সাধুত্বে চিরকালই সন্দেহ প্রকাশ করে—যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ। স্ত্রীলোকের সাধুত্বের কথা না হয় পরে আসবে, কিন্তু উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষেপের অছিলায় যারা সীতা-পরিত্যাগের মত মধুর কাব্যখানি রামায়ণের বুক থেকে কেটে বাদ দিয়ে দেন, তাদেরকে 'দুর্জন' বলা ছাড়া আমার আর গতি নেই। এর মধ্যে যাঁরা আবার পঞ্চকাণ্ড থেকে উত্তর কাণ্ডের মধ্যে কাব্যলেখার 'স্টাইলে'র অন্তর দেখতে পান তাঁরা অন্ততঃ সংস্কৃত কাব্যশৈলীর কিছুই বোঝেন না এটুকু জোর দিয়েই বলতে পারি। প্রজাতোষণের জন্য রামচন্দ্র সীতা পরিত্যাগ করলেন—এ কথা আমরা আগেই দেখেছি, এ বিষয়ে রাজা রামচন্দ্রের মনস্তত্ত্বও আমরা কথঞ্চিৎ লক্ষ্য করেছি। কিন্তু লক্ষ্য করিনি কবিকে। যে কবি স্বয়ং ক্রৌঞ্চবিরহী বলে রামায়ণের মুখবন্ধেই খ্যাত, তিনি যে সর্বংসহা চিরবিরহাতুরা এক রমণীকে তাঁর নায়িকা হিসেবে বেছে নেবেন, এই তো স্বাভাবিক। ধনুর্ভঙ্গ পণে যার বিয়ে হল, সেই সুদুর্লভা রমণীকে কামুক শ্বশুরের মুখের কথায় বনে চলে যেতে হয়েছে। দীর্ঘসময় ধরে অরণ্যবাসের পর তাকে

আরও এক কামুকের হাতে গিয়ে পড়তে হয়েছে, এবং যে ভাবেই হোক, তাঁকে নিজেকে রক্ষাও করতে হয়েছে। কবি তাঁকে রক্ষা করার জন্য স্বয়ং চিন্তিত ছিলেন, যার জন্য রাবণ যাতে তাকে স্পর্শ করতে না পারেন তার জন্য রাবণের ওপর নানা অভিশাপের কাহিনী তাঁকে অবতারণা করতে হয়েছে। পণ্ডিতদের কথা আবার এসে যায়, কারণ তাঁরা উত্তরকাণ্ডের রম্ভার অভিশাপ আর লংকাকাণ্ডে পুঞ্জিকস্থলী নামে এক অপ্সরার অভিশাপের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাননি। বলা বাহুল্য, পণ্ডিত বলেই পাননি। বোধ করি পাঠকের স্মরণ আছে যে, সীতাকে বিছানায় তুলতে পারছেন না বলে রাবণ একসময়ে তাঁর মন্ত্রী-মণ্ডলীর পরামর্শ চেয়েছিলেন। আমি সেখানে কুম্ভকর্ণের সৎপরামর্শ এবং মহাপার্শ্বের সেই মোসাহেবি কথাটির কথাও উল্লেখ করেছি। মহাপার্শ্ব রাবণকে সীতাভোগের ব্যাপারে মোরগের অনুকরণ করতে বলেছিলেন। রাবণ মহাপার্শ্ব মহোদয়ের তারিফ করে বলেছিলেন—বলপ্রয়োগের উপায় থাকলে কি আর আমি তা বাকী রাখি, আসলে আমার একটা গোপন ঘটনা আছে। রাবণ বললেন—সে অনেককাল আগের কথা। পুঞ্জিকস্থলী নামে এক আগুনপানা সুন্দরী অপ্সরা আকাশপথে লুকিয়ে লুকিয়ে ব্রহ্মার কাছে যাচ্ছিল। আমি জোর করে তার পরিধেয় বসন খুলে নিয়ে উপভোগ করি—সা প্রসহ্য ময়া ভুক্তা কৃতা বিবসনা ততঃ। তারপর সেই অপ্সরা বিস্রস্তবাসে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল এবং ব্রহ্মাও সব জানতে পেরে আমাকে অভিশাপ দিলেন যে, আমি যদি জোর করে কোন রমণীকে উপভোগ করি তাহলে সেই মুহূর্তে আমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। উত্তরকাণ্ডে রম্ভার ঘটনাও প্রায় একই রকম। সে কুবেরের ছেলে নলকূবরের কাছে বাগ্‌দত্তা, সম্বন্ধে তাই রাবণের পুত্রবধূ। সে নলকূবরের কাছেই যাচ্ছিল—মাঝখানে রাবণের উৎপাত। শেষে নলকূবরের অভিশাপ, যার ফলশ্রুতি একই।

কিন্তু এতে অসামঞ্জস্যের কি হল। রাবণের যা চরিত্র, তাতে তিনি তো একটিমাত্র রমণীর শ্লীলতা হানি করেই ক্ষান্ত হবার লোক নন। রাবণ যে বিবাহিতা অবিবাহিতা কত শত স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করেছেন, তার কথা বলতে বলতেই তো উত্তর কাণ্ডে রম্ভার কাহিনী এসেছে। স্ত্রীলোকের অভিশাপবাণী অথবা তাদের স্বামীদের শত সহস্র অভিশাপ-বাণীও তার উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়ে থাকবে। রাবণ তার একটি মাত্র মহাপার্শ্বের কাছে বলে ফেলেছেন। অন্যগুলি অনুচ্চারিত থেকে গেছে। উত্তরকাণ্ডে ঋষিদের গল্পে এই অভিশাপ আরও একবার শোনা গেল, তাতে অসামঞ্জস্য কি হল ?

হ্যাঁ, অসামঞ্জস্যের কথা আসতে পারে যদি আপনি অভিশাপ জিনিসটাকে একেবারে ধর্মীয় অক্ষরে গ্রহণ করেন। একথা ঠিক যে এই দুই রমণীর ওপর রাবণের অত্যাচার এবং বলাৎকার একই সঙ্গে হয়নি। অবশ্যই এদের যে কোন একটি ঘটনা পূর্ববর্ত্তী এবং অপরটি পরবর্ত্তী। অন্যদিকে ব্রহ্মার দেওয়া অভিশাপ এবং নলকূবরের অভিশাপ—এই দুয়ের ভেতরেও কোন পারম্পর্য নেই। তার ওপরে প্রথম অভিশাপের কথা সত্যি হলে দ্বিতীয়বার দুষ্কর্ম করার সময়েই রাবণের মাথা চৌচির হবার কথা ছিল, সীতা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত না। কাজেই দুবার অভিশাপের ব্যাপারটা কিছু অসামঞ্জস্য নিয়ে আসে বৈকি। কিন্তু আমরা বলি, ব্যাপারটা অন্যভাবেও দেখা যায়। পুঞ্জিকস্থলী এবং রম্ভা দু-জনেই অপ্সরা। দুজনের ওপরেই রাবণের অত্যাচারের ধরন-ধারণও এক, অভিশাপও এক। কাজেই রাবণের গল্পে যিনি অপ্সরা পুঞ্জিকস্থলী, ঋষিদের গল্পে তিনিই রম্ভা হয়ে গেছেন। অসংগতি এইটুকুই। কিংবা রাবণের গল্পে অভিশাপের বিধাতা ব্রহ্মা, ঋষিদের গল্পে নলকূবর হয়ে গেছেন। অসংগতি এইটুকুই। কিন্তু এরকম ঘটনা একটা ঘটেই ছিল এবং অনুরূপ অভিশাপও একটি ছিল যার জন্য সীতার বেলায় রাবণকে সংযত থাকতে হয়েছে। আধুনিককালে যাঁরা ধারাবাহিক উপন্যাস লেখেন তাঁদের ক্ষেত্রেও দেখি উপন্যাসের প্রথমাংশের একটি নাম পরবর্ত্তীকালে আরেক হয়ে গেছে ; কোথাও বা মৃত চরিত্র পরবর্ত্তী অংশে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেখানে হাজার হাজার বছর আগে, যখন লেখার ব্যবস্থাও ভাল করে ছিল না, সেই তখনকার দিনে গায়েনদের কণ্ঠে যদি অপ্সরার নাম কিংবা অভিশাপদাতার নাম পালটে গিয়ে থাকে, তাতে দোষ দেখি না কোন। বাল্মীকির রামায়ণ কোন ধর্মগ্রন্থ নয় যে, শুধুমাত্র অভিশাপ জিনিসটাকে 'ইসু' করে, বাল্মীকির কল্পনায় মুষ্ট্যাঘাত করতে হবে। বাল্মীকি মূলতঃ কবি এবং পৌরাণিক কবিদের এককথা দুবার, তিনবার বলার অভ্যাস আছে এবং তাতে ক্বচিৎ কখনও নামের পরিবর্ত্তন ঘটে, সময়ের পরিবর্ত্তন ঘটে, অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটে।

বিশেষতঃ আমি তো আগেই বলেছি যে, মহাকাব্যের কবি তো আর ছোটগল্প লিখতে বসেননি। তাই সমমর্মের কাহিনী দুবারও শোনানো যায়, এবং লঙ্কাকাণ্ডেই নায়ক-নায়িকা শেষ হয়ে না হইল শেষের ভাব দেখাবে, এমনটিও নয়। আমি তো মনে করি রাবণের ওপর যে অভিশাপ-বাণীর কথা বলা হয়েছে সে প্রয়োজন ছিল স্বয়ং ক্রৌঞ্চবিরহী কবির। কারণ পরে তাকে দেখাতে হবে যে রাক্ষসগৃহে দীর্ঘকাল বাস করেও, কোনওভাবে কলুষিতা না হয়েও তাঁর নায়িকাকে একবার সন্দেহের আগুনের ওপর পা ফেলে হাঁটতে হয়েছে এবং শেষ

পর্যন্ত তাঁকে পরিত্যক্তাও হতে হয়েছে। কবিহৃদয়ের সমস্ত আকৃতি দিয়ে সীতাকে রক্ষা করলেও বাল্মীকি তাঁকে বাঁচাতে পারেননি, জনাপবাদ তাঁকে কলংকিত করেছে, যার জন্যে তাঁর আপন মানসপুত্রীর শেষ আশ্রয় হয়েছেন বাল্মীকি নিজে। রাজা রামচন্দ্রের আদেশের অছিলায় কবি তাঁর কল্পলোকের নায়িকাকে নিজের কাছেই নিয়ে এসেছেন। কবি জানেন, সীতাকে ধরে রাখবার বা বোঝার ক্ষমতা তাঁর ঘরের লোকেরও নেই, কাজেই তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছেন। বাল্মীকির আশ্রমে আসার পর পরিত্যক্তা সীতাকে বাল্মীকি বলেছেন—বিস্রদ্ধা ভব বৈদেহি সাম্প্রতং ময়ি বর্ত্তসে—এখন তুমি আশ্বস্ত হও সীতা, এখন তুমি আমার কাছে এসেছ। পণ নেই, কৈকেয়ীর মুখে ঝাল খাওয়া মহারাজ নেই, বনবাস নেই, রাবণ নেই এমনকি রাজা রামচন্দ্রও নেই—তুমি আমার কাছে এসেছ, এই তোমার আপন ঘর—যথা স্বগৃহম্ অভ্যেত্য বিষাদঞ্চৈব মা কৃথাঃ— তুমি আর দুঃখ কর না। এখানে সীতা নির্বিঘ্ন, সংসারের মালিন্য এখানে পৌঁছায় না, অন্ততঃ সুখ-প্রসবের জন্যও তো আপন মানসকন্যাকে বাপের বাড়ি নিয়ে আসা যায়। রামায়ণ মহাকাব্যের জনক বাল্মীকি তাঁর হৃদয়বাসিনী কন্যার কাছে এইভাবেই পিতৃকৃত্য সম্পাদন করেছেন।

আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না বা করতে চাই না সীতার সম্পর্কে অপবাদ, সীতা পরিত্যাগ এবং শেষে সীতার পাতালপ্রবেশ—এই উত্তরাংশ বাল্মীকির হাতে লেখা নয়। একদিকে পরিত্যক্তা সীতাকে বাল্মীকি যেমন আশ্রয় দিয়েছেন, অন্যদিকে রাজা রামচন্দ্রের অসহায় অবস্থার প্রতিও তিনি উদাসীন নন। কলঙ্কিতা স্ত্রীকে বাপের বাড়ি ফেলে আসার মত, রাম তাকে ত্যাগ করতে পারেননি। রাম বলতে পারেননি—মহাকাব্যের কবি! এই তোমার লালিতা কন্যা! এ কি চরিত্রহীনা রমণী যাকে তুমি চিরকালের আদর্শ রামচন্দ্রের পাশে জায়গা দিয়েছ! সীতাকে ত্যাগ করার মুহূর্তে রাম আর কথা বাড়াতে চাননি। ভাইদের তিনি বলেছিলেন—আমি কোন কথা শুনতে চাই না, যদি কথা বল, যুক্তি দেখাও তাহলে তা আমার অহিত আচরণ বলে গণ্য হবে—অহিতা নাম তে নিত্যং মদভীষ্টবিঘাতনাৎ। কেউই কথা বলেননি, লক্ষ্মণের ওপর সেই নির্মম কর্ত্তব্যের ভার দেওয়া হল, লক্ষ্মণও কোন প্রত্যুত্তর করেননি। কিন্তু সীতাকেও তো কিছু জানানো হল না। রাজা রামেরও তো সেই সাহস নেই। বাল্মীকি তাহলে কি বোঝাতে চাইছেন? যেদিন সীতাকে লক্ষ্মণ বাল্মীকির তপোবনে রেখে এলেন, সেদিন তিনি অঝোরে কাঁদলেন। যিনি পূর্বে সীতার অগ্নি-পরীক্ষার কথায় দাঁত কড়মড় করেছিলেন, তিনি যে সারা রাস্তা অঝোরে কাঁদলেন সে কি

শুধু সীতার জন্য দুঃখে, রামের ওপর রাগে নয় ? বাল্মীকি কি বোঝাতে চাইছেন ? একটু পরেই তো লক্ষ্মণ বলবেন—লোকের কথা শুনে রাম সীতাকে ত্যাগ করলেন, এ তো একেবারে নৃশংস কাজ—পৌরাণাং বচনং শ্রুত্বা নৃশংসং প্রতিভাতি মে।

লক্ষ্মণ কিন্তু সীতা পরিত্যাগ করেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মত করে চলে যেতে পারেননি। তমসার অপর পার থেকে লক্ষ্মণ বার বার সীতাকে দেখছিলেন—মুহুর্মুহুঃ পরাবৃত্য দৃষ্ট্বা সীতামনাথবৎ। লক্ষ্মণ দেখলেন, বাল্মীকি তাঁর করুণার আশ্রয় বাড়িয়ে দিয়েছেন সীতাকে। লক্ষ্মণ দেখলেন, সীতা শান্তপদে বাল্মীকির আশ্রমপদে প্রবেশ করেছেন— দৃষ্ট্বা তু মৈথিলীং সীতামাশ্রমে সম্প্রবেশিতাম্—লক্ষ্মণ তখন রওনা দিয়েছেন। তমসার তীরে লক্ষ্মণ রথে উঠেই বললেন—রামের অবস্থা কি হবে ? সীতার এই বিরহ-দুঃখের থেকে রামের কাছে আর কোন দুঃখ বড় হতে পারে—ততো দুঃখতরং কিন্নু রাঘবস্য ভবিষ্যতি। সহৃদয় পাঠককুল ! মহাকাব্যের কবি যা দেখানর তা এইভাবেই দেখান। রামের মুখ দিয়ে সহস্রবার আমি তোমাকে ভালবাসি বলানো মহাকাব্যের কবির কাজ নয়। তাঁর কাজ চলে আড়ালে আবডালে সন্তর্পণে। আর যদি বলেন—রামের মনের কথা আমরা তাঁর আজন্ম-সঙ্গী লক্ষ্মণের থেকেও ভাল জানি, তাহলে অবশ্য এক কথায় সীতা-পরিত্যাগের উদাহরণ দেখিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন—রাম পুরুষ মানুষ, পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েদের দাম ছিল না, প্রেম বলে কোন জিনিস তারা বুঝত না—অতএব রাম সীতাকে পরিত্যাগ করেছেন।

কিন্তু এ কেমন প্রেম যার জন্য সুমন্ত্র বলেছেন—রামের কপালই এমন যে তিনি কোনদিন সুখী হতে পারবেন না—দুঃখপ্রায়ো বিসৌখ্যভাক্। ভবভূতি টিপ্পনী কেটেছেন—রামের জীবনটাই করুণ রসে ভরা, তুষের আগুনের মত তাঁর হৃদয় শুধু দুঃখেই জ্বলছে—পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ। রাম রাজা হয়েছিলেন বটে, কিন্তু আদর্শ রাজা হয়ে তিনি যে সুখী হয়েছিলেন তা কে বলেছে ? মজা হল, লক্ষ্মণ যাঁকে বাল্মীকির পিতৃহৃদয়ে আলিঙ্গিতা দেখে গেলেন, সেই সীতার ঘরে রামের আরেক ভাই শত্রুঘ্ন এসে পৌঁছালেন। কবে ? না, সীতার প্রসবের রাত্রিতে। শত্রুঘ্ন নাকি লবণাসুর বধ করার জন্য রওনা হয়েছিলেন। দুই দিন পথশ্রমের পর তিনদিনের দিন তিনি বিশ্রামের জন্য বাল্মীকির তপোবনে আশ্রয় নিলেন এবং যে রাত্রিতে তিনি এলেন সেই রাত্রিতেই সীতার দুটি ছেলে হল—যামেব রাত্রিং শত্রুঘ্নঃ পর্ণশালাং সমাবিশৎ। তামেব

রাত্রিং সীতাপি প্রসূতা দারকদ্বয়ম্ ।

এ কি 'কয়েনসিডেন্স' ? আমি বলব—মোটেই নয় । আর যদি 'কয়েন্‌সিডেন্স' হয়ও, তাহলে বলব—কবি স্বকার্য সাধনের জন্যই এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন । পুত্রজন্মের খবর পেয়ে বাল্মীকি সানন্দে পুত্রদের নামকরণ করলেন । রাতদুপুরে বৃদ্ধারা বারবার রামের নাম বলতে থাকল, সীতার সুখপ্রসবের কথা বলতে থাকল—সংকীর্ত্তনঞ্চ রামস্য সীতায়াঃ প্রসবৌ শুভৌ । পর্ণকুটীরের পাতার শয্যায় শুয়ে শত্রুঘ্ন সব শুনতে থাকলেন । মনে মনে বললেন—মা ! কত সৌভাগ্যে আজ তুমি সুখপ্রসবা হলে—মাতর্দিষ্ট্যেতি চাব্রবীৎ । রামের পুত্রজন্মের আনন্দে শাওনের দীর্ঘরাত্রি একটুকু সময়ের মধ্যেই যেন কেটে গেল শত্রুঘ্নের—ব্যতীতা বার্ষিকী রাত্রিঃ শ্রাবণী লঘুবিক্রমা ।

সংস্কৃত সাহিত্যের হৃদয়ে যাঁদের প্রবেশ আছে, সেই সব সহৃদয়েরা বলুন, বাল্মীকির মত মহাকবি ছাড়া এই শ্লোকের জন্ম দেওয়া সম্ভব কিনা ? একমাত্র বাল্মীকির মত কবিই এই শৈলীতে জানাতে পারেন—রামের হৃদয়ে সীতার জন্যে কোন জায়গা ছিল কিনা ! নইলে, ঠিক পুত্র-জন্মের শুভক্ষণেই শত্রুঘ্ন এসে পৌঁছালেন বাল্মীকির পর্ণশালায়—এর মধ্যে পূজার পুষ্পে দিন গোনার ব্যাপার কি ছিল না একটুও ; অন্ততঃ রামের দিক থেকে—শত্রুঘ্নের রওনা হওয়ার দিন-ক্ষণ তো তিনিই ঠিক করে দেন । তবু স্বীকার করে নিলাম, আসন্নপ্রসবা সীতাকে বনে পাঠিয়ে তিনি সামগ্রিক প্রিয়াপ্রেমের দৃষ্টান্ত বা আদর্শ কোনটাই রাখতে পারেননি । তার কারণও বলেছি—রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জেতা ইস্তক তিনি রঘুপতি রাঘব রাজা রাম । শূদ্র শম্বুকের তপশ্চরণে রামের যে ক্রোধ, তাও এই রাজা রামের মনস্তত্ত্বের আলোকে দেখা যেতে পারে । ব্রাহ্মণ-প্রধান মন্ত্রিসভায়, ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবিত সমাজে রাজা নাম কিনতে গেলে দু-একটা শম্বুক-টম্বুক না মারলে চলছিল না । আর যাঁরা বলেন যে, উত্তর রামায়ণ লেখার এই সময়টাতেই সমাজে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব বাড়ছিল, মূল কাণ্ড-পঞ্চকের মধ্যে এই প্রভাব তত নেই, তাঁদের এও বোঝা উচিত যে রাম তখন রাজা ছিলেন না । তারও ওপরের কথা হল যে, রামায়ণের পূর্ব যুগেও সমাজে যথেষ্ট ব্রাহ্মণ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, হাজারো গ্রন্থ থেকে সে প্রভাব যথেষ্ট স্পষ্ট করে দেখানোও যায় । রামায়ণের উত্তর যুগ সম্বন্ধেওসেই একই কথা । আর ঠিক ওই সময়টুকুতেই, মানে রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ড থেকে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য একেবারে প্রভাবহীন হয়ে পড়ল—এ কথা কি খুব যুক্তিসহ ? বস্তুতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত—কোন স্তরেই সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ্য অহংকার মুক্ত ছিল

না। এই সামাজিক পটভূমিকা কোন কবির পক্ষে, এমনকি বাল্মীকির মত মহাকবির পক্ষেও তাঁর কাব্য থেকে ছেঁটে ফেলা সম্ভব ছিল না, এবং সে কথা রামায়ণের তথাকথিত মূল কাণ্ডপঞ্চকের মধ্যে থেকে যেমন প্রমাণ করা যায়, অন্য দুটি কাণ্ড থেকে তা প্রমাণ করা যায় আরও বেশি—এইমাত্র। কিন্তু এই অছিলায় রামায়ণের কাব্যশরীর থেকে একটু একটু করে যদি ব্রাহ্মণ্য অঙ্গগুলি ছেদ করতে থাকি, তাহলে কাব্যের ঈপ্সিততম অংশগুলিও একেবারে ব্যবচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তার ফল হবে এই যে, উত্তরকাণ্ড থেকে সীতা পরিত্যাগ বাদ যাবে। বাদ যাবে রামের পুত্র জন্ম, যা সেকালের সামাজিক নিরিখে একান্ত অপেক্ষিত বলেই মনে হয়। এবং বাদ যাবে সীতার পাতাল প্রবেশ, যেখানে বাল্মীকি-প্রতিভার চরম উত্তরণ। বাল্মীকি দেখিয়েছেন, সীতাকে একবার জনসমক্ষে অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয়েছে, দ্বিতীয়বার বহ্নি-বিশুদ্ধ সীতাকে লোকাপবাদের গুরুত্বে পরিত্যাগ করা হয়েছে, কিন্তু তার পরেও—ছেলেপিলে বড় হয়ে গেছে—এই অবস্থাতেও যদি রামচন্দ্র পুনরায় সীতার শুদ্ধতা এবং সতীত্বের প্রমাণ চান, তো সেটি হবে আবদার। বিশেষতঃ দুঃখে দুঃখেই যে রমণীর জীবন কাটল, তাঁর ওপরে রাজা রামচন্দ্রের এই অহেতুক অত্যাচার কতক্ষণ কিংবা কতবার সহ্য করবেন সেই মহাকবি, যিনি করুণ রস সৃষ্টির জন্যই বিখ্যাত। ঠিক একই কারণে রামায়ণ কাব্যের এই অংশ বাদ দিয়ে দেওয়াও আবদার বলেই গণ্য হবে, কেননা যে সব পণ্ডিতেরা শুধু মাত্র 'ornate style' এর অছিলায় পাতাল প্রবেশের মুহূর্তে সীতার শপথোক্তিগুলি তথা ধরিত্রীর কাছে তাঁর আত্মনিবেদনের অংশটি বাদ দিতে চান, তাঁদের সাহিত্য বিচার শক্তির ওপর খুব একটা আস্থা নেই আমার। কেননা করুণ রসের চরম অভিব্যক্তিতে এখানে কতগুলি শব্দ প্রতি শ্লোকে পুনরুচ্চারিত হয়েছে। এই পুনরুচ্চারণের অলংকরণ বাল্মীকির লেখা আর পাঁচ কাণ্ডের মধ্যেও আছে, যদিও পাণ্ডিত্যের হলুদ চোখে সে অংশগুলিও প্রক্ষেপ বলে গণ্য হতে পারে। প্রশ্ন হল, পণ্ডিতদের কথা শুনে বাল কিংবা উত্তরকাণ্ডের অলংকৃত শৈলীর নিরিখে মূল কাণ্ড-পঞ্চকের অলংকার দুষ্ট অংশগুলি আমরা পরিত্যাগ করব, নাকি পাঁচ কাণ্ডের স্থল বিশেষে অলংকৃত শৈলীর নিরিখে বাল কিংবা উত্তরকাণ্ডের অংশগুলিও আমরা গ্রহণ করব। আমার ধারণা—গ্রহণ করাই ভাল, কেননা তাতে মহাকাব্যশরীরের হানি হয় না। তাছাড়া কবি কোথায় অলংকৃত ভাষা ব্যবহার করবেন, কোথায় করবেন না, কোথায় তিনি বড় বড় সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করবেন এবং কোথায় লঘু সমাস, কোথায় উপমার মালা তৈরী করবেন, কোথায় রূপক—এসব তো আর তিনি ভবিষ্যং

ভাষ্যতাত্ত্বিকের গবেষণার ফর্মুলা বুঝে করবেন না। কবির ভাবনা-মুকুরে যখন যে ভাব, যে শব্দ, যে সমাস কিংবা যে ভঙ্গীর ছায়াপাত ঘটবে, তিনি সেই ভাবেই লিখবেন, ভাষাতত্ত্বের জারিজুরি সেখানে খাটবে না। ব্রকিংটন সাহেবের মত অনুযায়ী যদি বাণভট্টের কাব্যশৈলীর বিচার করি, তাহলে বলা যাবে—কাদম্বরী কাব্যে যেখানে অলংকার বহুল ভাব অথবা সমাস বহুল পদ ব্যবহৃত হয়েছে সেটা বাণভট্টের লেখা। আর কাদম্বরীর যে সব অংশে একটি সামান্য অলংকার কিংবা একটি সমাসও নেই, সেই সব অংশগুলি পরবর্ত্তী কোন সজ্জনের লেখা, অথবা একেবারেই নিরলংকার সমাসহীন বলে একথাও ভাবা যেতে পারে যে, সেগুলি অগ্রবর্ত্তী কোন গদ্যকারের লেখা। কিন্তু এর কোনটাই তো ঠিক কথা নয়। আর 'স্টাইল'-এর ফারাক যদি কবির ফারাক নির্দেশ করে, তাহলে সেদিনের রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে প্রভাত সংগীত সন্ধ্যাসংগীত বাদ দিতে হবে ; বাদ দিতে হবে তাঁর আধুনিকগন্ধী অতি পরিণত কবিতাগুলিও।

পণ্ডিতদের ভাষাতত্ত্ব আর গবেষণার বিচিত্র ধারা থেকে আরও একটি কথাও মনে হয়। বিশেষতঃ বাল্মীকি ছাড়া যদি অন্য কোন মহাকবি, যাঁর মান যশ অহংকার—সবই বাল্মীকির সঙ্গে মিশে গেছে, সেই মহাকবি যদি রামায়ণ মহাকাব্যের মধ্যে তাঁর আপন প্রতিভা স্ফুরিত করেন, সেই প্রতিভাকে আপনি আলাদা করবেন কোন নিয়মে ? সব নিয়মই যে সেখানে বড় লঘু হয়ে পড়বে। বিস্তীর্ণ আকাশে ক্ষণিকের তরে সহস্রবার স্ফুরিত ক্ষণপ্রভার কি ক্ষণ-নির্ণয় সম্ভব ! আমরা তাই ষড়দর্শনকেশরী বাচস্পতি মিশ্রের কথাটি বেশি মনে রাখি। বাচস্পতি ব্রহ্মসূত্রের ওপরে লেখা শংকরাচার্যের শারীরিক ভাষ্যের ওপর 'ভামতী' টীকা লিখেছিলেন। সে টীকা এমনই যে, তার জন্য নতুন বেদান্ত-সম্প্রদায় তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু টীকা রচনা করবার সময় বাচস্পতির বক্তব্যটি লক্ষ করার মত। তিনি তাঁর পূর্বতন আচার্যদের, বিশেষতঃ শংকরাচার্যকেই স্মরণ করে বলেছেন—আমি প্রাতঃস্মরণীয় আচার্যদের লেখার মধ্যে টিপ্পনী কাটতে বসেছি, আমাদের কথা যত হেয় কিংবা লঘুই হোক না কেন, আচার্যদের লেখার সঙ্গে তা মিশে যাবে, অর্থাৎ কিনা রাস্তার জল গঙ্গার বিরাট প্রবাহে মিশে যাবে। যখন গঙ্গাজলের পবিত্রতা কিংবা শুদ্ধির কথা উঠবে, তখন কি কেউ এমন প্রশ্ন করবে যে—এই গঙ্গার জলে রাস্তার জলের ভেজাল কতখানি আছে ?

আমার বক্তব্য ঠিক এইরকম। বাল্মীকির রামায়ণ, এক বিশাল জলপ্রবাহ। সেই প্রবাহে যদি কবিযশের কামনাহীন কোন কবির অমন্দ কবিতাংশ মিশে যায়,

তো তাকে মশাই আলাদা করবেন কি করে ? বাল্মীকির কাব্য সমুদ্রে খামচা দিয়ে যদি বলেন এই কবিতার অঞ্জলিটুকু অন্য কোন অবচীন কবির, তা মানব কি করে ? 'স্টাইল', ভাষা আর শব্দ ব্যবচ্ছেদ করে রামায়ণের নানারকম স্তর এবং কাল বিভাজন করতে গেলে সে যুক্তি যে হবে ভীষণ জোলো, এবং তা যে কত জোলো সে কথা এই সেদিনের লেখা 'ক্রিটিক অব পিওর রিজিনে'র স্তর-ব্যবচ্ছেদেই বোঝা গেছে, যা মহামতি পেটন ভাল করেই দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে আর কথা বাড়াব না। আজ বেঁচে থাকলে বাল্মীকি হয়তো কান্টের মতই বলতেন যে রামায়ণ মহাকাব্যের সমস্যা—'Can be easily solved by any one who has mastered the idea as a whole.'

গ্রন্থপঞ্জী এবং গ্রন্থঋণ

১। *বাল্মীকি রামায়ণ, পরিশুদ্ধ সংস্করণ, বরোদা ১৯৬০-৭৫*

২। *রামায়ণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সংস্করণ*

৩। *তুলসীদাস, রামচরিতমানষ, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৩৫২ সাল।*

৪। *দিবাকরপ্রকাশ ভট্ট, কাশ্মীরী রামায়ণ, জি· এ· গ্রিয়ার্সন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৩০*

৫। *অধ্যাত্ম রামায়ণ, নগেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তরত্ন।*

৬। *অদ্ভুত রামায়ণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সংস্করণ*

৭। *এ. হ্বেবার, উবার দাস রামায়ণ, বার্লিন, ১৮৭০*
জার্মানি ভাষা জানা না থাকায় এ গ্রন্থ আমি পড়িনি, তবে বিভিন্ন জায়গায় এই গ্রন্থের তর্জমা ইংরেজী ভাষায় দেখেছি।

৮। *এইচ. জ্যাকোবি, মূল গ্রন্থ দাস রামায়ণ, বন, ১৮৯৩। আমি এই গ্রন্থের খানিকটা তর্জমা পেয়েছি এন· এ· গোরের লেখা বিব্লিওগ্রাফি অব্ দ্য রামায়ণ (পুনে, ১৯৪৩) গ্রন্থে এবং অন্য তর্জমাগুলি সংগ্রহ করতে হয়েছে গৌণ গবেষণা গ্রন্থগুলি থেকেই।*

৯। *কে. টি· টেলাঙ, ওয়াজ্ দ্য রামায়ণ কপিড্ ফ্রম্ হোমার ? আ রিপ্লাই টু প্রফেসর হ্বেবার, বম্বে, ১৮৭৩*

১০। *সি. ভি· বৈদ্য, দ্য রিডল অব দ্য রামায়ণ, বম্বে ১৯০৬ (নব সংস্করণ দিল্লী, ১৯৭২)*

১১। *সি. ভি· বৈদ্য, এপিক ইণ্ডিয়া, বম্বে, ১৯৩৩*

১২। *এন. জে· শেণ্ডে, দ্য অথরশিপ অব্ দ্য রামায়ণ, জার্নাল অব দ্য ইউনিভার্সিটি অব বম্বে ১২ : ১৯৪৩, পৃ· ১৯-২৪*

১৩। *ই· ডাবল্যু· হপকিনস্, দ্য অরিজিনাল রামায়ণ, জার্নাল অব দ্য অ্যামেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি, ৪৬ : ১৯২৬, পৃ· ২০২-২১৯*

১৪। *আর. আঁটোয়া, রাম এ্যাণ্ড দ্য বার্ডস : এপিক মেমোরি ইন্ দ্য রামায়ণ, কলিকাতা, ১৯৭৫*

১৫। ডি. সি· সরকার, দ্য রামায়ণ এ্যাণ্ড দ্য দশরথ জাতক,জার্নাল অব দ্য ওরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউট, বরোদা ২৬ : ১৯৭৬-৭৭, পৃ· ৫০-৫৫
১৬। জে..প্রিজিলুস্কি, এপিক ষ্টাডিজ, ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোয়াটারলি ১৫ : ১৯৩৯ পৃ· ২৮৯-২৯৯
১৭। সি. বুক, রাম-কথা : উৎপত্তি আউর বিকাশ, প্রয়াগ, ১৯৬২
১৮। হ্বিলহেম প্রিনজ, রাম উণ্ড শম্বুক, জেইট্‌শ্রিফট ফুর ইন্দলজি উণ্ড ইরানিষ্টিক, ৫ : ৩। জার্মান ভাষা জানা না থাকায় এই গ্রন্থেরও ইংরেজি তর্জমা জোগার করতে হয়েছে গৌণ গবেষণা গ্রন্থগুলি থেকে।
১৯। দীনেশ চন্দ্র সেন, বেঙ্গলি রামায়ণস, কলিকাতা, ১৯২০
২০। এস. শংকর রাজ নাইডু, আ কমপেয়ারেটিভ ষ্টাডি অব কম্ব রামায়ণম এ্যাণ্ড তুলসী রামায়ণ, ম্যাড্রাস, ১৯৭১
২১। সালটি ভদভিল, রামায়ণ ষ্টাডিজ ১ : দ্য ক্রৌঞ্চ-বধ এপিসোড ইন দ্য বাল্মীকি রামায়ণ, জার্নাল অব দ্য অ্যামেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি ৮৩ : ১৯৬৩, পৃ· ৩২৭-৩৩৫
২২। মাল্লাদী ভেঙ্কটরত্নম, রাম, দ্য গ্রেটেষ্ট ফারাও অব ইজিপ্ট, ২ খণ্ড, রাজমুন্দ্রী, ১৯৩৪
২৩। জে. এল· ব্রকিংটন, রাইচিয়াস্ রাম : দ্য এভোল্যুসন অব দ্য এপিক, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লী, ১৯৮৪
২৪। রামাশ্রয় শর্মা, আ সোসিও-পলিটিক্যাল ষ্টাডি অব দ্য বাল্মীকি রামায়ণ, দিল্লী, ১৯৭১
২৫। ভি. রাঘবন, সাম ওল্ড লস্ট রাম প্লেইজ, অন্নামালাইনগর ১৯৬১
২৬। দিঙনাগ, কুন্দমালা, কালীকুমার দত্ত সম্পাদিত, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ রিসার্চ সিরিজ নং ২৮, কলিকাতা, ১৯৬৪
২৭। অশ্বঘোষ, বুদ্ধচরিত, সূর্যনারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত, পূর্ণিয়া, সংস্কৃত ভবন, ১৯৫৫
২৮। ভবভূতি, উত্তররামচরিত, পি· ভি· কানে সম্পাদিত, মতিলাল বনার্সিদাস, দিল্লী, ১৯৬২
২৯। কালিদাস, রঘুবংশ, চৌখাম্বা, স্যানসক্রট্ সেরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৬১
৩০। সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৯৪ সাল।
৩১। দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, বাঙালীর সারস্বত অবদান : বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫৮ সাল।
৩২। সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি; দ্য রামায়ণ, ইটস্ ক্যারেক্টার, জেনেসিস, ইত্যাদি, প্রজ্ঞা, কলিকাতা, ১৯৭৮

৩৩। ছল্ল রাধাকৃষ্ণ শর্মা, দ্য রামায়ণ ইন্ তেলেগু এ্যাণ্ড তামিল : আ কমপেয়ারেটিভ্ ষ্টাডি, ম্যাড্রাস, ১৯৭৩

৩৪। কৃত্তিবাস, রামায়ণ, সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, ১৯৮১

৩৫। ইমানুয়েল কাণ্ট, ক্রিটিক অব পিওর রিজন, নরম্যান কেম্প স্মিথ কর্তৃক অনূদিত, লণ্ডন : ম্যাকমিলান এণ্ড কোং, ১৯৬৩

৩৬। হানস্ ফাইহিঙ্গার, "দ্য ট্রান্সেনডেনট্যাল্ অব দ্য ক্যাটিগোরিজ্ ইন্ দ্য ফার্ষ্ট এডিশন্ অব দ্য ক্রিটিক অব পিওর রিজন্।" দ্রঃ এম. এস. গ্রাম সম্পাদিত, কাণ্ট : ডিসপিউটেড় কোয়েশ্চনস্, চিকাগো, ১৯৬৭, পৃ. ২৩-৬১

৩৭। এইজ. জে. পেটন, "ইজ্ দ্য ট্রান্সেনডেনটাল্ ডিডাকশন্ আ প্যাচওয়ার্ক।" দ্র এম. এস. গ্রাম সম্পাদিত, কাণ্ট : ডিসপিউটেড কোয়েশ্চনস্, চিকাগো, ১৯৬৭ পৃ. ৬২-৯১